সাহিত্য-সঙ্গ

।। আব্‌দুল আজীজ আল্‌-আমান ।।

প্রকাশক :
এস, মল্লিক
৩৭-এ কলেজ রো
কলিকাতা-১২
প্রাপ্তিস্থান :
ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
৫৭-বি কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
প্রথম প্রকাশ :
স্বাধীনতা দিবস
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৫
মুদ্রণালয় :
বঙ্গ-আজাদ প্রেস
১২নং বলাই দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১
প্রচ্ছদ-শিল্পী :
সুশীল সরকার
প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ষ্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য : ছ' টাকা

উদার প্রাণ মনীষী, বাংলা সাহিত্যের 'কাজী' এবং সুপণ্ডিত

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ পরিচায়িকা ॥

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অভিযোগ এই যে, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অভিযোগটির মধ্যে যথার্থ্য আছে অনেকখানি সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি কথাও মনে আসে। এখনও সমালোচনা সাহিত্য রচনার ও রচনা ক'রে উৎসাহ পাওয়ার সুযোগ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন : "গল্প-কবিতা ও নাটক নিয়েই বাংলা সাহিত্যের পোনের-আনা আয়োজন।" আজও এ অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। তবু প্রকাশক ও পাঠকদের মধ্যে আজকাল প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতনতা এসেছে। বিশেষ আশার কথা সন্দেহ নেই।

'সাহিত্য-সঙ্গ' গ্রন্থের লেখক আবদুল আজীজ আল-আমান বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে নবাগত। রচনাগুলির কোনো কোনো অংশ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আমাকে তিনি পড়তে দিয়েছিলেন। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে তিনি আলোচনা ক'রেছেন। চর্যাপদ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিহারীলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রনাথের কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ, 'নীলদর্পণ' নাটক প্রভৃতি বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে তিনি নানা দিক দিয়ে বিচার করার চেষ্টা ক'রেছেন। রসতত্ত্বের আলোচনা মূলক একটি অংশও সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া উপন্যাস, নাটক, গীতিকবিতা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিভাগ সম্পর্কেও কয়েকটি সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধগুলির ভালোমন্দেব বিচার কবা এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। সে বিষয় বিচার করবেন পাঠক সাধারণ ও বিশেষজ্ঞেরা। তবে লেখক বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর আলোচিত বিষয়বস্তুর ওপর যেটুকু আলোকপাত ক'রেছেন, প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। এইভাবে তরুণতর লেখকরাও সাহিত্য-সমালোচনার দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে উঠলে, এই বিভাগটির একটি শুভ ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করা যায়। এই তরুণ লেখকের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক!

৩০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রধান অধ্যাপক : বাংলা বিভাগ
মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ
কলকাতা

রথীন্দ্রনাথ রায়

॥ নিবেদন ॥

অসঙ্কোচে স্বীকার করছি "সাহিত্য-সঙ্গ" পাণ্ডিত্য-গর্বী নয়, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন স্পর্ধা সে রাখে না। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বহু আলোচিত বিষয় এ'তে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে গবেষণা মূলক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হ'য়েছে। "সাহিত্য-সঙ্গ" তাদের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা—প্রান্ত-সীমা-লগ্ন হ'তেও কুণ্ঠিত। স্নাতকোত্তর জীবনে অধ্যয়নকালে এই সকল অমূল্য গ্রন্থাবলীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। সে সময়েই আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগুলীর উপদেশ এবং অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-সঙ্গের সমস্ত প্রবন্ধের রচনা সমাপ্ত হয়। এবং বিভিন্ন মাসিক এবং সাময়িকীতে প্রবন্ধগুলি বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। মুদ্রণ কালে সেই বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধরাজীকে একত্রিত করেছি এবং অংশ বিশেষ সংশোধন করে নিয়েছি।

কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়ে আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের বিপুলায়তন গ্রন্থ "কাব্যালোক" বিশেষ যত্নসহকারে পড়েছি। পড়ে পাণ্ডিত্য এবং মনীষায় মুগ্ধ হ'য়েছি। এ গ্রন্থের যে অংশগুলি আমার বিশেষ ভাল লেগেছে 'কাব্যালোক' অধ্যায়ে সেগুলি সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। 'চর্যার ধর্মমত বা দার্শনিকতা' এবং 'চর্যার যোগ-সাধন-তত্ত্ব' অংশ দুটি লেখার সময় ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্তের গ্রন্থটিই ছিল আমার একমাত্র নির্ভর স্থল। 'চর্যার সাহিত্যিক মূল্য' এবং পরবর্তী বাংলা ভাষায় চর্যার প্রভাব' অংশ রচনায় শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্র মোহন বসু মহাশয়ের চর্যাপদ এবং বাংলা

সাহিত্য (১ম খণ্ড) হ'তে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি। শনিবারের চিঠির পাতায় যখন আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের "সনেটের আলোকে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হ'তে থাকে তখন সনেটের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের উৎস-নির্ণয়ে তিনি যে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ আমাদের বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন "সনেট এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর আঙ্গিক" রচনায় আমি সে উপকরণ নির্বিচারে গ্রহণ করেছি। সুবক্তা, সুলেখক এবং কৃতী অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের "সাহিত্য-বিচিত্রা" গ্রন্থখানি আমার জীবনে এবং রচনায় যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে সে একমাত্র আমিই জানি। সমালোচনা পদ্ধতি, ভাব, ভাষা সকল দিক থেকেই আমি তাঁর কাছে ঋণী। এ ছাড়াও যে সকল গ্রন্থাদি হ'তে আমি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য নিয়েছি সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হ'য়েছে—গ্রন্থের শেষে একটি তালিকাও সংযোজিত হল।

বইয়ের ভূমিকা লেখায় মুদ্রণ ত্রুটি স্বীকার করা একটা প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানই ছিল আমার ইচ্ছা। কিন্তু মুদ্রণ-কার্য সমাপ্তির পর এত অজস্র মুদ্রণ-ত্রুটি আমার নজরে পড়ল যে রুখে দাঁড়াবার গর্ব নিজেকেই খর্ব করতে হ'য়েছে। ছাপার ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াও অজ্ঞতার জন্যে লেখায় দোষ-দুর্বলতা এবং তথ্যগত অসঙ্গতিও হয়ত রয়ে গেল—এ বিষয়ে আমি সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি কামনা করি।

গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন সুপণ্ডিত কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। কয়েকটি প্রবন্ধ সংশোধন করে দিয়েছেন অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়। এঁর স্নেহানুকূল্য এবং ভর্ৎসনা-তাড়না না পেলে হয়ত এ গ্রন্থ প্রকাশিত হত না। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে সাহায্য এবং অনুপ্রাণিত করেছেন ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। এঁদের সবায়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত স্নেহের এমনি একটা সম্পর্ক আছে যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিছক বাহুল্য মাত্র। গভীর আনন্দে মুগ্ধ চিত্তে আজ আমি এঁদের সবায়ের কথা স্মরণ করছি। ইতি—

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা
২২ শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

আবদুল আজীজ আল্-আমান

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্দশপদী কবিতাবলী :

কমলাকান্তের দপ্তর ও বিবিধ প্রবন্ধ :

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি-মানস :

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য :

বিহারীলাল :

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী :

কাব্যালোক :

চর্যাপদ :

কয়েকটি ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ :

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ :

দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ :

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

॥ এক ॥

॥ সনেট এবং "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র আঙ্গিক ॥

বাংলা সাহিত্যে—"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র বিশিষ্ট স্থান-নির্মানে দু'টি কারণ অন্তরাল হ'তে বেগ সঞ্চার করেছেঃ একটি হ'লো এ কবিতাবলীর অনন্যসাধারণ ভাব-সম্পদ এবং অপরটি হ'লো এর নতুনতর আঙ্গিক-বৈচিত্র। একদিকে আছে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার অভিনব রূপায়ণ, অন্যদিকে আছে প্রকাশ-বৈচিত্রের নতুনতম স্পন্দন। ব্যক্তিগত ভাব-সম্পদের অত্যুজ্জ্বল আলোকপাতে কবির অবরুদ্ধ অন্তর্লোকের সবটুকু যেমন একদিকে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রকাশ-ভংগীতে নতুন পথে পদ-চারণা করে কবি বাংলা কাব্য-প্রকাশের এক নতুন বেগবান স্রোত-ধারার উৎসমূল খুলে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ধ্যান-কল্পনা এবং মানস-প্রবণতার কিছু কিছু পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন কবির কাব্যে পেয়েছি, কিন্তু যে প্রকাশ-রীতিতে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কোমলবক্ষ তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে বাংলা কাব্যে তার পদ-ধ্বনি এই প্রথম শোনা গেল। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র প্রতিটি পৃষ্ঠা সনেটের দৃঢ় কঠিন বাঁধুনিতে হীরকোজ্জ্বল।

সুপ্রাচীনকাল হ'তে নিছক বাঁধাধরা নিয়মেই বাঙালী কবি পয়ার, ত্রিপদী, পাঁচালী, লাচাড়ী ইত্যাদি দ্বারা গ্রথিত একটি এলায়িত বাক-বিন্যাসযুক্ত কাহিনীকেই কলাকৃতি বা Art-form হিসেবে গ্রহণ করেছে। নতুন কোন প্রকাশভংগীর জোয়ার-প্লাবন এসে পয়ার-ত্রিপদীর বেলাভূমিতে আপনার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। পয়ার ও ত্রিপদীদ্বারা শিথিল প্রকাশ-ম্লান কাহিনী-কাব্যের দীর্ঘদিন একটানা নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বের পর অবশেষে গীতিকাব্যের ধারা এসে বাংলাকাব্যের প্রকাশ-মন্থরতাকে বেগবান করে তুলছে। এরপর বহুজনের বহুপ্রচেষ্টায় বহুভাবে বাংলা কাব্যের স্রোত-ধারা চিরচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু সনেটের সাথে তখনো আমাদের কোন পরিচয় নেই। অবশেষে আমাদের এই অভাব দূর হ'লো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে; মধুসূদনের

"চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" সনেটের অপূর্ব ঝংকারে বেজে উঠলো। জীবন-কাব্যের মহাভাষ্যকার শ্রীমধুসূদন জীবনের সকল ধ্যান-ধারণা, সকল বাসনা-কামনা তাঁর শেষতম গ্রন্থের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়িয়েছেন। গ্রন্থখানি তাই নিখিল বাংলা-কাব্য-কুঞ্জের মধ্যে একটি দোসর-হীন অনন্যসুন্দর কোরক। কেবল ভাব-ভাষায় নয়, কেবল দিগন্ত-বিথারী কল্পনা-ঐশ্বর্যে নয়, কেবল মধুকবির স্বভাব-জাত উপমা প্রয়োগের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কারু-করণের জন্যও নয়—এ গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য নিহিত আছে এর আঙ্গিক-প্রকরণ-মাধুর্যের মধ্যে, প্রকাশ-রীতির নতুন রেখাঙ্কণের মধ্যে। নতুন মঙ্গলতীর্থে পদ-চারণা করে মধুকবি কাব্য-প্রকাশ-রীতির যে নতুন মধুকোষের উদ্ঘাটন করলেন, ভবিষ্যতে বহুতর কবি সেই পথে পদ-চারণা করে আপন প্রতিভাকে বাঙালীর ভাব-চিত্তে সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছেন। এই পথেই পদ-চারণা করে বর্ত্তমানের বহু প্রতিভাবান কবি আপন ধ্যান-স্বপ্নকে শাশ্বত রসলোকের দ্বারপ্রান্তে এনে হাজির করছেন।

সনেট বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রকাশ-রীতির কনিষ্ঠ কন্যা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বয়ঃকনিষ্ঠা হ'লেও পৃথিবীর ইতিহাসে সে বয়োজ্যেষ্ঠা। ইতালী-গ্রীসে তার জন্ম হ'য়েছিল অনেক আগেই।

সংগীতের তিনটি পৃথক পর্য্যায়কে বোঝাবার জন্যে প্রাচীন ইতালীতে তিনটি শব্দের প্রচলন ছিল : Canzone, Sonetto এবং Ballata। যন্ত্রসংগীতের সংযোগছাড়া যে গান কেবলমাত্র কণ্ঠের সুর-মাধুর্যে ভরিয়ে দেওয়া হ'তো তার পরিচয়বাহী শব্দ Canzone, কণ্ঠের স্বর-বৈচিত্র ছাড়াও যে সংগীতের মর্মমূলে মিশে থাকৃতো বাদ্য-যন্ত্রের সুর-তরঙ্গ তার পরিচয় ছিল Sonetto শব্দের মধ্যে, আর কণ্ঠ এবং যন্ত্রসংগীত ছাড়া নৃত্য বা অঙ্গভংগীর সহযোগে যে সংগীত পরিবেশিত হ'তো, তাকে বলা হ'তো Ballata। সংগীত-জগতের পরিভাষা Sonetto শব্দ হ'তেই Sonnet শব্দটির উৎপত্তি হ'য়েছে। Sonetto শব্দটির আভিধানিক অর্থ হ'লো একটি ক্ষুদ্রধ্বনি বা a little sound। সনেটও একটি ক্ষুদ্র ভাবের বাঙ্ময় প্রকাশ, সুবৃহৎ কোন কাব্য-কাহিনী রচনার অবকাশ সনেটে নেই। দিগন্ত-বিহারী সুবিপুল কোন ভাব-কল্পনার উদাত্ত অসীম সমুদ্র-কল্লোলও সনেটের ক্ষুদ্র বুকে ধ্বনিত হয় না। ছোট ছোট দুষ্প্রাপ্য-সুন্দর কল্পনা-ঐশ্বর্যের নিটোল প্রকাশে সনেট ভাস্বর। একটি গীতোচ্ছ্বাসময় সংযত ভাবই সনেটের প্রাণ। বিশিষ্ট সমালোচক সনেটের সূত্র সম্পর্কে বলেছেন, "সনেট গীতিকবিতার-ই একটি প্রকার ভেদ। সুতরাং গীতি কবিতায় যেমন, সনেটও তেমন একটি অনুভূতি,

একটি হৃদয়াবেগ অখণ্ডভাবে প্রকাশ পায়। একটি আবেগ বা কল্পনা চতুর্দশটি পংক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া উহাকে নিঃশেষ করিতে হইবে। আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভাবের একটি সংহতি, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতা বজায় রাখিতে হইবে। কবির প্রাণের আবেগটি যদি চৌদ্দটি ছত্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমাপ্তিলাভ না করে, তবে শেষের কয়েকটি ছত্রে ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভাঙ্গিয়া বা দুমড়াইয়া চতুর্দশ পংক্তির মধ্যেই ভরিয়া দিতে হয়। আবার শেষ দুই পংক্তি লিখিবার পূর্বেই ভাব বা কল্পনাটি যদি নিঃশেষ হইয়া যায় তবে কবিকে বাধ্য হইয়া ভাবকে টানিয়া বুনিয়া, প্রকাশ-ভংগীকে অসম্ভবরূপে স্ফীত করিয়া চৌদ্দছত্র পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হয়।" মোটকথা সনেটে কোন দুর্বল অংশের প্রবেশাধিকার নেই—এর সর্বাঙ্গ দৃঢ়পিনদ্ধ, ব্যঞ্জনগর্ভ এবং ভাব-নিটোল। একটি বিরাট কল্পনার বাষ্পময় অংশকে পৃথক করে কেবলমাত্র সারাংশকে অধিকতর সুদৃঢ় এবং সুসংহত করে ছন্দের দৃঢ়-কঠিন ভিত্তিতে উপস্থাপিত করতে পারলেই সনেটের স্বার্থকতম প্রকাশ। আত্মার স্ফূর্তি এবং প্রাণাবেগকে বাহ্যিক আবরণের কঠিন-পীড়নে দীপ্তোজ্জ্বল করে তোলাই সনেটের মূল লক্ষ্য।

সনেটের আঙ্গিক-স্বরূপে বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয়ান সনেটকার পেত্রার্কের নাম বিশেষরূপে জড়িত আছে। অবশ্য এঁর পূর্বেই সনেটের আবিষ্কার হ'য়েছিল এবং অনেকেই সনেট লিখে যশ অর্জন করেছিলেন—কিন্তু পেত্রার্কের হাতে সনেট যেন সঞ্জীবনী সুধা পান করে চিরঞ্জীব হয়ে উঠে। অসংখ্য সনেট রচনা করে তিনি যে বিপুল সম্মানের অধিকারী হন, তাতে পূর্ববর্ত্তী সকল কবির যশ ম্লান হয়ে গেছে। সনেট রচনায় পেত্রার্ক যে আঙ্গিক-সুষমা রেখে যান তাঁর পরবর্ত্তী অনেকেই সেই পথে পদ-চারণা করেছেন—কিন্তু ইংরেজ-কবি সেক্সপীয়র পেত্রার্কীয় আঙ্গিকে সনেট রচনা না করে এক নিজস্ব রীতির প্রবর্ত্তনা করেন। তাই সনেটের আঙ্গিক নির্ণয়ের এই দু'জন সনেটকারের সনেটই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পেত্রার্ক তাঁর সকল সনেটকে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমভাগে সনেটের প্রথম অষ্ট চরণ নিয়ে গঠিত হয়েছে অষ্টক বা octave এবং দ্বিতীয় ভাগে শেষের ছয়টি চরণের সম্মিলনে গঠিত হয়েছে ষট্‌ক বা sestet. অষ্টক-টি আবার দু'টি সংবৃত-চতুষ্ক বা enclosed quatrain দ্বারা এবং ষট্‌কটি দু'টি ত্রিপদিকা বা terect এর মিলনে সম্পূর্ণ। পেত্রার্কের সকল সনেটে এই অষ্টক এবং ষট্‌কের মাঝে কিছু বিরতির ভাব আছে। অষ্টকের মধ্যে প্রধানতঃ মূলভাবটি

টানা বেঁধে ওঠে এবং ষট্‌কের মধ্যে প্রধানতঃ থাকে তারই অনুরণন। সমগ্র সনেট-টিকে সমুদ্রের একটি তরঙ্গের সাথে উপমিত করে বলা হয়েছে, সমুদ্রের অসীম জলরাশির উপর একটি তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে বড় হ'তে হ'তে যেমন একেবারে উচ্চতম রূপ পায়, সনেটের মূল ভাবটিও তেমনি অষ্টকের মধ্যে তরঙ্গ-উত্থানের মত উত্থিত হ'তে হ'তে একেবারে উচ্চগ্রামে পৌঁছে যায়; ক্ষণিক স্থির থেকে পরমুহূর্তে তরঙ্গটি যেমন নিম্নাভিমুখী হয়ে ভেঙে যায়, সনেটের মূল ভাবটিও অষ্টকের মধ্যে উচ্চতম রূপ পেয়ে ক্ষণিক বিরামের পর পরমুহূর্তে ষট্‌কের মধ্যে মুক্তি পায়। অষ্টকের মধ্যে অধিরোহণ, ষট্‌কের মধ্যে অবরোহণ। অষ্টক ষট্‌কের মধ্যে এই বন্ধন এবং মুক্তির লীলাই হলো সনেটের অষ্টক এবং ষট্‌ক বিভাগের মূল কথা।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র অসংখ্য সনেটের মধ্যে মাত্র কয়েকটি সনেটে অষ্টক এবং ষট্‌কের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতে অষ্টক-ষট্‌কে-র এই বিভাগ প্রধান হয়ে ওঠেনি। একটি ভাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা চলে গেছে—তার মাঝে কোন উত্থান-পতন নেই; কোন বিরাম নেই। অধিকাংশ কবিতার বিষয়-বস্তুও ভাব-জমাট নয়—শিথিল। দৃঢ়-পিবদ্ধ নয়—এলায়িত। কোন কোন সনেটে মহাকাব্যের মত অসংখ্য উপমা ইত্যাদিতে কাহিনী বলার ঝোঁক এসে গেছে। একটি অখণ্ডভাবের বজ্রদীপ্তি খুব কম কবিতাতে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে মধুসূদনের সনেট দুর্বল।

পেত্রার্কীয় সনেটের অষ্টকের মিল এই ভাবে সূচিত হয়েছে: চ ছ ছ চ, চ ছ ছ চ। কোথাও এ মিলের ব্যতিক্রম নেই। মধুসূদনের অনেকগুলি সনেটে এই মিল লক্ষ্য করা যায়: কাশীরাম দাস, বৌ কথা কও, আশ্বিন মাস ইত্যাদি সনেটগুলি এই পর্যায়ের। ষট্‌কের মধ্যে পেত্রার্ক অনেকগুলি মিলের প্রবর্তন করেন—মিলগুলি এই ভাবে দেখানো যেতে পারে: তথ তথ তথ; তথদ তথদ বা তথথ ততথ—কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে পেত্রার্কীয় সনেটে শেষের দুই চরণে কখনও পয়ারের মত মিল থাকে না। ষট্‌কের মধ্যে মিলের এই রীতি মধুসূদনের অনেকগুলি কবিতায় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

আকৃতির দিক দিয়ে সেক্সপীয়রীয় সনেট সম্পূর্ণরূপে পেত্রার্কীয় সনেটের বিপরীত। সেক্সপীয়র সনেটের মধ্যে অষ্টক-ষট্‌কের কোন বিভেদ রাখেন নি—ভাবের কোন উত্থান-পতনও তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না; একটি সুর-তরঙ্গ প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত একটানা অবিরল ধারায় বয়ে গেছে। অষ্টক-ষট্‌কের বিভাগের

বদলে তিনটি চৌপদী এবং শেষে একটি মিলযুক্ত পয়ার দিয়ে সেক্সপীয়র তাঁর সনেট রচনা করেছেন। সেক্সপীয়রীয় সনেটের মিলটি এইরূপে দেখানো যেতে পারে : কখ কখ, গঘ গঘ, চছ চছ, এএ এএ।

সেক্সপীয়রীয় সনেট-আঙ্গিক মধুসূদনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল—তাঁর অধিকাংশ সনেট তাই সেক্সপীয়রীয় আঙ্গিক-সুষমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর বহুবিখ্যাত 'কাশীরাম দাস' নামক কবিতাটি সেক্সপীয়রীয় সনেটের সার্থক দৃষ্টান্ত। ভাব-বিন্যাসের দিক দিয়ে মধুসূদনের প্রায় সকল সনেট সেক্সপীয়রীয় সনেটের অনুগামী। প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত ভাবের একটা সংগতি এবং ক্রমবিকাশ তাঁর সনেটগুলিকে বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অবশ্য মধুসূদন কেবল খাঁটি পেত্রার্কীয় এবং খাঁটি সেক্সপীয়রীয় সনেট-ই রচনা করেন নি—এই দুই প্রকার নিয়মানুগ সনেট ছাড়াও বহু নিয়মবিহীন irregular সনেটও তিনি রচনা করেছেন। এর কিছু ওর কিছু নিয়ে একটি মিশ্র রীতির গঠন-বৈচিত্রও তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এই মিশ্র-রীতিতে লেখা সনেটগুলি কলা-নিপুনতায় ভাস্কর্য-সুঠাম এবং দুষ্প্রাপ্য-মনোহর হয়ে উঠেছে। মোটকথা বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কেবলমাত্র সনেটের অবতারণাই করেন নি—তার দীপ্তিময় ভবিষ্যসম্ভাবনাকে দিগ-বিথার করে দিয়েছেন।

মধুসূদনের সনেট একেবারে নিখুঁত নয়—বহু ক্রটি বিচ্যুতি তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। সনেটের মধ্যে নিটোল স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাব অপেক্ষা বহুস্থলে যে কাহিনী বলার ঝোঁক এসে গেছে সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিষয়বস্তু অধিকাংশক্ষেত্রে কেবল গন্ধময়। একান্ত এলায়িত এবং শিথিল-বিন্যস্ত বাক-সংযোজনা বহুস্থানে সনেটের মৌলিক লক্ষণকে ক্ষুন্ন করেছে। কেবলমাত্র বাগ-বৈদগ্ধের দীপ্তিতে এবং উপমা-অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগে কবিতাগুলি ঝলকিত হ'য়েছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সনেটের দিগন্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায়নি। বিষয়বস্তু যেখানে কল্পনাবেগে কেবলমাত্র বাষ্পময় হ'য়ে উঠেছে সেখানে উৎকৃষ্ট সনেট-সৃষ্টির প্রত্যাশা করা অন্যায়। কিন্তু মধুসূদন কল্পনার পক্ষীরাজের লাগাম টেনে সংযত করতে জানতেন—এবং যেখানে তিনি লাগাম টেনে ভাবকে সংযত করেছেন, সেখানে উৎকৃষ্ট কাব্য-সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গভাষা', 'কাশীরাম দাস', 'বিজয়া দশমী', 'কপোতাক্ষ নদ', 'নূতন বৎসর', ইত্যাদি কবিতাগুলি শাশ্বতকালীন সনেট-গৌরব।

প্রেমকে কবি সনেটের একমাত্র বিষয়বস্তু করেননি—প্রেম ছাড়া বহুতর বিষয়কে

তিনি সনেটের অঙ্গীভূত করেছেন। আপন হৃদয়ের ধ্যান-ধারণার কথা, স্বদেশের কথা, স্বজাতি এবং স্ব-সংস্কৃতির কথা এমন কী নীতি-মূলক বহু বিষয়ের অবতারণাও তিনি সনেটের মধ্যে নিপুণ দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ "চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী"র বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও এই বহু বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এর আঙ্গিক পাশ্চাত্য—কিন্তু পাশ্চাত্য আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের অন্তরাগিনী কী সুন্দরভাবেই না বেজে উঠেছে। পাশ্চাত্য-লালিতা কঠিন-নিপীড়নে সমুজ্জ্বল সনেটের মধ্যে যখন আমরা শ্যামাঙ্গ বাংলার পল্লবান্তরালের 'বৌ কথা কও' পাখীর কোমল-মধুর আহ্বান শ্রবণ করি তখন আমাদের সমগ্র চিত্ত দুর্নিবার আবেগে রোমাঞ্চ-রঙীন হ'য়ে ওঠে। বস্তুতঃ আঙ্গিকের দিক দিয়ে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বহুস্থানে দুর্বল হ'লেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে সে দুর্বলতা ক্ষীণ। পাশ্চাত্য আঙ্গিকে এই গ্রন্থে কবি আপন গহনচারী হৃদয়ের এবং স্বাদেশিকতার যে বাণী বয়ন করেছেন তার মূল্য কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নিভৃত মনের গান, স্বাদেশিকতার বীজাঙ্কুর, ইলেকট্রিক গীটারের দীপ্ত-রাগিণীর অন্তরালে শ্যাম-মুরলীর অমিয়-তান।

।। দুই ।।

॥ নিভৃত মনের চিন্তা-আলপনা ও ব্যথা-বেদনার প্রকাশ ॥

কবি-মানস ও ব্যক্তি-মানসের যৌগিক মিশ্রণে আধুনিক কাব্য বহ্নিমান। দু'য়ের মিশ্রণে সে পূর্ণাঙ্গ, দু'য়ের মিশ্রণে সে নিটোল মুক্তা। আধুনিক কাব্যে এই ব্যক্তিমানসের সংযোজনায় প্রাচীন কাব্যের সাথে তার এক দুরতিক্রমী ব্যবধান রচিত হ'য়েছে। প্রাচীন কাব্যের মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে ব্যক্তিবিলোপী বিষয়-মুখীনতার উন্মাদ কোলাহল—বিষয়কে পৃথক করে ব্যক্তিমানসের স্বাভাবিক লালন সে কাব্যে নেই। বিষয় কিংবা কাহিনীর প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তার অন্তরালে পড়ে কবির হৃদয়ের গোপন কথাটুকু অতল সলিলে সমাধি লাভ ক'রেছে। কিন্তু আধুনিক কাব্যের জয়যাত্রা সুরু হ'য়েছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের এই বলিষ্ঠ ঘোষণায়। কবির নিভৃত মনের গহনচারী কথাগুলি এ কাব্যে দূরাগত কল-গুঞ্জনের মত নিবিড় হ'য়ে এসেছে। আধুনিক কাব্য-সরোবরের সুনীল জলে কবির গোপন হৃদয়ের

কথাগুলি যেন ফুটে ওঠা লাজ-নম্র ভীরু কোরক। এই কোরক যেন বিষয়-বিলোপী ব্যক্তি-মুখীনতার বিজয়-তিলক।

মধুসূদনকে নিয়েই আমাদের সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের যথার্থ প্রস্তাবনা। অবশ্য নান্দীপাঠের ভূমিকা পূর্বে অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অসাফল্যের দিগন্তেই তাঁদের সে প্রচেষ্টা গুমরে মরেছে। মঙ্গলকাব্যের ঘটনা-মুখর বিষয়-মুখীনতার সুবিশাল সীমা-লীন ক্ষেত্রের মাঝে কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র বিঘোষিত হয়নি এবং তা' আশা করাও বোধ হয় আমাদের অন্যায়। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যক্তি-মানসের সুস্পষ্ট রেখাঙ্কনে সমুজ্জ্বল—এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন কিন্তু আমাদের মনে হয় এই উক্তির পিছনে যথার্থ বিচার নেই। রামী ধোবানীর প্রেম-সুধা পান না করলে হয়তো চণ্ডীদাসের পক্ষে এমন উচ্চস্তরের পদাবলী রচনা সম্ভব হ'ত না সত্য—কিন্তু এই পদাবলীতে আমরা চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-মনের কতটুকু পরিচয় পাই? রামী ধোবানী তাঁর পদাবলীর উৎসমূল হ'লেও রচনার কোথাও মানবীয় প্রেমের বিজয় ঘোষণা নেই। মানবীয় প্রেমের উপর এক স্বর্গীয় মোহাঞ্জন মিশে সকল প্রেমলীলাকে অলৌকিক করে তুলেছে এবং এই অলৌকিক প্রেমাবেগেই পদাবলীর কবি বনান্তরালে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পদাবলীর প্রেমগাঁথা তাই অশ্রু-সজল প্রেম-শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাস। এই প্রেমে হৃদয়াতিরেক এক ভাব-নিবিড় স্বর্গীয় অনুভূতি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। ব্যক্তি-হৃদয়ের সকল বাসনা কামনা সেই স্বর্গীয় প্রেমলীলার চরণ—প্রান্তে আত্মোৎসর্গ করে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পদাবলীর সর্বত্র তাই ঐশ্বরিক প্রেম অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে আভাসিত।

ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে ব্যক্তি-মানসের কিঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেও এ বিকাশ সীমিত। রচনার মধ্যে আপন হৃদয়ের কথা কোথাও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। এমন কী মধুসুদনেরও প্রথম দিকের কাব্যে কোথাও ব্যক্তি-হৃদয়ের গোপন কথাগুলি স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' কিংবা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মহাকাব্য সুলভ উদার গাম্ভীর্য ও অটল শৌর্য-বীর্য আপন বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছে। সেখানে একটানা চলেছে বীর-হুঙ্কারের দীপ্ত ঘোষণা, বেজেছে রণোন্মত্ততার নর্তনশীল ভৈরব, ঝংকৃত হ'য়েছে বজ্র অশনির ওঙ্কার-টঙ্কার। এই সব সৃষ্টির মর্মমূল হ'তে ভেসে এসেছে মহাকাব্যের উদাত্ত-গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল। কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের মৃদু-কম্পমান কথাগুলি এই বিপুল কল্লোলগানের অন্তরালে কখন কোন অলক্ষ্যে চাপা পড়ে গেছে। কবি এখানে মেতে উঠেছেন ইন্দ্রজিতের

বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ ভয়াল-সুন্দর রূপ দেখাতে, রাবণের অমিতবিক্রমের বহ্নিমান প্রকাশে, অসীম সাগরের প্রলয়োঙ্কর রূপ বর্ণনায়। একাব্যে ব্যক্তি-হৃদয়ের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের, ছোট ছোট ব্যথা-বেদনার কোমল-কোরক কই? 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্যের ভাব এবং বিষয়বস্তু প্রাচীনতার অনুসারী—কেবলমাত্র প্রকাশ ভংগীর সৌকমার্যে এরা আধুনিকতার দিগন্তে পদ-সঞ্চারের ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রকৃতিতে এরা মহাকাব্য, গীতি কবিতার রসলোকে এদের যাতায়াত নেই। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থ হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। ভাব, বিষয়বস্তু এমন কি প্রকাশ-ভংগীর দিক থেকেও গ্রন্থখানি পূর্বাপর সকল গ্রন্থের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করেছে। এই গ্রন্থে আমরা পাই কবি-মানসের সহজ প্রকাশ। ব্যক্তিমনের সকল সুখ-দুঃখের কথা, সকল ধ্যান-ধারণার স্পন্দন, কী নিঃসীম সারল্যেই না ভাব-জমাট হ'য়ে উঠেছে। উত্তাল তরঙ্গায়িত কর্মধারার তীব্রবেগ হ'তে সরে এসে কবি এই কাব্যে রচনা করেছেন অচঞ্চল ধ্যান-কল্পনার পুলক-শিহরণ! গর্জনোন্মুখ ঊর্মি-মুখর অসীম সমুদ্রের তীর-ভূমি পরিত্যাগ করে কবি চলে এসেছেন বনান্তরালের কুসুম-কুঞ্জে। এই নীরব কাব্য-কুঞ্জের সুরভিত ছায়া-তলে বসে কবি কুসুম চয়ন করেছেন আপন মনে—মালা গেঁথেছেন আপন খেয়াল-খুশীর রোমাঞ্চ-রঙীন রং মিশিয়ে। রণ-কোলাহল ভয়াল-নিনাদ 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের পার্শ্বে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাই নিভৃত মনের গান। আপন মনের গহনচারী চিন্তা-ভাবনার রূপায়নায় কবিতাগুলি মনোরম হ'য়ে উঠেছে। মহাকাব্যের সুবিপুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কবির কল্পনা পাগল হওয়া আরবী ঘোড়ার মত দাপট কেটে ছুটে বেড়িয়েছে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত্তে—গতির উন্মাদনায় সে প্রচণ্ড। কিন্তু "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে কবির কল্পনা যেন ভোরের কোকিল। শান্ত শুভ্র পরিবেশে ছায়াঘন আলো আঁধারের মিলন-লীলায় সে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সংগীত লহরীর অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে, দিবসের তীব্র আলোকে সে রুদ্ধ-বাক। চরম নীরবতাই তার কাম্য। এই নীরবতার মর্ম্মমূল হ'তে বেজে ওঠে গহনচারী কল্পনার সুমধুর অনুরণন। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে কবি আত্মস্থ। কল্পনার উচ্চগ্রামে সুর বেঁধে তিনি ভাবের ঘোরে উন্মাদ হ'য়ে উড়ে যান নি। কল্পনা-পক্ষীরাজের রাশ টেনে ধরে তিনি তাকে সংযত করেছেন—কল্পনার আলোকে আপন আত্মার অন্তরালবর্ত্তী অসীম সমুদ্রে অবগাহন করে তুলে এনেছেন অযুত মুক্তা। তাই এ কাব্যে ফুটে উঠেছে তিমিরাভিসারের স্বপ্ন-ঘন

চিত্র, ঘটেছে মনের সুপ্ত বাসনা-কামনার ছন্দিত রূপায়ণ।

কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের বাসনা-কামনার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য পাঠক-মনে এক দুর্নিবার আকাঙ্খা বিরাজমান। 'কাব্য-রস' ছাড়া 'ব্যক্তিগত রস' পাওয়ার আকাঙ্খা পাঠক মনে সদা জাগ্রত। বলা বাহুল্য "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" এই উভয়বিধ রস-তরঙ্গে স্পন্দমান। একদিকে কাব্য-রসের হ'য়েছে অনবদ্য প্রকাশ, অন্যদিকে ব্যক্তি-হৃদয়ের হাসি-কান্নার ঘটেছে সুমহান অভিব্যক্তি।

ব্যক্তিগত জীবনে অদম্য যশ-লিপ্সা এবং উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির জন্যে কবিকে বহু আঘাত সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল। যশ-লিপ্সার তীব্র আবেগে তিনি বাংলা ভাষার দ্বার পরিত্যাগ করে বলিষ্ঠতর ভাষার পদ-প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু যশ মেলেনি; লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কণ্টক-বন মাড়িয়ে কাঙাল-পনা পরিত্যাগ করে অবশেষে তিনি এলেন ছায়া-ঢাকা শ্যাম-শ্রী বাংলার বুকে। নিবিড় আকর্ষণে জড়িয়ে ধরলেন পরিত্যক্ত জননীর চরণ-প্রান্ত। 'বঙ্গ-ভাষা'য় ব্যক্তি-জীবনের এই বেদনাকুল পরিবেশের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে।

যশ-লিপ্সার যে অদম্য স্পৃহা কবির হৃদয়ে বাসা বেঁধে ছিল, বড় হওয়ার যে সুমহান স্বপ্ন তিনি আপন অন্তর-মূলে সযত্নে লালন করেছিলেন অনেকগুলি কবিতায় দেখি সেই ব্যক্তিগত ধ্যান-স্বপ্নেরই বাঙ্ময় প্রকাশ। 'সরস্বতী' কবিতায় তিনি দেবীর পাদ-পদ্মেরই স্মরণ করেছেন। 'নন্দন-কানন' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে কাব্য রচনার মূলশক্তিরূপী সরস্বতী দেবীর বন্দনা-গাথা:

> লও দাসে, হে ভারতী নন্দন-কাননে,
> যথা ফোটে পারিজাত, যথায় উর্বশী,—
> কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
> নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে;

সুবৃহৎ কোন ধ্যান-কল্পনা নয়, মহৎ কোন আশা-আকাঙ্খা নয়—কেবল দেবীর পদপ্রান্তে একটু আশ্রয়!

'সাংসারিক জ্ঞান' কবিতায় কবি অধিকতর ব্যক্তিগত। এখানে ব্যক্তিগত ভাব-মূর্চ্ছনায় কবিতাটি দোসরহীন অনন্য-সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। কাব্য-রচনাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করলে সংসারের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করা কখনো সম্ভব নয়। কাব্য-নিকুঞ্জে ছন্দ-পূরবীর তান অন্তরকে ব্যাকুল করে তোলে, পথভোলা উদাস পথিকের মত ঘরছাড়া করে পথের প্রেমে মাতিয়ে দেয়। তাই সংসারাসক্ত মানুষ যখন বিলাস-কক্ষে চরম প্রমোদে কাল যাপন করে তখন ঝড়-বাদলের ঝঞ্ঝা-দোলা উপেক্ষা করে বেদনা-বিধুর পথে কবিকে করতে হয়

পদচারণা। তাই কবি সংশয়াকুল চিত্তে প্রশ্ন করেছেন: "কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে—সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"

কিন্তু তবুও কবি এই বেদনার, এই চির দুঃখের পথকেই সানন্দে গ্রহণ করেছেন। বেদনার চির কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়েই আসে আনন্দ-প্লাবন, তিমিরাভিসারের ক্লান্তিঘন শিথিল চরণ-প্রান্তেই নত হয় উষার আলোক-বন্যা। সুতরাং শত আঘাত, শত ব্যথা-বিক্ষুব্ধতা ঝঞ্ঝার মত আলোড়ন তুলুক কবির বুকে—কবি সহনশীলতায় লৌহ-কঠিন-বক্ষ-পিঞ্জর প্রস্তুত রেখেছেন তার জন্যে।

আত্মবিলাপ জাতীয় অনেকগুলি কবিতায় কবি-হৃদয়ের ধ্যান-কল্পনা যেন একত্রিত হয়েছে শ্রীক্ষেত্রের মহা-সম্মিলনে। এই কবিতাগুলি যথার্থই নিভৃত মনের সঙ্গীত-মুখর ব্যঞ্জনা। আমরা জানি বাহ্য-জীবনে কবিকে বহুবার বহু পীড়ণ সহ্য করতে হয়েছে—এই অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা সময় সময় এত অধিক হয়ে উঠেছে যে, কবির কাব্য-জীবনেও তার ঢেউ এসে বেলাভূমিকে উদ্বেল করে দিয়েছে। বিশেষ করে শেষ বয়সে কবির দিনগুলি যেন বেদনা-ম্লান-ছায়াচ্ছন্ন সায়াহ্ন মুহূর্ত। সমগ্র জীবন জুড়ে বেদনার কী তীব্র আলোড়ন! কিন্তু এই সুতীব্র বেদনা বোধ, এই তীক্ষ্ণাগ্র আলোড়ন কবি সহ্য করেছেন আপন প্রাণ-প্রাচুর্যের বিশালতা দিয়ে। নিঃসঙ্গ বেদনাতুর দিনগুলিকে তিনি আপন প্রাণের উচ্ছল সজীবতায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এই হতাশা, এই অপরাহ্ণিক ছায়াচ্ছন্নতাকে তিনি জীবনে স্থায়ী হতে দেন নি—তবু সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে, সকল সজীবতাকে ম্লান করে জীবন-সমুদ্রের তীরে তীরে এই ব্যথা-বেদনার, এই গহনচারী দুঃখ-দারিদ্রের ম্লান ছায়াপাত ঘটেছে। যে সংঘর্ষ তাঁর জীবনকে বিধ্বস্ত করার উপক্রম করেছে, যে করালমূর্তি তাঁর জীবনী শক্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত—বহু দুর্বল মুহূর্তে কাব্যের মধ্যে তাদের প্রকাশ নিয়তির মত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 'নূতন বৎসর' তাই কবির চিত্তে কোন নতুন ভাবাবেগের সঞ্চার করতে পারে নি, কোন বিরল রহস্যের দ্বারোদঘাটন করতে সমর্থ হয় নি বরং অতীত দিনের সমুদয় ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত গ্লানিকে বয়ে এনে কবি-চিত্তকে মুহ্যমান করে তুলেছে:

> হৃদয় কাননে,
> কত শত আশালতা শুকায়ে মরিল,
> হায়রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে
> কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
> সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!

'নূতন বৎসরে'র পাদ-প্রান্তে কোন নতুন উৎসাহ-প্রাণ-চেতনা নেই—আছে বেদনা-বিহ্বল-স্পন্দন। আর একটি আবর্তন কালচক্রের নির্মম পেষণে সংযুক্ত

হয়ে কবির জীবনকে অন্তিম পরিণতির দিকে এগিয়ে দিল—এই বেদনা-বোধ আলোকোজ্জ্বল নতুন বছরকে ম্লানতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তাই 'নূতন বৎসরে'র আলো-ঝলমল নবোন্মেষে কবির চিত্তে নিঃশব্দে ঘটেছে ঘনান্ধকার নিশির পদসঞ্চার :

বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপে স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারারূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

'সমাপ্ত' কবিতায় দেখি আত্মবিলাপের আর এক রূপ। এ যেন আত্মবিলাপ নয়—আত্মোদ্ঘাটন। মহাকাব্য রচনার তীব্র স্পৃহা শেষ জীবন পর্যন্ত কবির চিত্তে ভাসমান ছিল. কিন্তু অন্তিম জীবনে তিনি মহাকাব্য রচনায় নিযুক্ত হতে পারেন নি। আজ জীবন-সায়াহ্নে সেই বহুবিচিত্র নিষ্ফল আশা-আকাঙ্খা, সেই ম্লান হতাশা ও ক্ষোভ একত্রিত হয়ে 'সমাপ্ত' কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের রূঢ় আঘাত, কুটিল ঘূর্ণাবর্ত অন্তরের সমুদয় অনুরাগকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। জীবনের উৎস শেষ হয়ে আসছে অথচ কবির নিখিল-বাসনা-কামনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কবি-চিত্ত তাই নৈরাশ্যের সুস্পষ্ট ছায়াপাতে ম্লান হয়ে গেছে :

বিসর্জিত আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয় মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !

ব্যক্তি-জীবনের কান্না হাসির কী অনবদ্য প্রকাশ !

'যশঃ' কবিতাও কবির অপরাহ্নিক জীবনের ম্লানতায় আবিল হয়ে উঠেছে। এখানেও কবির চিত্ত সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে বিচলিত। আজীবনের এই যে সাধনা. এই যে গানগাওয়া—এসব কী বৃথা ? কবিতাটির মর্মমূল হতে ব্যক্তি-হৃদয়ের এই ব্যাকুল প্রশ্ন উদ্বেল হয়ে ভেঙে পড়েছে :

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কিরে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?

মোট কথা "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে "মেঘনাদ-বধ"এর সেই প্রলয়োঙ্কার

নিনাদ নেই, সেই উদাত্ত-গম্ভীর ভাব বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। "মেঘনাদ-বধ" কাব্য যেন অসংখ্য তার-সংযোগে গড়া অপূর্ব বীণা-যন্ত্র, প্রতিটি তারে অপূর্ব ধ্বনির সুরময় স্পন্দন। সবার মিলনে যে ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে তা অপূর্ব নিঃসন্দেহে—কিন্তু প্রতিটি তারের স্বতন্ত্র ধ্বনি সেখানে নেই। তাই এই সম্মিলিত তান আমাদিগকে আবেগ-উদ্বেল করে তুললেও মনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" যেন একতারা—একটি মাত্র তার এ কাব্যের প্রাণ-স্পন্দনকে সুনিবিড় মায়াঞ্জন-স্পর্শে জীবন্ত করে তুলেছে। তাই সরল সহজ সুরের সংগীত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" আমাদের সমগ্র চিত্তকে সুধা-সিক্ত করে তোলে। বিচিত্র সুর-ঝংকারের সমাবেশের জন্যে মহাকাব্যে কবিকে ছুটতে হয়েছে স্বর্গে-মর্ত্তে, আকাশে-পাতালে—কিন্তু চতুর্দশপদীতে তার প্রয়োজন হয় নি। 'বউ কথা কও', 'দেবদোল', 'সায়ংকাল', 'সায়ংকালের তারা','নিশা', 'ছায়াপথ', 'তারা', ইত্যাদি অতিপরিচিত বিষয়গুলিই কবিতাবলীতে প্রাণস্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বাহিরের ধ্যান-চিন্তা নয়—অন্তরের নিঃসীম কল্পনাই এ কাব্যের প্রাণসত্তা। মহাকাব্য তাই বাহিরের উন্মাদ নর্ত্তন, চতুর্দশপদী অন্তরের সুমহান সংগীত। মহাকাব্যে হয়েছে বহির্লোকের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের সুতীব্র আলোড়ন, চতুর্দশপদীতে ঘটেছে অন্তর্লোকের সুপ্ত ধ্যান-ধারণার ছন্দিত আন্দোলন। রণং দেহি "মেঘনাদ বধে'র পাশে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাই নিভৃত মনের গান।

॥ তিন ॥

॥ "চতুর্দশপদী"র স্বাদেশিকতা ॥

স্মৃতির রোমাঞ্চ-রঙীন স্বর্ণ-গোধূলির সাথে অবচেতন মানব-মনের এক সুনিবিড় রহস্যময় যোগ আছে। সুদূর অতীতদিনের ঘনায়মান স্মৃতিই কবির কল্পনায় বেগ দেয়। সাহিত্যজগৎ তাই স্মৃতিরই জগৎ। সাহিত্যের দিগন্তলীন-সাম্রাজ্যে আমরা প্রধানতঃ স্মৃতি-প্রাসাদেরই অধিবাসী। তাই নিভৃত গৃহাঙ্গণে যখন আমাদের মন একান্ত শূন্য হয়ে পড়ে তখন স্মৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে, তার সমুদয় বর্ণ-গরিমা নিয়ে আমাদের চিত্তের ধূসর শূন্য-প্রান্তরকে ব্যঞ্জনালোকে পরিপূর্ণ করে তোলে। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" স্মৃতির এই বিরল-সৌন্দর্যে

দুষ্প্রাপ্য-সুন্দর। সমগ্র গ্রন্থখানি স্মৃতির লীলা-বৈচিত্রে পরমাশ্চর্যের দিগন্ত স্পর্শ করেছে। পাঠ-কালে স্মৃতির মৃদু মৃদু স্পন্দনে আমাদের সমগ্র-সত্তা কম্পমান হয়ে ওঠে। স্মৃতিই যেন পাঠকের মানসলোকে এক আশ্চর্য্য মনোহর বিপুল জগতের রূপে উজ্জ্বল, সে জগৎ মনোহর।

কবির নিভৃত মনের গহনচারী স্মৃতিগুলি আপন খেয়াল খুশীর আমেজে মেতে উঠেছে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ইত্যাদি স্ব-প্রীতিমূলক কবিতাগুলির মাঝে। স্বদেশ এবং স্ব-সংস্কৃতির প্রতি কবির যে একটি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র বহুতর কবিতার প্রাণস্পন্দনে তার নিগূঢ় বার্ত্তা ধ্বনিত হয়েছে। সুদূর ফরাসী দেশের ভরসেলস্ সহরে বসে লেখা কবিতাবলীতে তাই ফরাসীদেশের বরফ-পাতের কোন সৌন্দর্য-বর্ণনা নেই, উইলো বৃক্ষের পত্র-পল্লবের সকল নৃত্য বৃথা, কবি-প্রিয়া ডেফোডিলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কী চরম নিষ্ফলতা! এমন কী স্কাইলার্ক কিংবা শোয়ালো পাখীও তাদের অমৃতনিঃসন্দী সংগীত-সুষমায় কবি-চিত্তকে জয় করতে পারে নি। প্রকৃতির এই অপরিসীম বণবেগ-মনোহারিত্বের সকল গরিমা ভেদ করে কবির চিত্তে ভেসে উঠেছে গহনচারী স্মৃতি-সত্তার অনবদ্য আন্দোলন; শ্যামলিমার আচ্ছাদনে শ্যামাঙ্গ-উজ্জ্বল বঙ্গভূমির অপরূপ ধ্যানমূর্তি। তাই ফ্রান্স-জাত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে দেখি বরফপাতের বদলে নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার নীরব পদসঞ্চার, উইলো বৃক্ষের চঞ্চল ছায়া-নৃত্যের স্থলে বিশাল বটবৃক্ষের বিপুল পত্র-পল্লবের সঘন আলোড়ন, ডেফোডিলের সকল সৌন্দর্যকে ম্লান করে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে কেতকী-শেফালীর চির-স্নিগ্ধ হাসি। এমনকি বাঙালী গৃহ-প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ছায়া-ঢাকা বৃক্ষান্তরাল হ'তে ছোট্ট হলুদ পাখীর 'বৌ কথা কও' সুরেলা-মধুর আহ্বানটি স্কাইলার্কের সকল মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুমেরু শিখর কিংবা পৃথিবীর যে কোন দূরতম প্রান্তে বসে যখনই আমরা ছায়া-সুনিবিড় বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী এই ছোট্ট পাখীটির ডাক শুনতে পাই, তখনই আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ দুরতিক্রমী সকল ব্যবধান ঘুঁচিয়ে শ্যামল বাংলার চরণ-প্রান্তে সসম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ে। দূরত্বের কোন ব্যবধান, প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যের কোন আবরণ, কবির ধ্যান-স্বপ্নকে ম্লান করে দিতে পারেনি। তাঁর গহন মনের অন্তরাল দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত স্বদেশ-প্রেমের যে অখণ্ডধারা দুরন্ত আবেগে প্রবাহমান ছিল—"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সেই নিঃসীম প্রাণাবেগেরই বাঙ্ময় রূপায়ণ। "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি"র যে সুমহান ছবি কবির অন্তঃ-প্রকৃতির মাঝে

আশৈশব ছায়াপাত করেছে, কপোতাক্ষের প্রভাত-সন্ধ্যার যে বিশাল রূপ-ঐশ্বর্য চিত্তের গহনতম প্রান্তে স্বর্ণরেখার মত ছড়িয়ে পড়েছে—কেবল ফ্রান্সে কেন স্বর্গের অমৃতবাহী নিকুঞ্জের মাঝে অবস্থান করেও এই স্বপ্ন-মন্থর সোণালী দিনকে ভোলবার দুঃসাহস কবির নেই। এই চিত্র যে সাগর-মন্থন নিটোল মুক্তা! তাই যশোলিপ্সার উন্মাদ স্পৃহায় কবি স্বদেশ ত্যাগ করে যখন বিদেশে ছুটে গেছেন—স্মৃতি-অবগাহী এই চিত্রগুলিও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। এবং এই চিত্রগুলি বিদেশে কবির নিঃসঙ্গ জীবনে অপূর্ব আলোড়ন এনেছে। প্রিয়জন দূর প্রবাসে চলে গেলে তার স্মৃতি, তার প্রেম আমাদের চিত্তকে অধিকতর নিবিড়তায় আকর্ষণ করে। নিত্য দিনের সঙ্গ-সুখে মিলনের পরিপূর্ণতায় যে অমৃত-স্পর্শ অনুভব করা যায় না, দূরত্বের ব্যবধানে, বিরহের মাঝে তাই শত ভাব-ব্যঞ্জনায় বিমূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। দূর-প্রবাসে প্রিয়জন স্মৃতি-আশ্রয়ী। স্মৃতির পটভূমিতে সে অধিকতর মনোহর। দিবসের তীব্রোজ্জ্বল সূর্যালোকে যার কোন বিশেষ রসমূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে না রাত্রির অস্পষ্ট কুহেলীতে তাই বিস্ময়-রঙীন দোসরহীন অনন্তসুন্দর হ'য়ে উঠে। ব্যবধান এই অস্পষ্ট আবরণের স্রষ্টিকারী। ফ্রান্সের দূর-প্রবাসে বিসর্জিত হ'য়ে কবি-চিত্তেও এমনি এক আবরণের সৃষ্টি হ'য়েছিল। বন-সবুজ বাংলাকে দীর্ঘদিন ছেড়ে থাকায় কবির চিত্ত কপোতাক্ষের তীরভূমি দেখার জন্যে ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—তার উপর প্রবাসের নানা অসহনীয় অভাব-অভিযোগ তাঁর এই আকর্ষণকে তীব্রতর করে তুলেছিল। অর্থাভাবের তীব্র কশাঘাতে ক্লান্ত দেহ বাংলার শ্যামল মৃত্তিকা-স্পর্শের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। ঐ ছায়াছন্ন ছোট্ট গৃহগুলিতেই যেন অঢেল প্রেমের সুমধুর প্রলেপ। তাইতো বাংলার জন্য কবির স্মৃতিচারী মন ব্যাকুল। ক্লান্তদেহে সজল নয়নে তাই কবি ব্যাকুল হ'য়ে গেয়ে ওঠেন:

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

বহুদেশের বহু নদ-নদীতে কবি পাড়ি জমিয়েছেন, ভ্রমণের ব্যাকুল নেশায় উর্মি-মুখর দিগন্তলীন সমুদ্রের অন্যতীরেও পদ-সঞ্চার করেছেন কিন্তু কুলকুল-নাদী সেই যে ছোট্ট কপোতাক্ষ নদ—কী অমোঘ তার আকর্ষণ, কী বিপুল শান্তি তার উভয় তীরে। সে শান্তির অমিয়-স্পর্শ দেবে কে?

বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।

এই যে আবেগবাহী বর্ণনা এতো কেবল কাব্যের খাতিরে ঘটেনি, এযে কবির অন্তরবাণী, বিরহী অন্তরের করুণ ক্রন্দন, স্বদেশ-প্রীতির বাঙ্ময়-প্রকাশ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে, সুনীল নভে তারকারাজির বিচিত্র সঞ্চারণ—ভর্‌সেলস্ সহরের এই দৃশ্যে কবির চিত্তে ভেসে উঠেছে নদীর তীরভূমে ভগ্ন শিব মন্দিরের ঘনায়মান অন্ধকার আর 'নূতন গগনে যেন নব তারাবলী'র অভিনব স্পন্দন। স্বদেশের তৃণলতা, পক্ষী প্রভৃতি সকলের সাথে কবির যে আত্মিক প্রেম-ঘন যোগ ছিল 'বটবৃক্ষ', 'বৌ-কথা কও' সেই স্বীকৃতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

স্বজাতি-প্রীতির অভিনব প্রকাশ "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র আর একটি মূল্যবান সম্পদ। এই অত্যাশ্চর্য সনেট-গুচ্ছের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সনেট স্বজাতি-প্রীতির বার্ত্তা বহন করে চলেছে। বাংলার ভাষা, বাংলার সাহিত্যের প্রতি কবির কী নিবিড় আকর্ষণ! বাংলার মনীষী, বাংলার কবির প্রতি তাঁর কী গভীর শ্রদ্ধা! এর পালা-পার্বণের প্রতিই বা তাঁর কী নিঃসীম নিষ্ঠা! এই সকল আকর্ষণ, এই সকল শ্রদ্ধা, সকল নিষ্ঠা, অস্ফুট কলগুঞ্জনে কবির স্বদেশপ্রীতির সুগভীর আন্তরিকতাকেই মহিমান্বিত করে তুলেছে। বাংলাভাষাকে ত্যাগ করে "পরধন লোভে মত্ত" হওয়ার সুতীব্র বেদনাবোধ আমরণ কবির বুকে বজ্রশেল হ'য়ে বিঁধেছে। এই পরিতাপের কথা তিনি অসংখ্য কবিতায় প্রকাশ করেছেন! 'কাশীরাম দাস', 'কৃত্তিবাস', 'জয়দেব', 'কালিদাস', 'ঈশ্বর গুপ্ত', 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি কবিতায় মধুসূদন বাংলা কবি মনীষীদের প্রতি যে ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা' কবির স্বজাতি-প্রীতির চরম-আলেখ্য। এই কবিতাগুলির অদৃশ্য যোগসূত্রের পথ বেয়ে কবির অন্তরের নিঃসীম শ্রদ্ধা ও আকুতী স্বজাতি-প্রীতির চরণ-প্রান্তে উজাড় হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বাংলার ছোট ছোট পালা পার্বণকে কেন্দ্র করে সুদূর ফরাসীর বুকে বসেও কবির চিত্তে যে অপূর্ব ভাবোম্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোনক্রমেই স্বদেশপ্রীতির দিগন্ত হ'তে বহিষ্কার করে দেওয়া চলে না। এই ছোট ছোট ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে কষ্টি পাথরের বুকে মনোরম রেখার মত কবি-চিত্তের স্বজাতিমুখীনতা অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলেও স্বধর্মের প্রতি কবির যে একটি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল—"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র অনেকগুলি কবিতায় তার পরিচয় পাই। 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিজয়া দশমী', 'আশ্বিন মাস', 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যে এই পরিচয় বিমূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নিভৃত মনের ধ্যান-

কল্পনার কী ব্যঞ্জনগর্ভ প্রকাশ! দূর-প্রবাসের বেদনাবিধুর দিনগুলিতে সুদূর বাংলাদেশের প্রতিটি মাসের মনোরম মাধুর্য কবির অন্তর্লোক স্পর্শ করে গেছে। পূজাপার্বণের দিনগুলিতে তাই কবির চিত্ত অভিনব ভাবাবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। তাঁর ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে শান্ত বাংলার সেই উৎস-মুখর পূজা-পার্বণের মধ্যে যোগ দিতে—কিন্তু কোথায় সে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল বাংলার কোমল অঙ্গ? আশ্বিন মাসের আগমনে কবি-চিত্তে নিঃশব্দে নেমে আসে কী অপরিসীম বেদনাবোধ! দুর্গাপূজার অসীম আনন্দ-গীতি, প্রতিমার বিচিত্র সৌন্দর্য-কল্পনা কবির চিত্তকে নেপথ্যলোক হ'তে দুর্নিবার আকর্ষণে ক্রন্দন-ফেনিল করে তোলে। সুদীর্ঘ একটি বছরের দুঃসহ বিরহের পর আজ আবার বাঙালীর ঘরে ঘরে হ'য়েছে স্নেহদুলালী উমার পদসঞ্চার। তাই: "সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।" "বিজয়া দশমী" তিথিতে নিখিল বাংলায় যে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয় এই কবিতার অল্প পরিসরে সেই অতলস্পর্শী বিরহ সুতীব্র নিপুণতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। উমাকে হারাবার আশঙ্কায় কবি-চিত্ত বেদনা-ব্যাকুল। তাই নবমী-নিশার প্রতি তাঁর অন্তিম আকুতি:

> "যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারা দলে!
> গেলে তুমি, দয়াময়, এ পরাণ যাবে!"

এ কবিতায় নিখিল বাঙালী মানসের সাথে কবি-মানস শ্রীক্ষেত্রের মহাসম্মিলনে মিলিত হ'য়েছে। 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'শ্রীপঞ্চমী', ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যেও হিন্দু-ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার অবিরল বারিধারার মত নিঃশব্দে প্র-পতিত হয়েছে। মধুসূদন খৃষ্টান হ'য়েছিলেন—কিন্তু 'এহ বাহ্য'। আসলে তাঁর অন্তরে আবাল্য লালিত যে ধর্ম ও সংস্কৃতির বীজ রোপিত হ'য়েছিল তাই পরবর্ত্তী কালে বিশাল বিটপীতে পরিণত হয়েছিল—পত্র-পল্লব-ঘেরা-ছায়াঘন সেই বিটপীর শান্তছায়ায় কবির আত্মা শান্তির স্পর্শ পেয়েছে। রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মধুসূদন লিখেছেন: My real feeling is Hindoo." এই Real Hindoo feeling কবিকে বারবার বাংলার সরস মৃত্তিকার মাধুর্য রস-সঞ্চিত শান্ত-জীবনযাত্রার দিকে আকর্ষণ করেছে। এবং সেইজন্যই নিয়তির মত অনিবার্য কারণে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র মাঝে স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্মের প্রতি গভীর আন্তরিক প্রীতি বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডাঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কবিতাগুলিকে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক বিচার বিশ্লেষণ করে এগুলিকে স্বদেশ-স্বধর্ম-স্বজাতি

ভাবধারা প্রকাশের পটভূমিকায় না দেখে কাব্যরসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বধর্ম-স্বজাতি অপেক্ষা কাব্য-রসই হ'লো এ কাব্যের প্রাণ-সম্পদ। কবিদৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলেই কবির কাছে 'নিশাকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষ তলে শিব মন্দির' পরম রহস্যের আবরণে মোড়া, 'আশ্বিন মাস' তাই হৃদয়-বেগে রোমাঞ্চিত। আপন শিশুকন্যার প্রতি কবির যে বাৎসল্য প্রেম স্নেহদুলালী উমাকে সেই প্রেমের মাধুর্যালোকে দেখেছিলেন বলেই 'বিজয়া দশমী' অনন্য সাধারণ। উদার কবি দৃষ্টির অন্তরালে যে আর এক মধুর স্মৃতির কথা ডক্টর দাসগুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন তা' উদার কবি জনোচিত মহৎ চিন্তাধারার প্রতীক। অন্ততঃ এই ভাবে দেখলে "চতুর্দশপদী কবিতাগুলী"র কবিতা গুলি স্বজাতি ও স্বধর্মের সীমিত গণ্ডী হতে মুক্তি পেয়ে উদার সংস্কার মুক্ত দিগন্তলীন মুক্ত প্রান্তে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু তবুও কবিতাগুলি যে কেবলমাত্র কবিদৃষ্টিজাত ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ এবং এই ভাব সম্পদের অন্তরালে যে স্বজাতি-স্বদেশ-স্বধর্মের কোন ভাব-প্রেরণা বেগ সঞ্চার করেনি এমন কথা সহজে স্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে হয় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র সনেটগুলির কোমল বক্ষ কবিদৃষ্টি এবং সংস্কার এই উভয়ের সংমিশ্রণে চির সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। কেবল মাত্র কবিদৃষ্টি দিয়ে "বিজয়া দশমী"র মত অশ্রুসিক্ত কবিতা লেখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। চণ্ডীদাস যদি পরম বৈষ্ণব না হতেন তা' হ'লে তাঁর কবিতার মধ্যে কখনো শাশ্বত কালীন করুণ ক্রন্দন শোনা যেত না। বৈষ্ণবের পরম হৃদয় বেগের সাথে বিরল কবি বৈশিষ্টের মহান সম্মিলন ঘটেছিল বলেই চণ্ডীদাসের কবিতা প্রেম-পাগল পথিকের অশ্রুসজল ইতিহাস। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তেও হৃদয়াবেগের সাথে কবি বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠতম মণিকাঞ্চন সংযোগ সাধিত হ'য়েছে। সাধারণ বিষয় নিয়ে কবি যে সকল কবিতা লিখেছেন সেগুলির মধ্যে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি।—কিন্তু যে কবিতাতে স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্ম এবং স্বসংস্কৃতির স্পর্শ আছে সেখানেই কবি সরব, উচ্চকণ্ঠ এবং আবেগোন্মত্ত। এই অন্তরবাহী আবেগোন্মত্তায় কবিতাগুলি এক বিশেষ রঙে রঙীন হ'য়ে উঠেছে। তাই "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র আঙ্গিক বৈচিত্রে কবি দৃষ্টির সকল কিছু স্বীকার করে নিয়েও স্বদেশ-স্বজাতির প্রভাবকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কবিতাবলীর মর্মমূল ভেদ করে স্বদেশ প্রেমের ফল্গুধারা দুরন্ত আবেগে প্রবাহমান। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে "চতুর্দশপদী

কবিতাবলী” স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্মের প্রেম-প্রীতি আলচ্যের এক বিরলদৃষ্ট মূল্যবান সংযোজনা।

॥ চার ॥

॥ “চতুর্দশপদী কবিতাবলী”তে উপমা প্রয়োগ ও অন্যান্য চিন্তা ॥

মধুসূদনের পদ্য-রীতি সুকর্ষিত। বাক্‌-বিন্যাসের সুতীক্ষ্ণ আলাপ-চারণায় তাঁর কবিতা বুদ্ধিদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। সুসামঞ্জস্য শব্দ প্রয়োগে এবং উপমা ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল বিন্যাসে তাঁর কবিতা দুর্লভ রমণীয় অনন্ত সাধারণের কোঠায় পদার্পন করেছে। উপমা প্রয়োগে মধুসূদন যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির কাব্যে তার আভাস লক্ষ্য করা যায়। কবির অন্যান্য কাব্যের মত “চতুর্দশপদী কবিতাবলী”-ও উপমা অলংকারের যথাযথ বিন্যাসে অভিনব হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই উপমা অলংকারগুলি দুরতিক্রমী পর্বতশৃঙ্গের মত মস্তক উত্তোলন করে যে কাব্যের সাবলীল গতিতে বাধাদান করেনি তা' নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমাগুলি হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত তীব্রোজ্জ্বল হয়ে কাব্যের বন্ধুর পথের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করেছে।

প্রকৃতির দিক থেকে উপমাগুলি পুরাণানুগ—রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি বহু পুরাণ গ্রন্থ থেকে কবি উপমাগুলি সংগ্রহ করেছেন। প্রাকৃতিক কিংবা অন্যান্য বিষয়ের উপমা যে কবির কাব্যে নেই তা নয়—কিন্তু সে সকল ছাপিয়ে পুরাণানুগ উপমার দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কী মেঘনাদ বধ, কী তিলোত্তমা সম্ভব, কী চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সর্বত্রই এই জাতীয় উপমা-অলংকার আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। “চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী” তো পুরাণেরই খণ্ড চিত্র। বহু বিখ্যাত “কাশীরাম দাস” কবিতার প্রথমেই কবির উক্তি এই :

> চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি
> জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,...

বলাবাহুল্য এ উপমা মহাভারত হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে। “কৃত্তিবাস” কবিতায় রামায়ণ হ'তে যে উপমা নেওয়া হ'য়েছে তা এই :

> ...ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
> সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;

“নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির” কবিতার প্রথম লাইন :

> রাজ সূয় যজ্ঞে যথা রাজদল চলে
> রতন-মুকুট শিরে ; ...

এমনি করে অসংখ্য পুরাণ-গ্রন্থের ঘটনাকে কবি উপমা হিসেবে গ্রহণ করেছেন 'চতুর্দশপদী'র সর্বত্র। প্রায় প্রতিটি কবিতায় পুরাণ গ্রন্থের কোন না কোন খণ্ড চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। পুরাণ গ্রন্থগুলি কবি-মানসে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এই উপমাগুলি তার সফলতম দৃষ্টান্ত। কেবল উপমাই নয় চণ্ডীমঙ্গল—রামায়ণ—মহাভারত—পুরাণ ইত্যাদির বহু ঘটনাকে কবি মূল-কাব্যের বিষয়ীভূত করেছেন। 'কমলে কামিনী', 'ঈশ্বর পাটনী', 'অন্নপূর্ণার, ঝাঁপি', 'গদা যুদ্ধ', 'সীতা-বনবাসে', 'সুভদ্রা-হরণ', 'উর্বশী', 'পুরুরবা', 'হিড়িম্বা', 'সুভদ্রা', ইত্যাদি কবিতাগুলি পৌরাণিক চিত্র-গরিমায় অনন্য সাধারণ বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

'চতুর্দশপদী'তে আরো অনেকগুলি কবিতা আছে যে গুলি জাতকুলের অতীত। এর মধ্যে কতকগুলি নীতি মূলক জাতীয় কবিতা বিশেষ রূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বট বৃক্ষ', 'দ্বেষ', 'কুসুম কীট', 'শ্মশান', ইত্যাদি কবিতাগুলি বিশেষরূপে স্মরণ যোগ্য। 'শ্মশান' কবিতায় বাঙালী মানসের চির বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হ'য়েছে :

কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।

ঈশ্বরের স্বরূপ উদঘাটনের জন্যে কবি কয়েকটি সনেট লিখেছেন—তন্মধ্যে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' এবং 'সূর্য্য' কবিতা বিশেষ আকর্ষণীয়। 'সৃষ্টিকর্ত্তা' কবিতায় বিশ্বসৃষ্টি কর্ত্তার পরিচয় জানার জন্যে কবি ব্যাকুল :

কে সৃজিল এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" অসংখ্য ধ্যান-ধারণার চিত্রে সমুজ্জল। কিন্তু প্রত্যেক ধ্যান-ধারণাই কবিতার গণ্ডীতে যথার্থভাবে রূপায়িত হ'তে পারে নি। কোন কোন ধ্যান-ধারণা শিথিল বাক-বিন্যাসে ম্লান। কোন কোন ধ্যান-ধারণা উপমা-উৎপ্রেক্ষার ঢক্কা নিনাদে সমূলে বিনষ্ট হ'য়েছে। তবুও যে সব কবিতায় কবির অন্তরাবেগ সরল সহজ হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে, সার্থক কবিতা হিসেবে সেগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রজ্ঞা-দীপ্তিতে এবং কলা নিপুনতায় গহনচারী স্মৃতি কল্পনাবাহী কবিতাগুলি তীব্রোজ্জ্বল দীপালোকের মত জ্বলেছে অনির্বান। আঙ্গিক বৈচিত্রে এবং হৃদয়াবেগ-সিক্ত নিভৃত মনের সংগীত সুষমায় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সার্থক এবং সফলতম। এই শ্রেণীর কবিতাবলীতে কবির জীবন-সায়াহ্নের পূরবীর ধ্বনি করুণ হ'য়ে বেজেছে।

॥ কমলাকান্তের দপ্তর ও বিবিধ প্রবন্ধ ॥

॥ এক ॥

॥ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ॥

সর্বশ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের উদয়-বিলয়ের সুবিস্তৃত কাল-পরিধিটুকু উনিশ-শতকী রেনাশাঁর সুবিপুল উন্মাদনা এবং নব জাতীয় জাগরণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে কষ্টি-পাথরে উজ্জ্বল স্বর্ণরেখার মত সম্প্রসারিত। একদিকে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক গোঁড়ামী ও ভণ্ডামীর কারাপ্রাচীর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে উদ্যত অন্যদিকে কুসংস্কার ও অন্ধতা সংহারিণী মূর্ত্তিতে তার পথ রোধ করতে উদ্ধত-ফণা—এই উভয়-বিধ আপাতঃ বিরোধ ও বিরূপতার মাঝে বঙ্কিম-মানস লালিত হ'য়েছে। কিন্তু এই উভয়বিধ বিরোধের কোনটাই বঙ্কিমচন্দ্রকে উগ্রতার তীব্র ঝাঁজে অন্ধ করে দিতে পারেনি—উনিশ শতকের প্রশ্ন-চঞ্চল সংঘাত-সংকুল বিক্ষিপ্ত জীবন-যাত্রার মধ্যেও বঙ্কিচন্দ্রের সদর্প-কণ্ঠ ও প্রত্যয়-নিষ্ঠ পদক্ষেপ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। "কমলাকান্তের দপ্তর" এবং "বিবিধ প্রবন্ধ" এই দুই খ্যাত গ্রন্থ সেই সুস্পষ্ট পদ-চিহ্নের বাণী-বন্দনা।

স্তর বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-শ্রেণী বহু বিভক্ত—সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বহু বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে এই সমুদয় সৃষ্টি দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন বহির্জীবনের কথা অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর অন্তর্জীবনের ধ্যান-চিত্র। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছেন সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য প্রশ্ন, তর্ক করেছেন তার্কিকের মত, বিচার করেছেন নৈয়ায়িকের উচ্চাসনে বসে এবং সর্বোপরি এই সকল তার্কিক-তাত্ত্বিকতার সার নিষ্কাসন করে আমাদের দিগ্-ভ্রান্ত দৃষ্টি ও মনের উপলে দিয়েছেন জটিল প্রশ্ন-সমাধানের অভ্রান্ত ইসারা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আপন ধ্যান-কল্পনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল বিশ্বের বুকে, প্রশ্ন-সংকুল জিজ্ঞাসায়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বহির্লোকের এই বিক্ষিপ্ত ধ্যান-চিন্তাকে সংযত করে নিয়ে গিয়েছেন অন্তর্লোকের রোমাঞ্চ-রঙীন মায়া ভূমিতে—কল্পনার রামধনু হতেই

তিনি সংগ্রহ করেছেন এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বর্ণ-সম্ভার এবং রূপৈশ্বর্য। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বিষয় বস্তু অতি সাধারণ, অতি ক্ষীণ এবং তুচ্ছ—তবুও সেই নগণ্য বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি বঙ্কিমচন্দ্র উর্ণনাভের মত কল্পনার জাল বয়ন করেছেন। তুচ্ছ বিষয়বস্তু একেবারেই তুচ্ছতায় পরিণত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার অন্তরাল হ'তে প্রধান হ'য়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি মানস। তাঁর ব্যক্তি হৃদয়ের গোপনতম কথা ও অনুভূতিগুলি যেন এই শ্রেণীর প্রবন্ধাবলীতে বাংময় হ'য়ে উঠেছে। পঙ্কে জন্মগ্রহণ করেও সকলের অলক্ষ্যে পঙ্কজ তার দেহ হ'তে সমুদয় মালিন্য ঝেড়ে ফেলে দলগুলিকে মেলে ধরে নীল আকাশের উদার বিপুল অসীমতায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এমনি করেই তাঁর কল্পনার শতবর্ণ-দীপ্ত দলগুলিকে মেলে ধরেছেন পাঠকের বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে।

বিবিধ প্রবন্ধ এই প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধের অন্তর্গত আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধের মর্ম-নির্যাস নিয়ে গড়ে উঠেছে কমলাকান্তের দপ্তর। এই দুই মহাসৃষ্টি তাই বঙ্কিমচন্দ্রে দুই বিশেষ দিকের সীমা-দর্শী হ'য়ে আছে।

বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গবেষক, চিন্তাশীল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে গভীর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে পরিশীলিত হ'য়ে প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আবেগ-বিরল তথ্যদর্শী হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি-হৃদয়ের গোপন কথা নয়—একটা সমগ্র দেশ এবং জাতির উত্থান-পতনের চিন্তা-ভাবনাই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সূতিকাগার। একটি স্থিতপ্রজ্ঞ বিচারক সত্তাই এই সকল প্রবন্ধে প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি আদর্শ দেশ এবং জাতিগঠনের গুরুদায়িত্ব যেন বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে সম্পন্ন করেছেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র গুরু, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তানায়ক। ব্যক্তিত্ব নয়—নৈর্ব্যক্তিকতার প্রকাশেই বিবিধ প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কমলাকান্তের দপ্তরে প্রধান হ'য়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব। লিরিকের লাবণ্য-লহরীতে কমলাকান্তের দপ্তর অনন্যসুন্দর। রূপদ্রষ্টা এবং রূপস্রষ্টা এখানে এক হ'য়ে মিশেছে। প্রত্যেকটি রচনা মন্ময়ধর্মী, আত্মকেন্দ্রিক—Subjective। এ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মাধীন বিচারক নন—বন্ধনহীন শিল্পী, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নন—রূপমুগ্ধ কবি। আপন মনের চিন্তা-ভাবনা তাই লিরিকের সুকোমল সুরে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। এখানেই বিবিধ প্রবন্ধের সাথে কমলাকান্তের দপ্তরের পার্থক্য-কৌণিকতা রচিত হ'য়েছে।

'বিবিধ প্রবন্ধ' যেখানে কেবল মাত্র প্রবন্ধই 'কমলাকান্তের দপ্তর' সেখানে নিরস প্রবন্ধের দিগন্ত অতিক্রম করে সাহিত্যের রসলোকে করেছে পদসঞ্চার।

॥ দুই ॥

॥ কমলাকান্তের দপ্তর ॥

(কমলাকান্তের দপ্তর কবি এবং শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি।) কিন্তু সাহিত্যের দিক ছাড়াও কমলাকান্তের দপ্তরের আর একটি বিশেষ দিক হ'লো এর হাস্যরস। হাস্যরসের অফুরন্ত ধারায় এর প্রতিটি পৃষ্ঠা সমুজ্জল হ'য়ে উঠেছে। ঋষি এবং নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ওষ্ঠাধরের অন্তরালে যে হাস্যরসের অফুরন্ত আবেগ ও লঘু চাপল্য লুকিয়ে ছিল কমলাকান্তের দপ্তর না পেলে আমরা হয়তো তা' কোন দিনই বিশ্বাস করতাম না।) হাসির অনাবিল স্রোতে দোল খেয়ে প্রত্যেকটি কথা ও মন্তব্য একান্ত সজীব এবং প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ হাস্যরসকে চার স্তরে ভাগ করেছেন—Satire, Pun, Wit এবং Humour। এই চার স্তরের হাস্যরসের মধ্যে প্রধান হাস্যরস হ'লো হিউমার বা করুণ হাস্যরস। কমলাকান্তের দপ্তরের অধিকাংশ সৃষ্টি করুণ হাস্যরসের অনবদ্য সংযোজনায় ভাস্বর। সকল আপাতঃ বিরূপ মন্তব্য ও আঘাত হাস্যরসের স্নিগ্ধ ধারায় সিক্ত হয়ে কোমল এবং মধুর হ'য়ে উঠেছে। আঘাৎ এবং আনন্দ, হাসি এবং বেদনা এই পরস্পর বিরোধী ভাবরসের একত্র সংযোজনায় কমলাকান্তের দপ্তর দুষ্প্রাপ্য মনোহরের কোঠায় পদার্পণ করেছে।)

হাস্যরস কমলাকান্তের দপ্তরের একটি বিশেষ দিক হলেও হাস্যরসের তরল প্রবাহেই দপ্তরের মূল বক্তব্যটি পরিসমাপ্ত হয়নি—এই তরল হাস্য-প্রবাহ সুকঠিন তটরেখায় আবদ্ধ হ'য়ে দার্শনিক তত্ত্ব-সাগরের মিলন-মোহনায় দিক হারিয়েছে। হাস্যরসের ভিতর দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর তত্ত্বকথা পরিবেশন করাই আপাতঃ মূঢ় কমলাকান্ত শর্মার মূল লক্ষ্য এবং এখানেই ছন্নছাড়া কমলাকান্ত শর্মার সাথে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট ভেদ-রেখা গড়ে উঠেছে।) এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ—"কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিরূপের মধ্যে একটা বিরোধিতা যে লক্ষ্য করা যায় তাহা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল ব্যক্তিত্ববান, প্রখর মর্যাদাসম্পন্ন সদাসক্রিয় এবং কথায় ও আচরণে কঠোর

সংযম-নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাহার সহিত ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, নেশাখোর কমলাকান্তের সংগতি কোথায়? কিন্তু সঙ্গতি না থাকিলেও মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় ক্ষণকালের জন্য জীবনের অভিনব রস-সন্ধানী হইয়া তাঁহার ভদ্র মার্জিত নিয়ম ও সংযম-বর্দ্ধিত আত্মস্বাতন্ত্র্যের নির্মোক খুলিয়া ফেলিয়া জীবনের উপেক্ষিত, অসংলগ্ন ও ধুলিলিপ্ত স্তরে নামিয়া আসিলেন। বিচারক কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। শাসনের দণ্ডটি কৌতুকের যাদুদণ্ড হইয়া পড়িল; সেই তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল এবং চাপা অধরোষ্ঠের ভিতর হইতে স্নিগ্ধ হাসির প্রসন্ন দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল।")

কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের আপাতঃ বিরোধ ও বিরূপতার মাঝেও যে একটি একাত্মতা ছিল উপরের আলোচনা হ'তে তার আভাস আমরা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলাকান্ত উভয়েই জীবন সম্পর্কে গভীর তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন—কিন্তু এই তত্ত্বকথার পরিবেশন-সুর পৃথক। বঙ্কিমচন্দ্র গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্ববান, কমলাকান্ত ব্যক্তিত্বহীন এবং উদাসীন। যুক্তিতর্কের নিশ্ছিদ্র-জাল বিস্তার করে যে তত্ত্বকথা বঙ্কিমচন্দ্র গাম্ভীর্য-দীপ্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন তদপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বপূর্ণ কথা কমলাকান্ত ছন্নছাড়া নির্বোধের সাজে আমাদের গহন চিত্ত-দ্বারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

সদাজাগ্রত বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে অবলোকন করলে বুঝি অনেক গভীরতর সত্যই সে দৃষ্টির বাইরে রয়ে যায়। জীবনের প্রকৃত সত্য ও রহস্যজাল ভেদ করার জন্যে যে দৃষ্টির প্রয়োজন তা' অনেকখানি অসতর্ক ও উদাসীন মনের দান। কমলাকান্ত তাই নেশাখোর—আফিম আর একটু দুধ তাঁর প্রধান সম্বল। জগতে আফিম ও দুধ ছাড়া তিনি আর কিছুরই সন্ধান রাখেন না। দুধের জন্য তিনি আরো দু'টি জীবের সন্ধান রাখেন—প্রসন্ন গোয়ালিনী আর মঙ্গলা গাভী। দুধ চুরীর ব্যাপারে তিনি আরো একটি জীবের সাথে পরিচিত—সে বিড়াল। এই তিনটি জীব ছাড়া সজ্ঞানে পৃথিবীর আর কোন কিছুর সাথে তিনি পরিচিত নন। আফিম খেয়ে ঝিমানোর সময় যতসব উদ্ভট এবং অসংলগ্ন উক্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়। এই ছন্নছাড়া, সংসার-বিমুখ, আপাতঃ মূঢ় কমলাকান্ত সাধারণ সমাজ জীবনের ব্যতিক্রম। এখানে সাধারণ ভাবে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—কমলাকান্তকে এ ভাবে নির্বোধ ও নেশাখোরের মত চিত্রিত করার সার্থকতা কোথায়? আমরা পূর্বেই বলেছি সদাজাগ্রত

দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখলে সে দৃষ্টিতে অখণ্ড সত্য-স্বরূপ ধরা পড়ে না—অনেক কিছুই প্রচ্ছন্ন রয়ে যায়। সংসারের গতি-চক্রে আবদ্ধ থাকলে বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে চলার গতিই প্রধান হ'য়ে ওঠে—জীবনের সত্য-স্বরূপ নয়। এই অভ্রান্ত সত্যের উপলব্ধির জন্যে নিজেকে চলার বেগ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে গতিহীন পথ-প্রান্তে রাখতে হয়। কমলাকান্ত তাই চলমান জীবন-প্রবাহ হ'তে বিচ্ছিন্ন। জীবন হ'তে আপাতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি লাভ করেছেন জীবনের অভ্রান্ত মর্ম, নিগূঢ় বার্তা-নির্যাস। সংসার-বিমুখতা ছাড়াও কমলাকান্তকে অর্ধোন্মাদ ক'রে সৃষ্টির পিছনে মিশে আছে সুকৌশলী শিল্পীর অতি সাবধানী মন। (জীবনের যে অভ্রান্ত উপলব্ধির কথা ঋষি ও নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিলনা—)সেই মর্মবাণী প্রকাশের জন্যে তাঁকে বাধ্য হয়ে নেশাখোর অর্ধোন্মাদ কমলাকান্তের স্মরণ নিতে হ'য়েছে। (সোজাসুজি, সজ্ঞানে এবং স্পষ্টভাবে বিচারক বঙ্কিম যে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতেন সেই কথাই তিনি রহস্যময় পাগলের মুখ দিয়ে তরল হাসির প্রবাহে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিয়েছেন।)

প্রথম দর্শনে কমলাকান্তের প্রতি আমাদের মনে 'আহা বেচারা' জাতীয় এক উপহাস-লাঞ্ছিত করুণার উদ্রেক হয়। যতসব তুচ্ছ ও উদ্ভট জীবের সাথে তাঁর সম্বন্ধ—প্রসন্ন গোয়ালিনী এলে তিনি অস্থির হ'য়ে পড়েন, বিড়ালের ডাক তাঁর পৃষ্টে তীব্র আঘাত হানে এবং এই সময় একটু আফিম পেলে তো আর কথাই নেই। কর্ম-মুখর জনপ্রবাহ যখন চার পাশের অসংখ্য-কর্মের চাপে বিভ্রান্ত সেই কর্ম-ক্লান্ত মুহূর্তে কমলাকান্তের নেশা চরমে ওঠে—আরাম কেদারায় উপবেশন করে তিনি নিশ্চিন্তে ঝিমান। এ ছাড়াও অফিসে বড় সাহেবের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত না থেকে যখন তাঁকে হিসাবের দামী কাগজ-পত্রে কবিতা লিখ্‌তে ও ছবি আঁকৃতে দেখা যায় তখন সংসারাসক্ত ও আত্মসুখান্বেষী লোকের কাছে তিনি নিছক হাস্যাস্পদ হ'য়ে পড়েন। এইসব আপাতঃ ঔদাসীন্যের উপরেও তাঁর কথাবার্তায় এমন সব স্থূলতা প্রকাশ পায় যে সাধারণের নিকট হ'তে উপহাস ছাড়া তিনি আর কিছুই আশা করতে পারেন না। সকল বক্তব্যের প্রথমে এই স্থূলতার আবরণে হাস্যরসের অবতারণা করাই কমলাকান্তের একটি প্রধান বৈশিষ্ট—কিন্তু এই স্থূল হাস্যরসের অবতারণাই সব নয়—এই স্থূলতাকে অতিক্রম করে অতিসূক্ষ্ম জীবন-জিজ্ঞাসার মর্ম-তটে পাঠকের চিত্তকে

সঞ্চারমান করে দেওয়াই কমলাকান্তের মূল লক্ষ্য। প্রথম দিকে তাঁর আপাতঃ স্থূল কথাবার্তায় আমরা হেসে উঠি সত্য—কিন্তু এই স্থূল কথাবার্তা গভীর জীবন-দর্শনে পরিণত হ'য়ে যখন আমাদের চিত্তকে চিরে ফেড়ে বিমোথিত করে মর্মলোকে পৌঁছায় তখন আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক ও নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়ি। কমলাকান্তের প্রতি আমাদের যাবতীয় অবজ্ঞা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়, তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত উপহাস-বাণ জীবন-দর্শনের সুকঠিন তটে প্রতিহত হ'য়ে পুনরায় আমাদেরই বক্ষে এসে আঘাত হানে। আমরা তখনই স্পষ্ট বুঝি কমলান্তের স্বরূপ, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তখনই আমাদের শ্রদ্ধানত দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির অপরিসীম দিগন্ত উন্মুক্ত হয়! তখনই আমরা বুঝি লোকটি নির্বোধ নন—নির্বোধের আবরণে আমাদের নির্বোধ করেন, পাগলের ভান করে পাগল বানান, মূঢ়তার ছদ্মবেশে আমাদের মত জ্ঞান-গর্বীর দর্প-অহংকার চূর্ণ করেন। ('বিড়াল' প্রবন্ধের সূচনায় যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা' একান্ত হাস্যকর এবং যে কোন অর্ধোন্মাদ নেশাখোরের উপযোগী কিন্তু এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে চির-জটিল সাম্যবাদের বিপুল সমাধানের মধ্যে।) সাম্যবাদের স্বরূপ নিয়ে এত অল্প কথায় এমন অপূর্ব প্রবন্ধ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সৃষ্টি হ'য়েছে কীনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জীবন-বিমুখ কমলাকান্ত একজন একান্ত জীবন-রসিক ব্যক্তি। কথাটি অন্যভাবে বলা চলে—জীবনের প্রতি একান্ত অনুরাগই তাঁকে জীবন-বিমুখ করে তুলেছে। বাঙালীর জীবন-যাত্রার ত্রুটি-বিচ্যুতি সকল কিছুই তিনি দূর হ'তে অবলোকন করেছেন, এবং আফিম সেবন করে অর্ধমাতাল অবস্থায় অসংলগ্ন কথার সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর মনে হ'য়েছে বাঙালীর বর্তমান অবস্থা অজ যুদ্ধের মত—বাহ্যিক আড়ম্বরই তার সব, অন্তরে শূন্য। সেখানে বাসা বেঁধেছে কপটতা আর ভণ্ডামী, স্বার্থপরতা আর আত্মাভিমান। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন মনুষ্যত্বহীন বাঙালী জাতি আজ ভ্রমর বৃত্তি অবলম্বন করেছে—মধু লোটাই তাদের অভ্যাস, কর্মমুখর সংগ্রামশীল সংসার-প্রবাহে যেতে তারা নারাজ। আত্মবিশ্বাসহীন এ জাতি তাই 'পুকুর' এবং 'বৃষ' পলিটিক্‌স্‌-এ মেতে উঠেছে—সত্যিকারের সম্মুখ সংগ্রাম ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং বিদ্যার পলিটিক্‌স্‌ করার শক্তি ও সামর্থ এদের কোথায়? মানুষ সম্পর্কে কমলাকান্তের একটি নিজস্ব দর্শন আছে এবং সে দর্শন অনুযায়ী মানুষ বৃক্ষের ফলের মত,

তারা বিভিন্ন ঋতু এবং সময়ে বিভিন্ন রূপ এবং রসে পরিণত—নিজস্ব কোন আকৃতি-প্রকৃতি নেই। কোন কোন মানুষ কোকিলের মত—বসন্তের সুরভি-স্নিগ্ধ ভোরের ছায়ালোকে তাদের কণ্ঠে সুর-সুপ্তম জেগে ওঠে কিন্তু শীতের নিদারুণ তুহীনকাতর পরিবেশে তাদের সংগীত-সুষমা তো দূরের কথা দর্শনটিও পাওয়া যায় না। কোন কোন মানুষ আবার পতঙ্গের মত—বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েই মুছে যায়।

এ সমস্ত মতবাদ তিনি প্রচার করেছেন হাস্যরসের ভিতর দিয়েই—কিন্তু এ হাসি উচ্ছ্বসিত এবং উদ্দাম নয়—স্নিগ্ধ এবং মর্মস্পর্শী, বিজাতীয় এবং বিধর্মী নয় সজাতীয় এবং সমমর্মী।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কমলাকান্তের দপ্তরে যে হাস্যরস পরিবেশিত হ'য়েছে তা' humour বা করুণ হাস্যরস। তাই এ গ্রন্থে কোথাও তো উদ্দাম হাস্য-প্রবাহ নেই-ই বরং অনেকগুলি প্রবন্ধে ক্রন্দনের বেদনাতুর গুঞ্জন ধ্বনিত হ'য়েছে। একা, একটি গীত, বুড়ো বয়সের কথা, কমলাকান্তের বিদায় ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যমণি। জীবন-রসিক কমলাকান্ত জীবন-প্রবাহে অসংখ্য অনাচার দেখে জীবনের প্রতি বেদনা-ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তাঁর কাছে জীবনের উদয়-বিলয়ের সুদীর্ঘ কালটুকু বিচ্ছেদের অন্তহীন কান্নার সুরে গাঁথা। তাই তিনি ঘোষণা করেন "...কাঁদি; জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।" জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ত-বোধ এখানে শত আভায় গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। প্রীতি এবং একাত্মতার জন্যেই তাঁর কণ্ঠে শোনা গিয়েছে ক্রন্দনের এই সকরুণ রেশ। প্রীতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন "প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসার সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীতের সহিত মানুষের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাহিনা।" এখানে কমলাকান্তের মানব-প্রীতি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে স্বাক্ষরিত।

কমলাকান্ত তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে টুক্‌রো টুক্‌রো কথায় অভিনব জীবন-দর্শনের স্বর্ণ-মসলিন বয়ন করেছেন বলে যে কথা আমরা পূর্বে ঘোষণা করেছি "কমলাকান্তে দপ্তরের" প্রায় সকল রচনাতেই তার পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে। একা—"কে গায় ওই", আমার মন, চন্দ্রালোক, বসন্তের কোকিল, একটি গীত, বিড়াল ইত্যাদি রচনার বিষয় বস্তু একেবারেই তুচ্ছ তবুও এই তুচ্ছ বস্তুকে অবলম্বন করে লেখক যেন এক একটী মহাসত্যের অরূপ

দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন। লিরিকের সুকোমল অভিব্যক্তিতে এই সকল রচনা উচ্ছ্বসিত ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। ভাষার অলংকার-সুষম কারুকরণের সাথে কোন কোন প্রবন্ধে সংযোজিত হ'য়েছে স্বদেশ প্রেমের অভিনব উল্লাস আবার কোন কোন প্রবন্ধে দুর্লভ জীবন-দর্শনের হ'য়েছে অনবদ্য প্রকাশ। এই সকল দিকেই লক্ষ্য রেখে (অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় ঘোষণা করেছেন "কি ভাষার মাধুর্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামী নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?")

এরপর কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা। এক সময় এ গ্রন্থের মৌলিকতা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। অনেকেই একে মৌলিক সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের মতে De Quincey-এর Confessions of an Opium Eater-এর সাথে কমলাকান্তের দপ্তরের বহু বিষয়ে বহু মিল আছে। এ ছাড়াও দপ্তরের তৃতীয়াংশ 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'র সাথে Pickwick Papers-এর Sam-এর মিল এত বেশী যে এই জোবানবন্দীকে Sam-এর অনুকরণ ছাড়া আর কিছু বলে স্বীকার করতে আমাদের মন সায় দেয় না। এই দলের আলোচনায় সত্য-সার নিষ্কাসিত হয়নি—এঁদের সকল মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। পাণ্ডিত্য এবং আত্মাভিমানের প্রকাশ-ই এঁদের আলোচনার বৈশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে পেরেই যেন এঁরা সন্তুষ্ট। কমলাকান্তের দপ্তরের আলোচনায় আমরা আর একদল সমালোচকের সাথে পরিচিত হ'য়েছি—এঁরা বঙ্কিমের অন্ধ ভক্ত। অন্ধ-অনুরাগের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল সৃষ্টিই এঁদের কাছে অভিনব, অপূর্ব এবং মৌলিক হ'য়ে ধরা দিয়েছে। কমলাকান্তের দপ্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে এঁরা বিপক্ষের সকল যুক্তি তর্ক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গ্রন্থখানিকে একান্ত ভাবেই মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলেছেন। আমাদের মনে হয় এই উভয় দলের মতবাদই

একদেশদর্শী 'হ'য়ে উঠেছে—আংশিক সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আসলে কমলাকান্তের দপ্তরের মত সৃষ্টি যে ইতিপূর্বে হয়নি তা' নয়—ইতিপূর্বে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এই শ্রেণীর সৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়েছি। সুতরাং শ্রেণী হিসেবে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা নেই—এর মৌলিকতা নিহিত রয়েছে স্তরের তর-তমের মধ্যে। একই শ্রেণীতে কমলাকান্তের দপ্তর যে স্তরের অধিকারী—Confessions of an Opium Eater সে স্তরের উপযোগী নয়। তুচ্ছ, অতিনগণ্য বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কমলাকান্ত শর্মা যেরূপ উর্ণনাভের মত কল্পনার জাল বয়ন করেছেন সেরূপ উদার অসীম কল্পনা Opium Eater-এ কোথায়?

(বিশ্ব সাহিত্যে মৌলিকতার দাবী করতে না পারলেও বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দপ্তর যে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত একটি নতুন সৃষ্টি-ধারার উৎসমূল খুলে দিয়েছেন। তিনি এই ধারার আদিপুরুষ এবং তাঁর উত্তরপুরুষের মধ্যে আমরা পেয়েছি করিম চাচা, দিলদার, ভজহরি এবং গোলাম হোসেন ইত্যাদির মত চির-স্মরণীয় চরিত্রাবলী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা চিরকালীন আসনের হকদার।)

কমলাকান্তের দপ্তর সমকালীন পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে বিশেষ রূপে যে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ কমলাকান্তের বর্ণনা-বিন্যাসের অভিনব রীতি, দ্বিতীয়তঃ হাস্যরসের শুভ্র-স্নিগ্ধ ধারা, তৃতীয়তঃ সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্যাবলীর অবতারণা। দপ্তরের কতকগুলি রচনায় ইংরাজী Familiar Essay-এর গুণ বর্তমান থাকায় রচনাগুলি অধিকতর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যে যে কোথাও দোষ-দুর্বলতা নেই এমন কথা বলার স্পর্ধা আমাদের নেই। অনেক স্থলে বহুভাষণের তিক্ততা সমগ্র রচনার সম্ভ্রমকে নষ্ট করেছে। শুভ্র-স্নিগ্ধ হাস্যরস—যা কমলাকান্তের দপ্তরের প্রধান বৈশিষ্ট তাও সর্বত্র পবিত্র নেই—স্থূলতার পরিবেশণে তাও অনেকখানি কলুষিত হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু শত দোষ-ত্রুটি থাক্‌লেও "কমলাকান্তের দপ্তর" বাংলা সাহিত্যের অভিনব সৃষ্টি। (যদি স্পর্ধা না হয় তা হ'লে বলা চলে আজো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দোসর সৃষ্ট হয়নি। এ ছাড়াও সহজভাবে কথোপকথনের রীতিতে বঙ্কিমের সমগ্র বঙ্কিমানস এই দপ্তরের মধ্যে

যে ভাবে আত্মপ্রাকাশ করেছে অন্য কোন রচনায় তা' প্রকাশিত হয়নি—বিবিধ প্রবন্ধে তো নয়-ই।)

॥ তিন ॥

॥ বিবিধ প্রবন্ধ ॥

জ্যোৎস্নালোকে মুক্ত সন্ন্যাসীর কণ্ঠে "বন্দে মাতরম" ধ্বনিতে অপূর্ব আবেগ-উন্মাদনায় যে জাতীয় জাগরণ-অভ্যুত্থানের বুনিয়াদ রচিত হ'য়েছিল, দেশ ও জাতীর আদর্শ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে সেই বুনিয়াদের ওপর চির অম্লান জাতীয়-অজাস্তা গঠনের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। আনন্দমঠে যা' ছিল কল্পনার বিলাস-লীলায় সমাচ্ছন্ন—বিবিধ প্রবন্ধে তাই ব্যাখ্যা-নিপুণ মনের সচেতন প্রয়াসে যুক্তি-তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আর কেবল কল্পনা-বিলসী নন—গবেষক এবং চিন্তাশীল। ভাবাবেগে ও উন্মাদনায় একটি বিষয়ের অবতারণা ও ইসারা করেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে গমন করেননি—বরং তথ্য ও তত্ত্বের সাথে মল্লযুদ্ধ করে সত্য-সার নিষ্কাসন করেছেন। প্রবন্ধ লেখা বা সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেই তিনি বিবিধ প্রবন্ধ লেখেননি জাতীয় জীবনের সমকালীন ধংসমুখীনতা তাঁকে এরূপ প্রবন্ধ লিখ্‌তে অনুপ্রাণিত করেছে। 'জাতি যায়'—এই আশঙ্কায় কবি বেদনা-বিহ্বল এবং সেই বেদনার গরল নির্যাস পান করেই তিনি মরণমুখী জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন সঞ্জীবনী সুধা। বিবিধ প্রবন্ধের প্রতিটি প্রবন্ধই তাই তথ্য ও তত্ত্বের ভারে গুরু গম্ভীর, বিচার বিবেচনার কষ্টিপাথরে পরিশীলিত, চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে বিগলিত—খাদশূন্য। পাশ্চাত্ত সভ্যতার নগ্নালোকে যখন বাঙালী জাতি দিশেহারা ও বিভ্রান্ত সে সময় বিবিধ প্রবন্ধ জাতীয় জীবনের বিক্ষুব্ধ ও বিপদ-সংকুল পথে অভ্রান্ত দিশারীর পটভূমিকা গ্রহন করেছে।

জীবনের বিলয়-প্রান্তে উপন্যাস রচনা হ'তে সরে এসে বঙ্কিমচন্দ্র যে কেন শিক্ষামূলক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় মনোনিয়োগ করেছিলেন—বাঙালী পাঠকের নিকট এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা। সমালোচক মোহিতলালের ভাষায় এ জিজ্ঞাসার অংশিক সমাধান পাওয়া যাবে: "বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল—স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ, এবং পরোক্ষভাবে—মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান। যে-জ্ঞান তত্ত্বমাত্র, যে-ধর্ম শুষ্ক তর্ক মাত্র, এবং যে-কাব্য নিছক আর্ট মাত্র, বঙ্কিম

তাহাকে বরণ করেন নাই—বুঝিতেন না বলিয়া নয়, তিনি তাহা চান নাই, তাঁহার প্রাণ নিষেধ করিয়াছিল। যে ধর্ম মানুষের জীবনের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হইতে চায়—যে-ধর্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব সাধনের উপায় বঙ্কিম তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। আবার যে-দেশ, যে-জাতি, ও যে-সমাজে তিনি জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন—সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে উদ্ধার করাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, নিজের মহতী প্রতিভা তিনি তদর্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।” জাতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি হ'তে কলুষতা ও অন্ধতা দূর করে সেগুলিকে আদর্শ মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযোগী করাই ছিল মানব-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের প্রয়াস এবং এই প্রচেষ্টা বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, দেহতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ইত্যাদি প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীতে বাক-বদ্ধ হ'য়েছে।

আমরা প্রথমেই মন্তব্য করেছি বিবিধ প্রবন্ধের লেখক বিচারক, চিন্তাশীল, তত্ত্বদর্শী এবং গবেষক। দু' খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির প্রবন্ধাবলীর শ্রেণী বিভাগের দিকে লক্ষ্য করলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হ'বে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষৎ সংস্করণের জন্য উভয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলীর যে শ্রেণী-বিভাগ করেছেন তা' এইঃ সাহিত্য—সাতটি প্রবন্ধ, প্রত্নতত্ত্ব—চারটি, ইতিহাস ও অর্থনীতি—দশটি, দর্শন ও ধর্ম—দশটি এবং বিবিধ সাতটি। নিম্নে আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর প্রবন্ধের একটি সাধারণ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর আলোচনা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধই "বিবিধ প্রবন্ধের" কোহীনূর। চিন্তা-ভাবনার অতলস্পর্শী গভীরতায়, প্রকাশভংগীর মাধুর্যময় আবেদনশীলতায় এই শ্রেণীর আলোচনা বঙ্কিমের প্রবন্ধ-সৃষ্টি-শক্তির সর্বোচ্চ গ্রাম স্পর্শ করেছে। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকেও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। ক ॥ এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেগুলি সমালোচনামূলক—Criticism, খ ॥ আরএক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেগুলিতে স্থান পেয়েছে সাহিত্যরূপের—form—আলোচনা। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রধান হলো 'উত্তর চরিত', 'দ্রৌপদী', 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' এবং 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমোনা' আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে 'গীতিকাব্য' এবং 'প্রকৃত ও অতিপ্রাকৃত' বিখ্যাত। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন এবং এই ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ পদসঞ্চার বিশেষরূপে লক্ষণীয়। মনে হয় এক রবীন্দ্রনাথ

ছাড়া এই ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ শিল্পী আর কেহ জন্মগ্রহন করেননি। এ শ্রেণীর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা উন্নত-শীর্ষ হ'লেও একটি বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে হার মেনেছেন। উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও বহুভাষণে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেখানে বিশেষরূপে এলায়িত হ'য়ে পড়েছে বাক্‌ভংগীর সংযত প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সেখানে দৃঢ়-পিনদ্ধ। এ ছাড়াও বহু সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মদন মোহন কুমারের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য : "রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্যে" 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে পঞ্চতপা পার্বতীর সহিত শকুন্তলার তুলনা, এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে "শকুন্তলা" নাটকের সহিত "টেম্পেষ্ট" নাটকের তুলনা বঙ্কিমের 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেস্‌দিমোনা' ও 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধ স্মরণ করাইয়া দিবেই। রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক সাহিত্যে" 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যে তুলনা করিয়াছেন তাহার সহিত বঙ্কিমের 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি'র মূল বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।" সাহিত্য-স্বরূপের আলোচনা গুলিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি ও গভীর মননশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এই শ্রেণীর আলোচনা কেহ করেননি—সাহিত্য-স্বরূপ আলোচিত প্রবন্ধগুলি তাই বাংলার সমালোচনা সাহিত্যে নতুন বলিষ্ঠ সংযোজনা।

প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃ-তত্ত্ব প্রবন্ধগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক মনের স্বরূপ বিধৃত হ'য়েছে। 'বাঙলাভাষা' 'বাঙালির উৎপত্তি' 'বাঙলার ইতিহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রবন্ধগুলিতে মাতৃভাষা এবং স্বজাতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেম-নিবিড় অনুরাগ শতধারায় উৎসারিত হ'য়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির সাথে সাথে বাঙলা ভাষাতত্ত্বের এমন সুগভীর আলোচনা বঙ্কিমের পূর্বে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অনার্য, আদিম জাতিগুলি হ'তে কেমন ভাবে ধীরে ধীরে ক্রমপরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে নব্য বাঙালী জাতির উৎপত্তি হয়েছে তার একটি মর্মস্পর্শী ইতিহাস লিপিবদ্ধ হ'য়েছে 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই গবেষক। প্রবন্ধটি নৃ-তত্ত্ব (anthropology) সম্বন্ধীয় আলোচনার আদর্শস্থানীয়।

ইতিহাস দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মূল লক্ষ্য ধংসমুখী জাতির অধোগতিতে ছেদ টেনে নতুন বল-দীপ্ত জাগরণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা।

এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে জাতির গৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায়। অন্ধকারের বুকেই আলোকের উজ্জল প্রকাশ। জড়গ্রস্থ জাতির বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন দুরবস্থা বোঝাবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তার সম্মুখে তুলে ধরেছেন আলোকোজ্জল অতীতের কোলাহল মুখর দিনগুলি। শক্তি-সামর্থ্যে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, ধর্মে-দর্শনে বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাস দীপ্তিময়। তাই অতীত ইতিহাসের গোপন কন্দর হতে শক্তি সংগ্রহের আহ্ববান জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দূর অতীতের নিস্তব্ধ শ্মশান ভূমিতেই সুপ্ত রয়েছে শক্তি ও সামর্থের ফল্গু-প্রবাহ। জাতির সংগঠন-যজ্ঞের অগ্নিহোত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট তাই অতীত ইতিহাসের আলোচনা অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে প্রধান হ'লো ভারতবর্ষ পরাধীন কেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীনা ও নবীনা, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী। এই সকল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে গবেষক এবং চিন্তাশীল, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক। জাতির অতীত ইতিহাসের উদ্ঘাটন এবং শক্তি-সামর্থের উৎসভূমি আবিষ্কার করা ছাড়াও এই সকল প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ মূল্য হ'লো কুহেলীমণ্ডিত রূপকথা-কাহিনী পৃথক করে খাঁটি তথ্যের সাহায্যে অভ্রান্ত ইতিহাস রচনা করা। কেবল অতীতমুখী রোমাঞ্চ-পিপাসাই নয়—বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনার জন্যেই এই সকল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অমর হ'য়ে আছেন।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কীত কয়েকটি রচনা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিশিষ্ট্য সম্পদ। এই শ্রেণীর প্রবন্ধরাজীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প, সাংখ্যদর্শন এবং জ্ঞান ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী বিশেষরূপে খ্যাত। 'প্রাচীন ভারতের রাজনীতি' প্রবন্ধে অতীত ভারতের সুন্দর সুশৃঙ্খলাময় রাষ্ট্রনীতির একটি বিরাট অধ্যায় আমাদের বিস্মিত-দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'য়েছে। সূক্ষ্ম শিল্প সম্পর্কে আর্যজাতির জ্ঞানগরিমা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ আমাদের দ্বিতীয় আশ্চর্যের বিষয়। সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধটি যেন সমগ্র সংস্কৃত দর্শন-সাগর-মন্থন নিটোল মুক্তা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে সংস্কৃতের গিরিশিখর হইতে বাঙ্গলার সমতলভূমিতে সর্বজনপ্রাপ্য করিয়া দিবার চেষ্টা" করেছেন।

এ ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা বিবিধ প্রবন্ধে আছে। 'বঙ্গ দেশের কৃষক' এবং 'অনুকরণ' প্রবন্ধ দুটি বঙ্কিমের প্রবন্ধ রচনার

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রথম সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে কৃষকদের বর্তমান দুরবস্থা, পতনের কারণ এবং উন্নতির পথ বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশক্তির যে সুবিপুল পরিচয় রেখাঙ্কিত হ'য়েছে তা' অভিনব এবং বিস্ময়কর। এই প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৃষকদের সমর্মমী। অনুকরণ প্রবন্ধটি সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। বঙ্কিমের যুগে বাঙালী অন্ধের মত ইংরাজদের অনুকারী হ'য়ে উঠেছিল—প্রবন্ধের প্রথমেই এই অন্ধ অনুকরণকারীদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের কণ্ঠ বঙ্কিমান হ'য়ে উঠেছে: "জগদীশ্বরকৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুদ জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত। হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক "বাইমেনা" জাতির সাদৃশ্য বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও নাই।"

এখানে অনুকরণ প্রিয়-বাঙালীর সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে প্রকারান্তরে অনুকরণের বিরুদ্ধেই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠের তীব্রতা উৎসারিত হয়েছে বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে তা' নয়। দুর্বল জাতির নবজীবন-জাগৃতির উষা-লগ্নে যে সবল জাতির অনুকরণের প্রয়োজন তা' তিনি বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। তাঁর নিজের কথাতেই "অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই।" কিন্তু অনুকরণ যখন অন্ধ এবং প্রতিভাশূন্য হয়ে পড়ে তখন তা হ'য়ে ওঠে দূষণীয় এবং কদর্য। এই প্রতিভাশূন্য অনুচিকীর্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোর আপত্তি। এক গ্লাস মদ পান করে যে নব্য বাঙালী মনে করেন যে তিনি মস্ত আধুনিক হ'য়ে উঠেছেন তাঁর মত ভাগ্যহীন আর কে? নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই বিচারক হ'য়ে উঠেছেন। নিয়তির মত অনিবার্য কারণেই এখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের অর্ধোন্মাদ দশা হ'তে সরে এসে বিচারকের সুকঠোর দণ্ড হাতে নিতে হ'য়েছে।

।। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি-মানস ।।

॥ এক ॥

॥ যতীন্দ্র-কাব্যের পটভূমিকা ॥

রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী কবি-প্রতিভার উদয়-বিলয়ের কাল-পরিধির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও যে ক'জন আপন কলানিপুনতার জন্যে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল প্রধান। এঁদের তিন জনেরই কবি-মানসে হয়েছিল তীর্যক-দৃষ্টি-ভংগীর ছায়াপাত। কাব্য-রচনার প্রারম্ভিক উষা-লগ্নেই এক অভিনব বীর্য-দীপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা কবিত্রয়ীকে করে তুলেছিল প্রশ্ন-চঞ্চল, দিয়েছিল সত্য-ভাষণের ঐন্দ্রিলা স্পর্ধা। তবে এই স্পর্ধায় তর-তমের পার্থক্য আছে। যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের মধ্যে এই স্পর্ধা ক্রমবর্ধমান হয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বিপক্ষের শঙ্কিত বুকে হাতুড়ী ঠোকার দুঃসাহসে বীর্যবান হয়ে ওঠেনি— 'বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে' বিদ্রোহী ভৃগুর ভীষণতায় ভগবান-বুকে দীপ্ত পদ-চিহ্ন এঁকে দেওয়ার দুরন্ত শক্তি অর্জন করেছিলেন একমাত্র নজরুল-ই।

যতীন্দ্রনাথ যখন বাণী অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন রবীন্দ্র কাব্যাকাশে অধ্যাত্মবাদের নবারুণ মদির-বিহ্বলতার ফাগ ছড়াতে ব্যস্ত—তখন সবেমাত্র আধ্যাত্মিকতার পূর্ব-পর্ব রোমাঞ্চ-রঙীন হয়ে উঠেছে। শিল্পক্ষেত্রে যখন চলেছে এমনি রোম্যান্টিকানুগ স্বপ্নালু বাষ্পাচ্ছন্ন কল্পনা-বিলাস তখন সমাজে চলেছে অত্যাচার-নির্যাতনের পাশবিক সমারোহ। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি তখনও বেজে ওঠেনি তবুও রাজনৈতিক-বিলাস-মত্ততায় সমাজ-জীবনের সর্বত্রই একটা বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, জীবন-পথের নানাদিকেই দেখা দিয়েছে প্রশ্ন-সংকুল ফাটল-রেখা। একদিকে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার এই ভাঙন-মুখী অবক্ষয় অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মমুখী কল্পনা-বিলাস। সমাজ-সাহিত্যের মধ্যেকার এই গরমিল যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি সহজেই বুঝেছিলেন সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। সাহিত্য কেবল রূপমুগ্ধ তন্ময়-মনের বিলাস-কেলী নয়—সম্মুখে যে কষ্টের সংসার তার আবেদনকে কবি-সাহিত্যিক এড়িয়ে যাবেন কোন

সাহসে। কাব্য-রচনার প্রারম্ভিক লগ্নেই এই প্রশ্নই যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসে জিজ্ঞাসার জীবন্ত-আলোড়ন এনেছিল। তৎকালীন বাংলার ভাঙন-মুখী গ্রামীণ সমাজের সাথে অন্তরঙ্গ যোগ থাকায় এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা তীব্রতম হয়ে উঠেছেল। কবির নিজের কথায় এই প্রশ্ন-চঞ্চল মনের সুন্দর রূপ ধরা পড়েছে। চাক্‌রীর খাতিরে কবিকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হ্‌তো এবং "এই চল্‌তে গিয়েই ত প্রত্যক্ষ করলাম বাঙ্‌লা দেশকে। বাঙ্‌লা দেশের গ্রামকে। কি আশ্চর্য! এই বাঙলার পল্লী সম্বন্ধে কতো কবিতা পড়েছি। ...নদীমাতৃক শস্য শ্যামলা. কৃষকের উল্লাস মুখরিত বাংলা দেশ। এখানে রাশি রাশি ভারা ভারা ধানকাটা সারা হয়। বাঙলার বধূর বুক ভরা মধু ইত্যাদি আরো কতো ঐশ্বর্য নাকি বর্তমান। হায়! আমার ভাগ্য মন্দ। এর একটিও কী চোখে পড়লো? আমি তো দেখলাম ঠিক বিপরীত। নদী মাতৃক বাংলা দেশের নদী আজ মজে গেছে। খানা ডোবা যে দিকে তাকাই পানায় ভর্তি। শস্য-ক্ষেত্র খাঁ খাঁ করছে। চাষীরা সর্বহারা, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, শীর্ণকায়। আর বাঙ্‌লার বধূ—তাদের দেখলাম জেলাবোর্ডের দেওয়া ইঁদারার পাশে জমায়েৎ হ'তে। গ্রীষ্মের দারুণ দুপুরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে। আর এই নদীমাতৃক বাংলার বধূদের দেখ্‌লাম এক কলসী জলের জন্য পরস্পর বাক্য-গরল বর্ষণ করতে। উপায় নেই তাদের। হয়তো স্বামীপুত্র ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। উনুনে বার্লি ফুটে যাচ্ছে। ...চোখে পড়েনি শুধু বাংলার সেই কাব্যরূপ।"

যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসের স্বরূপ এবং জন্ম-লগ্নের বলিষ্ঠ চিন্তার উন্মেষ এ স্বীকৃতিতে সুন্দরতর মহিমায় বাক্‌-বদ্ধ হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে আর একটি গভীরতর উপাদান আমরা এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে পাই—সেটি হলো রবীন্দ্রনাথের বাষ্পাকুল স্বপ্নবিলাসের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের সচেতন-আত্মার বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। তিনি নিভৃত-হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাহিত্য যদি কোন বাস্তব ভিত্তিভূমিতে সুদৃঢ় না হ'তে পারে তা হলে তার পতন অনিবার্য। এবং এই ধূমায়িত কেলি-বিলাস ও কোমল কল্পনায় জাতীয় জীবনের অন্তরাত্মা স্বপ্নলালনের নরম সূত্র ধরে নির্বীর্যের অতল গহ্বরে আত্মাহুতি দেবে। তাই তিনি নটরাজের ভাঙন-মুখী পদ-পাতনের দীপ্তঘোষণায় বাংলা সাহিত্যের মদির-বিহ্বল কোমল বক্ষকে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল করে তুল্‌তে চাইলেন। দেখা দিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে তরুণ কবিকুলের বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল।

দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের হাতে সম্পন্ন হলো আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রাতঃকৃত, ভোগবাদী মোহিতলালের আত্মনির্ভর পদচারণায় উজ্জলতর হলো এ কাব্যের জয়যাত্রা, বিদ্রোহী-দুলাল কাজী সাহেবের আগ্নেয় শপথ ও বহ্নিমান আত্মঘোষণায় এ কাব্য আপন স্বরূপে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক বাঙালীর পক্ষে জীবন-জিজ্ঞাসার যুগ। এই যুগে সব কিছুই চঞ্চল এবং প্রশ্ন-ব্যাকুল। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নানান অভাব-অভিযোগ, ব্যথা-বেদনায়, অসুস্থ ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস লালিত হয়েছে এই অসুস্থ প্রশ্ন-সংকুল আবেষ্টনীতে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস-লালনের পরিধিটুকু সুন্দর রূপে বিধৃত হয়েছে: "নূতন জিজ্ঞাসা পুরাতন ভাবধারার হাতিয়ার সংগ্রহে যখন অতি ব্যগ্র, সেই সময় বিশ্বযুদ্ধের করাল-সংকেত সমাজ ও সাহিত্যের গতিরেখাকে পট পরিবর্তনের অভ্রান্ত নিশানা দিল। মধ্যবিত্ত জীবনের বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো উনিশ শতকী ভাব-জীবনের গতিরেখায়, "গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর" রূপান্তরিত হলো "মরুমায়া"র "মরীচিকা"য়। যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসের জন্ম-লগ্নে নব-জিজ্ঞাসার সেই প্রাথমিক অঙ্গীকার নূতন প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষরিত।"

বিশ্বযুদ্ধের করাল সংকেত সমাজ ও সাহিত্য-জীবনে পট-পরিবর্তনের সূচনা এনেছিল সত্য কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যতীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠেনি, এমন কী মোহিতলালের মধ্যেও নয়। বিশ্বযুদ্ধের গরল-নির্যাস গ্রহনে যিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইস্‌লাম।
যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস গঠনে বিশ্বমহাযুদ্ধ তো বিশেষ কোন ছায়াপাত করতে পারেইনি—এমন কি মার্ক্সীয় মতবাদও নয়। কেননা যে সময় যতীন্দ্রনাথ কাব্য-রচনা করেন সে সময় বাংলায় মার্ক্সবাদের বিশেষ প্রসার ঘটেনি। ব্যক্তিগত আলাপ আচরণ-অভিজ্ঞতায় এবং বিভিন্ন প্রমাণ-পরিচয় উদ্ধৃত করে ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় যতীন্দ্রনাথকে গান্ধীবাদী বলেই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মার্ক্সীয় মতবাদ নয় যতীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মায় সুপ্ত আদিমতম শয়তানটি জাগ্রত হয়েছিল শোষণ-শূন্য সমাজের মেরুদণ্ডহীন মানুষের অসহায় আর্তনাদে, বেদনা-ম্লান কৃষাণের তপ্ত-নিশ্বাসে, অন্নহীন গৃহবধূর মর্মভেদী হাহাকারে। একটি সচেতন পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিই তাঁকে করে তুলেছিল দুঃখবাদী, বিদ্রোহী।

॥ দুই ॥

॥ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও তার স্বরূপ ॥

ম্যাক্সীম গোর্কীর "মাদার"-এর তের বৎসর বয়স্ক কিশোর নায়ক বাঁধা-ধরা পিতৃভক্তির পথ পরিত্যাগ করে যেমন একদিন সবল-রুচি বাহুদুটি দিয়ে পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতুড়ী তুলে ধরেছিল তেমনি 'অলস রসে আবেশ বশে'-এর চির পুরাতন সম্ভোগ ও স্বপ্নবিলাসের পথ পরিত্যাগ করে আকস্মিক ভাবে যতীন্দ্রনাথ দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদচারণা করে সকলকে চমকিত করে দিয়েছিলেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাই একটা প্রবল ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর বাণীতে কোন আবরণ ছিল না, তাঁর চিত্তেও এতটুকু সংশয়ের স্থান ছিল না—তাঁর যা বলার তা' দ্বিধাহীন অসংকোচ চিত্তে প্রকাশ করতেন। কল্পনার মায়ালোকে তিনি অযথা ঘুরে বেড়াননি—ঋজু ভাষণেই তাঁর বক্তব্য মর্মভেদী হয়েছে। তাঁর কাব্যের আর একটি বিশেষ লক্ষ্যনীয় দিক সুস্থ, সবল মানবিকতার প্রকাশ। কোন তত্ত্ব বা আদর্শের চাপে এ মানবিকতা-বোধ রবীন্দ্র-সুলভ অমর্ত-চেতনায় পর্যবসিত হয়নি। অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে পাঠকের গহন-মন স্পর্শ করেছে। সচেতন মনের এই শিল্প-কর্ম, বজ্র-কঠোর দুঃখবাদের এই ছন্দিত রূপায়ণ—বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের এক বিরল-মর্যাদা দান করেছে।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে এই যে দুর্লভ-দুঃখবাদের প্রবর্তনা দেখি এ দুঃখবাদের স্বরূপ কী? যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ প্রচলিত দুঃখবাদের বিপরীত। প্রচলিত দুঃখবাদ হ'ল জীবন ও জগতে বিতৃষ্ণ হয়ে পলায়নী মনোবৃত্তিরই নামান্তর। মায়াবাদীদের মত দুঃখবাদিগণও জগৎ ও জীবনকে বেদনা-ব্যথার উৎস-ভূমি জেনে অনন্য-সুন্দর সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ হ'তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর করাল-সংকেতের অপেক্ষায় দিন গোনে। এ দুঃখবাদ একদিকে যেমন পলায়নবাদের পরিপোষক অন্য দিকে তেমন নেতিবাচক। 'না'-ই প্রচলিত দুঃখবাদের মূলমন্ত্র, 'কিছু নেই' এই সার মর্মই এ দুঃখবাদের মর্মমূল হ'তে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ পলায়নী মনোবৃত্তির পরিপোষক নয়—এ দুঃখবাদ পার্থিব সৌন্দর্য ও জীবন-রসকে গভীর ভাবে উপলব্ধি এবং আকণ্ঠ পান করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দুঃখবাদ বন্ধন-পীড়িত জগৎ ও জীবনের মর্ম-বেদনায় নৈরাশ্য-ক্রন্দন নয়—জগৎ ও জীবনকে করাল-গ্রাস হ'তে বন্ধন-মুক্ত

করার আগ্নেয়-শপথ। তাই এ দুঃখবাদের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে জীবন-রসের সঞ্জীবনী ধারা। কবি-প্রাণের একটি গভীর ঐকান্তিকতা ও প্রখর অনুভূতি এ দুঃখবাদের অন্তর্মূলে বেগ-সঞ্চার করে তাকে মহান ও ভয়াল-মাধুর্য-দীপ্ত করে তুলেছে।

চলমান জীবনে দৈনন্দিন কর্ম-প্রবাহে যা' সুখের বিপরীত দুঃখ বলেই প্রতীয়মান হয়—শিল্পের মহান পটভূমিতে তাই হয়ে ওঠে রস এবং রস-সৃষ্টিই কবিতার প্রাণ। সুতরাং যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ নতুনতর রস-সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এই রসই আনন্দ-রূপে পাঠক-চিত্তকে দুর্নিবার আবেগে দুলিয়েছে। এ প্রসংগে মোহিতলালের মন্তব্য বিশেষ রূপে স্মরণ-যোগ্য : "সাধারণ জীব-চেতনায় বা অধ্যাত্ম-দর্শনে দুঃখ যে বস্তুই হোক্, কাব্যে দুঃখ শুধু দুঃখই নয়, তাহা একটা রসও বটে। যদি তাহাই না হয়, তবে দুঃখের কবি বলিলে কোন অর্থই হয় না; যেমন দুঃখ কাব্য হয়ে ওঠে না। অতএব যতীন্দ্রনাথের এ দুঃখ একটি অনুভূতি রসেরই প্রকার ভেদ মাত্র।" ধর্মশাস্ত্রে অধ্যাত্ম-সাধনার বিভিন্ন পন্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে—বন্ধু কিংবা সখা ভাবেও যেমন ভগবানকে উপাসনা করা যায় তেমনি শত্রু বা বিদ্রোহী হ'য়েও আধ্যাত্মিকতার সীমা-সর্গে উন্নীত হওয়া সম্ভব। একদিকে আছে প্রেম-মাধুর্য, ভক্তি-ভালবাসার সুন্দরতর রূপ অন্যদিকে আছে ভয়াল-ভীষণতার মাঝে শৈবোন্মত্ততা। যতীন্দ্রনাথের কাব্য এই শৈবোন্মত্ততার মধ্যেই সজীব ও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। শত্রুভাবে ভজনা করে কবি হরণ করেছেন কবিতা-কুমারীর লাবণ্য-দীপ্ত তনু-মন। দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের কবিতার সুন্দরতম সার্থকতা এখানে। যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখের পথে পদচারণার, এই দুঃখবাদী হওয়ার মূলে যে কারণগুলি অন্তরাল হ'তে বেগ সঞ্চার করেছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কারণগুলির একটি হ'লো প্রাক মহাযুদ্ধের পটভূমিতে প্রশ্ন-সংকুল ধ্বংসমুখী সমাজ-জীবনের বিপর্যয় এবং অপরটি হ'লো তৎকালীন বিপর্যস্ত বেদনা-পীড়িত সমাজ-চিত্রকে এড়িয়ে সমকালীন সাহিত্যের রোম্যান্টিকতার প্রতি প্রবণতা। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হ'য়েছে "হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ"-এর উচ্ছ্বসিত অপূর্ব চিত্র কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করে কবি দেখেছেন মধুর মূরতির "বিধুর রূপ" শেফালী মাল্যের স্থলে "কণ্টক মালা" আর "রোগে-বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে" মলিন অঙ্গের ব্যর্থ হাহাকার। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এতবড় ফাঁকি কবি যতীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেননি—তাই তিনি নিদারুণ ভাবে হয়ে উঠেছিলেন দুঃখবাদী। দুঃখের মধ্য দিয়ে

"জীবনের যথার্থ অনুরাগী এই কবি তাই জীবনের শত-দীপ্ত বহ্নি-জ্বালায় জ্বলেছেন—বক্রকটাক্ষের কুটিল-ভ্রূভংগীতে তারই অর্ঘ-ডালা সাজিয়েছেন।"
কবির দুঃখবাদের কারণটি ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। কবির প্রথম কাব্য "মরীচিকা"র সূচনা-কাল ১৩১৭—তখন তিনি ভরা যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু ঠিক ভরা যৌবনে দেখা গিয়েছে "তাঁহার তীব্র বিষয়-বিরক্তি এবং ভস্ম-ভূষণ রুক্ষ জটাধারী বিদ্রোহী মূর্তি। জীবন-জিজ্ঞাসার কঠোর তপের তাপে ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি যৌবনেই যেন শুষ্ক করিয়া আত্মসংহরণ করিয়া লইয়াছিলেন, একটি সহজাত-তীক্ষ্ণ ধ্যান-বৃত্তির মধ্যে সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি যেন আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। একদিকে অন্তবিহীন জীবন-জিজ্ঞাসার উদগ্রতা—অন্যদিকে সত্যকার সমাধান লাভের ব্যর্থতা এবং তাহারই সঙ্গে চারিদিক হইতে শুধু সত্য শিব ও সুন্দরের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার আয়োজন ও প্রলোভন যৌবনেই কবিকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ফলে বিশ্ব সংসারের 'রূপ'টাই তিনি কোথাও উপভোগ করিতে পারিলেন না,—'বিরূপ'টাই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিল।" রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' বলে যখন রবীন্দ্রনাথ মুক্তি আস্বাদনে ব্যস্ত তখন যতীন্দ্রনাথ উদার অসীম নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্তি অনুভব করতে পারেননি। অনুভব করতে তো পারেননি বরং অসীম বন্ধনহারা আকাশের মাঝেও দেখেছেন অসংখ্য বন্ধন :

চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া
আলো আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব-কারা।

নিখিল বিশ্বে কবি কোথাও মুক্তি দেখ্‌তে পান্‌নি সর্বত্রই দেখেছেন অত্যাচার নির্যাতনের মর্মভেদী দুঃখদাহন। কল্পনায় বুঁদ হয়ে সংকীর্ণ মশারির মধ্যে শয়ন করে মশারির আদি-অন্ত নেই বল্‌তে তিনি রাজী নন :

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলী প্রেমের নেট মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

এমন মিথ্যাভাষণ কবির পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয়নি। যাকে তিনি স্পষ্ট মিথ্যে বলে উপলব্ধি করেছেন, যাকে তিনি অসত্য বলে জেনেছেন—চোখ বন্ধ করে তাকে তিনি সত্য-সুন্দরের প্রতীক বলেন কী করে? তাই তো অন্তর হ'তে বচন আহরণ করে 'অলস রসে আবেশ বশে' চিরাচরিত পথে পদচারণা

করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তো তিনি বাংলার অলস-লালন কোমল বক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বহ্নি-দীপ্ত 'মরুশিখা'য়।

কবির দুঃখবাদের সুর যেমন সমকালীন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতির বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছিল তেমনি এই দুঃখবাদ-বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পুরুষের বিরুদ্ধেও। পূর্বেই বলেছি কবি ছিলেন অপরাজেয় মানবতাবাদী। সৃষ্টিকর্তার হাতে সেই মানুষের নির্মম লাঞ্ছনা হ'তে দেখে কবির বুকেও জ্বলে উঠ্‌লো অনির্বাণ দীপশিখা। কবি লক্ষ্য করেছেন মানুষ আপন দুঃখ-দারিদ্র্য, আপন ব্যথা-বেদনার চার পাশে একটা কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে খাড়া করে তার পদ-প্রান্তেই পরাভব স্বীকার করছে। এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার জন্যেই মানুষ আপন-স্বরূপে, আপন বীর্যগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারছে না। এই অলীক স্রষ্টাই যেন মানুষকে করছে মেরুদণ্ডহীন, করছে প্রবঞ্চনা। বিধির বিধানকে তাই তো কবি আকুল আবেগে আহ্‌বান জানাতে পারেননি—বিধির বিধান-মাঝে যে মহাবন্ধন আছে তাতেই কবি পীড়িত, ব্যথিত :

> কবি নাহি আমি, করি নি ছন্দে গ্রথিত
> যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
> আমি মহা বন্ধনে ব্যথিত।

এই যে তীক্ষ্ণাগ্র বাণী-বিন্যাস—এ তো কেবল বিধির বিধানের জন্যে কেবল ক্ষোভ প্রকাশ নয়—এ যে বিধির বিরুদ্ধে কবির সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা। কবি বলেছেন এই সৃষ্টির পিছনে যদি কোন সৃষ্টিকর্তা থাকেন তিনি অন্ধ এবং বধির ; এবং তিনি কর্মকার জাতীয়। ব্যথা-বেদনার মাঝে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন গভীর মুক্তি, বেদনাকেই তিনি জীবনের সম্বল জেনেছিলেন, 'যেথায় ব্যথা সেথায় তোমায় নিবিড় করে ধরিব হে' এই ছিলো তাঁর ঘোষণা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বেদনা-বহ্নির মাঝে কোন গভীরতর মুক্তি খুঁজে পাননি। দুঃখের দাবদাহের মাঝে তিনি দেখেছেন সৃষ্টিকর্তার নির্মম পেষণ। 'লোহার ব্যথা' কবিতায় কর্মকারের (সৃষ্টিকর্তা) নিকট লোহার (সৃষ্টজীব) অন্তরভেদী ক্রন্দন অনল-অক্ষরে স্বাক্ষরিত হয়েছে :

> ও ভাই কর্মকার !
> রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার,—
> কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
> আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি ?
> তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
> কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি।

এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় বলেছেন: বিধাতার আত্মরতির তাগিদে তাঁহার এই বিশ্বলীলা,—যে বিশ্বলীলা সম্ভব হইয়াছে 'আমা'কে দিয়া ; কিন্তু সে আত্মরতির লীলা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই এই 'আমি'টি যদি লৌহ-খণ্ডের ন্যায় নিরন্তর সংসারের হাপরে জলিয়া জলিয়া হাতুড়ির পিটামি দ্বারা কেবলই 'হইয়া' উঠিতে না থাকে। লীলাময়ের অনাদি-লীলার শরিক হইয়া উঠিবার ইহাই পুরস্কার!"

কবির এই দুঃখবাদী বিদ্রোহের সুর প্রকৃতির বুকেও সঞ্চারিত হয়েছে। কবি মাত্রই প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্য-লীলা, বিমল রূপৈশ্বর্য প্রত্যেক কবির কল্পনায় বেগ-সঞ্চার করেছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। প্রকৃতির অবিমিশ্র সৌন্দর্যময়ী ও মাধুর্যময়ী মূর্তি কবির জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—তিনি প্রকৃতির কোমল রূপ না দেখে দেখেছেন তার ভয়াল-ভীষণ মূর্তি। প্রকৃতির এই উদ্দাম বন্যরূপ তার 'রক্তাক্ত-দন্ত-নখর' বিশিষ্ট জান্তব প্রেরণা কবিকে আকৃষ্ট করেছে বেশী। তবে প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ যে আদৌ ছিল না তা' নয়, কিন্তু 'যতখানি ছিল অচেতনে আকর্ষণ ঠিক ততখানি ছিল সংসারের সচেতনে বিকর্ষণ।' তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির মধ্যে তার নিয়ম-বিধান অপেক্ষা অনিয়ম-অবিচারের প্রাবল্য, শোভা-সৌন্দর্য অপেক্ষা রুক্ষতা-ভীষণতার তীব্রতা। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির পেলব-মসৃণ সায়াহ্ন-কোমলতা অপেক্ষা গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের খর-দীপ্ত-নির্মমতাই কবির দৃষ্টিতে সত্য হয়ে উঠেছিল। "মরুশিখা"র 'দুঃখবাদী' কবিতায় তাই তো তিনি ঘোষণা করেছেন:

> মিথ্যাপ্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
> সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।

শ্রাবণ-নিশীথের বাদল ধারা, শ্রাবণ-সন্ধ্যার মায়াঘন ঝিলিমিলি রবীন্দ্রনাথের মানস-কল্পনায় কতবার, কত ভংগীতে, কত বিচিত্র ভাবেরই না উদয় হয়েছে। শ্রাবণের অবিরল বাদল-ধারায় কখনো তিনি শুনেছেন মানুষের চিরন্তন বাণী, কখনো শুনেছেন পূরবীর সুর, কখনো পেয়েছেন সুধার ধারা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে শ্রাবণের ধারা 'অন্ধ অন্তরের ক্রন্দন ছন্দের সান্ত্বনা গান' হয়ে ধরা দিয়েছে।

শ্রাবণ-নিশীথের বজ্র-গর্জনের রূপটি কবির নিকট ধরা পড়েছে বনান্তরালের শাবক-হারা বাঘিনীর বিদ্রোহ-গর্জন রূপে:

কান পেতে শোনো দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবক-হারা বাঘিনী ?

বিদ্যুৎ-ঝলকও তাঁর কাছে কোন তরুণীর লাবণ্য-শ্রী অঙ্গ-ঘেরা নীল শাড়ীর জরিন পাড় নয়—তা' বেদেনী মেয়ের বিদ্যুৎ নাগিনীরই চঞ্চল ফনা :

ও কোন বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী।

প্রকৃতির ছয় ঋতুর মধ্যে 'মধুর মুরতি' শরৎ এবং 'কুঞ্জ-কুসুমিত' বসন্ত যতীন্দ্র-কবি-মানসের রুদ্ধ-দ্বার-প্রান্ত হ'তে নিষ্ফলে ফিরে গেছে—দ্বার ভেদ করে অন্তর্লোকে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেয়েছে একমাত্র গ্রীষ্ম এবং শীত। প্রথমেই বলেছি কবি রুদ্রের উপাসক, নির্মমতার পূজারী। গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই কালেই প্রকৃতির নির্মমতা ও ভীষণতা উলঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। গ্রীষ্ম আসে তার খর-দীপ্ত অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে করতে আর শীত আসে তার নির্মমতম পিঙ্গল জটাজাল নিয়ে। এই দুই চরমকাল তাই কবির আনন্দ-সহচর হ'তে পেরেছে।

সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রকৃতির দু'টি রূপের সন্ধান পাই—একটি রূপের মধ্যে প্রকৃতি প্রকৃতিই থেকে আপন সৌন্দর্য-সম্ভার ও মহিমাকে বহির্বিশ্বে ব্যঞ্জিত করে দেয় অপর রূপে সে আর প্রকৃতি থাকে না—মানুষের দোসর হয়ে তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হ'য়ে পড়ে। যতীন্দ্রনাথ মানুষের কবি—মানুষের কথা বাদ দিয়ে তিনি কোন দিন প্রকৃতিকে চিন্তা করতে পরেন নি। মানুষের ভালমন্দের পটভূমিতে প্রকৃতিকে বসিয়ে তিনি তার রূপ আস্বাদন করেছেন। বলাবাহুল্য এখানেও তিনি দেখেছেন মানুষের ওপর প্রকৃতির জান্তব হিংস্রতার নির্মমোন্মুখ রূপ। প্রকৃতি ছলে বলে কৌশলে সর্বদা মানুষের ওপর অত্যাচারের কাজেই লিপ্ত। প্রকৃতি মানুষের আরাধ্যা, প্রকৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং তার চরিত্র গঠন করে এ সব ভুয়ো কথা যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে মানব সৃষ্টির সেরা, প্রকৃতি তার অনেক নিম্নে। সুতরাং :

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথ যাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।

অলীক স্রষ্টা যেমন মানুষের পরাভবের জন্য দায়ী, তেমন প্রকৃতিও মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও বীর্যবান হওয়ার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। আপন-প্রভাব দিয়ে প্রকৃতি সর্বদা নানা ভাব-ব্যঞ্জনায় মানব-সমাজকে সেই অলীক

স্রষ্টার অভিমুখে নিয়ে যায়। তাই কবি বলেন, নিখিল বিশ্বটা যেন সেই অলীক স্রষ্টার ব্যবসা-ক্ষেত্র এবং প্রকৃতি তার বিজ্ঞাপন। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যদি কিছু শিক্ষনীয় বিষয় থাকে তা' হলো জীবন-সংগ্রামে 'ছলে বলে কলে' দুর্বলকে ধ্বংস করে সেই ধ্বংস স্তূপের ওপর সবলের আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাইতো কবির বাণী-বহ্নির প্রকাশ :

ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়াও চমৎকার !

যতীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ মানব-প্রেমিক কবি। এই নির্ভেজাল অটুট মানব-প্রীতির জন্যেই তিনি হয়েছেন দুঃখবাদী, এবং ঠিক এই একই কারণে তিনি অবিশ্বাসী কবি। কোন ধর্মেই তাঁর আস্থা ছিল না কেননা তাঁর মতে 'ধর্ম হলো মানুষের দুর্বলতা, পরম পরাজয়। আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা মানুষ যদি তার মানুষ রূপে সোজা দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তবেই সে ধার্মিক হয়ে ওঠে—তখন সে চায় আত্মসমর্পন।' এই আত্মসমর্পনের নিগূঢ় অর্থ হলো জীবনের সমুদয় কঠোর দায়িত্ব ও কর্মভারকে এড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং দুর্বল এবং ভীরু চিত্তই হলো ধর্মের স্মরণস্থল। সৃষ্টি এবং ধর্মকে যাঁরা নিখাদ সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক বলে গ্রহণ করতে না পারলো তারাই হয়ে গেল অধার্মিক এবং অবিশ্বাসী। কিন্তু এই অধার্মিক ও অবিশ্বাসীর অপবাদে কবির দুঃখ নেই কেননা কবি জানেন 'শতকরা নিরানব্বই জন' তাঁরই দলে। নিয়ম-নীতিতে, প্রেম-ধর্মে সর্বত্র একটি গোঁজামিল ও জোড়াতালি প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এ ফাঁকি ধরা পড়লে সৃষ্ট জীব নিরুপায় হয়ে তা' প্রেম দিয়ে ঢাকতে চায় :

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

সুতরাং অবিশ্বাসী কবির বজ্র-দীপ্ত ঘোষণা :

প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

যাঁরা বলেন জগতের নিয়ম-নীতি অলংঘনীয়, বিধাতার রাজ্যে অবিচার নেই—সেই অলীক স্রষ্টার বিজ্ঞাপন-জীবীদের নিকট কবি প্রশ্ন করেছেন 'চেরাপুঞ্জি'তে এত অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন নেই তবুও সেখানে অবিশ্রান্ত বাদল-ধারা অবিরাম ঝরছে কিন্তু গোবী সাহারায় যেখানে বৃষ্টিপাতের সব থেকে বেশি প্রয়োজন সেখানে বৃষ্টিপাত নেই—কেন? 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'ই কী

এই বিধাতার লক্ষ্য নয়? বিধাতার রাজ্যে নিয়ম-নীতি কোথায়? বিধি-বিধান কোথায়? মানব-দরদী কবি যতীন্দ্রনাথের কাছে তাই এই অনিয়ম এবং অত্যাচার অসহ্য। কাল্পনিক বিধি নয়—বাস্তবের সংগ্রামশীল মানুষই তাঁর কাছে সত্য :

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।

জড়বাদী অবিশ্বাসী কবির এটাই বোধ হয় সবচেয়ে সরব অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণতম ঘোষণা।

সুতরাং প্রচলিত গোঁজামিল এবং জোড়াতালি দেওয়া ধর্মকে উড়িয়ে আর এক নতুন ধর্মের প্রবর্তনা আবশ্যক। কবি নতুন গীতা রচনার জন্যে তাই ডাক দিলেন নব আগন্তুকদের :

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নি-বাণী
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুঃখের নগ্ন মূর্তিখানি?

॥ তিন ॥

॥ শাসক ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ॥

শাসন শোষণের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের অরুগ্ন ও বলিষ্ঠ বিক্ষোভ আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্য-ইতিহাসে তাঁকে এক বিরল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাঙন-মুখী সমাজ-জীবনের মধ্যে প্রচলিত ব্যাপক অবিচার, শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নির্যাতিত মানুষের জন্যে কবি-মানসের সহজাত বেদনা-বোধ প্রত্যেক কাব্যের অসংখ্য কবিতায় বিচিত্র এবং লক্ষ্যভেদী উপমা-রূপকের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই উপমা রূপকগুলি যেমন তীক্ষ্ণাগ্র তেমনি অব্যর্থ। এখানেও কবি-মানসের 'কবি-ব্যক্তিত্ব' বিশেষ রূপে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নির্যাতিত মানুষের কথা বল্‌তে গিয়ে তিনি বার বার ধনিক সমাজের কথা টেনে আনেননি বরং নির্যাতিত মানুষেরা তদপেক্ষা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নিম্নতর বস্তুর উপর যেমন অত্যাচার করে সেই অত্যাচারিত বস্তুর হৃদয়-যন্ত্রণা দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার নির্মম সম্পর্ককে। তাঁতীর দারিদ্র্য এবং অসহায়তার কথা বল্‌তে গিয়ে তিনি মিল-

মালিককে টেনে আনেননি—তাঁতীর নিত্য ব্যবহার্য 'মাকু'-র সাহায্যে তিনি দারিদ্র্যের ওপর ধনীর নির্মম পরিহাসকে অনবদ্য করে তুলেছেন :

দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।

একদল লোক মাকুর মত মূক হয়ে খেটে চলেছে অবিরাম—তারা অসহায়, নির্যাতিত। তাদের হৃদয়-বেদনা ও ক্লান্ত দেহের সকরুণ আর্তনাদ তো নিষ্ঠুর তাঁতীর কর্ণে পৌঁছায় না। ধনীর ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ণের জন্যে এ হল নিষ্পেষিতের অসহায় আত্মবলিদান। এই বলিদান যত মর্মান্তিক ও নির্মম হয়ে উঠ্ছে ততই ধর্মের প্রগাঢ়-প্রলেপে শোষণকে সমর্থন করার চেষ্টা চল্‌ছে। জননীর কোমল বক্ষে অসহায় রূপে মৃত্যু ঘটে স্নেহ দুলালীর কিন্তু 'দেঁতো'র দল বলে লীলাময় মঙ্গলময়ী :

ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

শ্রীমায়ের চরণ-তলে পাঁঠার বলিদানও আর কিছুই নয়--তা' হলো আত্মভোগলিপ্সু দানব-রূপী শক্তিমান নির্মম মানুষের হাতে পশু-রূপী দরিদ্র-মানবের নিঃসহায় আত্মসমর্পণ। অথচ এই নির্মম হত্যাটিকেও আমরা ধর্মের আড়ালে ঢেকে নতুনতর অর্থ দান করেছি :

অন্য অর্থটি—
যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি ?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এক কোপে বলিদান—
পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি আহা কত না ভাগ্যবান !

"মরুশিখা"-র 'খেজুর-বাগান', 'বাঁশির গল্প'; "মরুমায়া"-র 'পাষাণ পথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতায় নির্দয় শোষণের উলঙ্গ-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। খেজুর গাছের কণ্ঠে নলি বসিয়ে তার যে হৃদয় শোণিত 'রস' বার হয় তাই পান করে রসখোর, তাড়িখোরের বাড়ে উল্লাস :

মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর ;
না জানি সেথানে হেসে খুন কোন্ রসখোর তাড়িখোর !

'কবির এই যে রসখোর এবং তাড়িখোর সম্বন্ধে বক্রোক্তির ব্যঞ্জনা এ শুধু স্বৈরাচারী শোষক মানুষ সম্বন্ধেই নয়—সেই রসখোর এবং তাড়িখোরের পূর্ণ-পরিণতি যে বিধাতায় তাঁর সম্বন্ধেও।'

'পাষাণ-পথে' এবং 'কেতকী' কবিতা দু'টি রূপক-ধর্মী কবিতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। 'ইট-পাথরের বিরাট নগর'-পথে কোন এক খর-দীপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে কবির দৃষ্টি আবদ্ধ হয় লোহার খাঁচায় আবদ্ধ মানুষের সেবারত ছিন্নবৃন্ত 'বকুল' ফুলের প্রতি। বকুলকে বৃন্তচ্যুত করে তার মর্মভেদী ক্রন্দনকে মানুষ ঢাকতে চায় সেবা-ধর্ম-মাহাত্ম্যের রঙিন আল্পনা দিয়ে:

> কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ!
> দেবে-নরে মিলে' ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ।
> ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা,—সেই-ত চরম সুখ,
> ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক।

অসংখ্য কবিতায় কবির এই শোষণ-বিরোধী দীপ্ত-ঘোষণার রক্তাক্ত স্বাক্ষর স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভাঙন-মুখী সমাজ-জীবনেও যে নতুন চেতনা এসেছিল কবিতাগুলি সে চেতনারই অনবদ্য রূপায়ণ। বস্তুতঃ এই কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে কবি-হৃদয়ের যে উত্তপ্ত নিঃসীম অন্তরাবেগ এবং ঐকান্তিক মর্মপীড়ন বজ্র-দীপ্ত-ঘোষণায় আত্মপ্রকাশ করেছে তা' নয়া দুনিয়ার বুনিয়াদ পত্তনের প্রারম্ভিক বিপ্লবী বাণী। এ সব কবিতা দুঃখবাদী কবির হৃদয়-জ্বালার বহ্নি-দীপ্ত অভিজ্ঞান।

॥ চার ॥

॥ যতন্দ্র-কাব্যে সুর পরিবর্তন ॥

শ্যামাঙ্গ বাংলার কোমল বুকের রোম্যান্টিক আবহাওয়ার এক বিশেষ গুণ আছে—সে আপনার জারক রসে জরিয়ে সবাইকে ঠিক আপনার মত করে ফেলে। কত জনই উত্তপ্ত দেহমনে অনির্বাণ বিদ্রোহ বহ্নি আপন ললাট 'পরে জ্বালিয়ে গর্জন আস্ফালনে তার কোমল বুকে পদার্পণ করেছে কিন্তু সে বজ্র-বহ্নি শেষ পর্যন্ত দীপালোকের মত নির্মল হয়ে উঠেছে। তৃণাচ্ছাদিত বাংলার মৃত্তিকার কোমল স্পর্শে শেষ পর্যন্ত সকলেই আপন দেহোত্তাপ হারিয়ে হিম-শীতল হয়ে পড়েছে। এই জন্যেই শৌর্য-বীর্যের আদিম প্রতীক চাঁদ সওদাগরের ধীরোদ্ধত মস্তক লুটিয়ে পড়েছে মনসা দেবীর চরণ তলে, বিদ্রোহী দুলাল নজরুলও শেষ পর্যন্ত আপন বিদ্রোহী সত্তার দীপ্ত-দ্যোতক 'ইস্‌রাফিলের সিঙ্গা' ভুলে 'মুরজ মুরলী'তে তুলেছেন অমিয় তান, দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথও যৌবনোত্তর যুগে দুঃখের দাবদাহ হারিয়ে "মরুমায়া"র মরীচিকার বক্ষ বিদীর্ণ করে অবশেষে ফিরে এসেছেন গঙ্গা তীরে জীবন জুড়ানো বাংলার

বুকে। তাঁর হৃদয়োত্তাপের শিথিলতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে 'সায়াম' কাব্য গ্রন্থ হতে—অবশ্য "মরুমায়া" কাব্য গ্রন্থেই খর-তীক্ষ্ণ আপাতঃ-রূঢ়তার অন্তরাল হ'তে আর একটি কোমল সুর অস্পষ্ট রাগিণীতে গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। "মরীচিকা"র 'বেহালা' কবিতায় এই সুর পরিবর্ত্তনের আভাসটি ধরা পড়েছে :

আমি বোধ হয় কোন্ জীবনে,
দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা ;
অকারণের কান্না হাসি
মুখে যে মোর উঠ্ছে ভাসি'—
এ বুঝি সেই পূব জনমের দেয়ালা !

এ কবিতাকে রোমান্স-রাজ্যের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের বল্তে অস্বীকার করবে কে ?

'শৈব' যতীন্দ্রনাথের এই সুরপরিবর্তনকে ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় কবির স্বধর্ম চ্যুতি না বলে বলেছেন এই পরিবর্তন কবি-মানসের ক্রম-পরিণতি। এই পরিবর্তন যদি যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে লক্ষণীয় হয়ে না উঠ্তো তা'হলে শিল্পী হিসেবে তাঁর মৃত্যু হতো প্রথম তিনখানা কাব্যগ্রন্থ রচনার পরই। কেননা এই সুর পরিবর্তন না হলে প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থের ভাব, ভাষা, ছন্দ পরিবর্তী কাব্যগুলিতে লক্ষণীয় হয়ে উঠ্তো ফলে তা' চর্বিত-চর্বন ছাড়া আর কিছুই হ'তো না। তাই এই সুর পরিবর্তন কবির পক্ষে মঙ্গলের। এই পরিবর্তনই কবির মনঃদিগন্তে নতুন সৃষ্টির উৎস-মূল খুলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই সুর পরিবর্তন বার বার বিভিন্ন ভাবে সংঘটিত হয়েছে। বার বার ঋতু পরিবর্তনের মাঝেই রবীন্দ্র-কাব্য বিরল-সৌন্দর্যের লীলা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনায় অত্যাশ্চর্য সাফল্যের পর কবির বন্ধু-বান্ধব তাঁকে আর একটি বীর রসাশ্রিত কাব্য রচনার জন্যে বার বার অনুরোধ করেন কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবাইকে জানালেন 'A fresh attempt would be some thing like a repetition'—সুতরাং সবাইকে চমকিত করে তিনি লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'। মধুসূদনের কবি ধর্মের বিকাশের জন্যে এই সুর পরিবর্তনের অত্যাবশ্যক ছিল। সুতরাং এই সুর পরিবর্তন দুখের দাবদাহে বহ্নিমান কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে মঙ্গল-প্রসূ হয়েছে।

এখন এই সুর পরিবর্তন কী এবং কিসের তা' যতীন্দ্রনাথের যৌবনোত্তর কাব্যগুলি হতে আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। মোটামুটি ভাবে এই পরিবর্তন সূচিত হ'য়েছে তিন দিক থেকে—প্রকৃতি সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে এবং রোমান্টিকতা সম্পর্কে।

প্রথম যৌবনের কবিতাগুলিতে আমরা দেখে এসেছি প্রকৃতিকে অলীক স্রষ্টার বিজ্ঞাপন বলে কবি যতীন্দ্রনাথ বার বার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানব-শিশুর সমস্ত শৌর্য-বীর্য প্রকৃতি হরণ করে, মানবের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে প্রকৃতি যেন মস্ত বড় বাধা। সুতরাং এ প্রকৃতি কখনো মানুষের বন্ধু হ'তে পারে না। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যে এই দৃষ্টি ভংগীর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। যৌবনোত্তর কাব্যগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত সহজ ও করুণ সুন্দর অভিব্যক্তি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'আষাঢ়-মধ্যাহ্ন' কবিতায় পাই কবির একটি আস্বাদন-মন্থর রূপ-মুগ্ধ মনের পরিচয়—যে অসীম নীল আকাশ একদিন কবির কাছে কারাগার হয়ে উঠেছিল আজ সেই অসীমের উদারতায় কবি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃতি এখানে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু:

> ভগ্নদেহ, রুগ্নমন, নিবিড় নীল গগন, বাতায়নে লৌহ-দণ্ড-সারি,
> মাঠ-পরে মাঠ শুধু আষাঢ়েও করে ধূ ধূ! হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি!
>
> ॥ আষাঢ়-মধ্যাহ্ন : সায়ম্ ॥

এখানে নির্জন আষাঢ়-মধ্যাহ্নের বিরল-সৌন্দর্য কবির রূপ-দৃষ্টিতে অনন্ত-সুন্দর হয়ে উঠেছে। এ প্রকৃতি সুন্দর, এ প্রকৃতি মনোহর, এ প্রকৃতি কবির চির-আরাধ্য।

প্রথম-জীবনে কবির অবচেতন মনে প্রকৃতির ওপর যতটা আকর্ষণ ছিল সচেতন মনে ছিল তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী বিকর্ষণ। কাব্য-জীবনের উষা-লগ্নে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভংগী অবিশ্বাস ও বিরূপতায় পর্যবসিত। জীবনকে তির্যক দৃষ্টিভংগীতে দেখায় কবির প্রথম জীবনে সমগ্র অন্তর্লোক-ব্যাপী অভিমান-বিস্ফার বেদনা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল এবং সেই ঘনীভূত বেদনা-বোধই প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই অসীম প্রকৃতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্লভ রোমান্টিকতার সুর এবং মঙ্গলের বাণী উচ্চারিত তা' কবির শ্রুতিপথে বিধৃত হয়নি; কিন্তু কবির উত্তর কাব্যে এই সুর সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। তাই প্রথম জীবনে যিনি 'শাওন-রাতি'তে মেঘের গুরু গুরু ডাকে শুনেছিলেন শাবক-হারা বাঘিনীর গর্জন, বিদ্যুৎ-ঝিলিকে দেখেছিলেন নাগিনীর নৃত্য,

"সাম্যম্"-এ সেই কবিই শ্রাবণের অবিরল ধারাপাতনে শুনেছেন পথহারা বৈরাগীর একতারার গান, বিদ্যুৎ-ঝিলিকে দেখেছেন মোহিনীর ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে একটুক্‌রো হাসি :

শাওন এল ওই
থৈ থৈ শাওন এল ওই !
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !......
শাওন গাঙের ভাঙন্ বেয়ে
ঘট্ ভরি কাঁখে
কোন বিজলী ডেকে গেল
ঘোমটারি ফাঁকে !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

প্রকৃতির ষড়-ঋতুচক্রের মধ্যে কেবল মাত্র দুই চরম ভাবাপন্ন ঋতু—গ্রীষ্ম ও শীত—প্রথম যৌবনে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত বার বার ধিকৃত হয়ে ফিরে এসেছে কবির কল্পনালোক হ'তে। বসন্তকে তো তিনি বার বার উপেক্ষা করেছেন, তাঁর ভয় ছিল পাছে এই বসন্ত রূপ-তন্ত্রের বাঁধনে তাঁকে বেঁধে ফেলে কিন্তু উত্তর-কাব্যে বসন্তের জন্যে ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। রূপ-পাগল পথিকের মত বসন্তের স্বপ্ন-মন্থর সোনালী দিনের রূপ-সুধা আকণ্ঠ পানের জন্য কবির অন্তরাবেগ শত ব্যঞ্জনায় মূর্চ্ছিত হয়ে উঠেছে। ফাল্গুনের রোমাঞ্চ-রঙিন দিনের কিশোর-সুন্দর দেবতার জন্যে তাইতো কবির উৎকণ্ঠার অবধি নেই :

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তুণ
কিশোর ফাল্গুন,—কত দূর ?
সুতীক্ষ্ণ সায়কাঘাতে তার
কুহু বলি' চমকি উঠিছে কোন্
বেদনা-বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রাশ্রয়ী দ্বীপান্তের বন !

॥ হিম-ভূমি : ত্রিযামা ॥

যে শীত একদিন রিক্ত সন্ন্যাসীর মত পিঙ্গল-জটাজাল নিয়ে দুঃখবাদী কবির দুঃখের দাবদাহে বেগ সঞ্চার করেছিল—সেই শীতকে উপেক্ষার জন্য আজ

কবির মন ব্যাকুল। যৌবনের রক্তোত্তাপ চলে গেছে—কবি আজ তুহিন-কাতর :

এত শীত—
আমার অন্তরে এত শীত!
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্তমান
অবলুপ্ত,—
হিমাচ্ছন্ন যোজক প্রমাণ।

যে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-সূর্যের হোমানল একদিন যৌবন-দীপ্ত কবির বলিষ্ঠ প্রতিবাদের তীক্ষ্ণাগ্র হাতিয়ার হ'য়ে উঠেছিলো সেই বহ্নি-জ্বালা আজ কবির কাছে সুদুঃসহ :

নিদাঘ হ'ল যে সুদুঃসহ
হে মোর ভ্রমর হেথায় রহ
বদ্ধ এ বুকে পাখা ভরি আনো
পদ্ম বনের গন্ধবহ।

॥ ভ্রমর : সায়ম্ ॥

আজ আর নিদাঘের হোমানল নয়, শীতের তুহীন-কাতর নিস্তব্ধ পরিবেশও নয়—কবির আজ একান্ত প্রয়োজন পদ্মবনের গন্ধবহ। কবিমন আজ রূপপিপাসার তীব্রতম আকর্ষণে আলোড়ন বিক্ষুব্ধ। বসন্তের রূপ-উচ্ছল পুষ্প-প্রণয়কে উপেক্ষার জন্যে আজ কবি-মন বেদনা-ম্লান, বর্ষার সজল মেঘমালার আহ্বানকে এড়িয়ে আসার জন্যে আজ কবি-মানস বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে। যৌবনোত্তীর্ণ জীবনের প্রৌঢ়-সন্ধ্যায় কবি-মনের উপল খণ্ডে আজ অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতার মধুর-কোমল আমেজ সুন্দর হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্ম নয়, শীত নয়—হেমন্ত সন্ধ্যার স্বপ্নঘন পেলব-মসৃণ ঝিলিমিলিতে কবি এক সুদূর সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন :

বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন সুন্দরে করি সন্ধান!
হেমন্ত সন্ধ্যার বন্ধু!

॥ হেমন্ত সন্ধ্যায় : ত্রিযামা ॥

এখানে কেবল একটি রূপপাগল পথিকের রূপ-মুগ্ধতা নয়—একটি অনন্য সুন্দর দুর্লভ চিত্র আপন গরিমায় নম্র-মনোহর হয়ে উঠেছে। এখানে কবি-মানস সম্পূর্ণ রোম্যাণ্টিকতার অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আজীবন এই সুন্দরের ধ্যানই করেছেন। যে কবি একদিন প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন সহস্র বন্ধন, অনুভব করেছেন অমঙ্গলের লক্ষ চিহ্ন, যে অমঙ্গল-সংকেত এবং বন্ধন-ব্যূহ বিদীর্ণ করার জন্য ছিল কবির অতন্দ্র প্রয়াস—আশ্চর্য, আজ সেই কবিই প্রকৃতির লক্ষ-কোটি বন্ধনকে নম্র-মস্তকে বহন করার জন্যে আবেগ-ব্যাকুল, প্রকৃতির মাঝেই আজ তিনি দেখেছেন সুন্দরের রূপ-মূর্তি, মঙ্গলের ফল্গু-প্রবাহ। প্রথম জীবনে বসন্তে, বর্ষায় সুন্দরের মধুরতর আহ্বান নির্মম কর্কশতায় ও পৌরুষ-দীপ্তির রুক্ষতায় প্রত্যাখ্যানের পর আজ হেমন্ত-সন্ধ্যার কোমল-বক্ষের রূপাল্পনার মাঝে মহান-সুন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার একী দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মানস-পরিবর্তন এখানে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে।

হেমন্ত-সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে কবি অস্পষ্ট ভাবে যে সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন সে সুন্দরের সবটুকু আপন হৃদয়-দেউলে গ্রহণ করার জন্যে কবি ব্যাকুল। শেষের দিকে প্রথম যৌবনের নিষ্ঠুরতার জন্যে তীব্র অনুশোচনা ও অপরিসীম বেদনা-বোধ কবি-কণ্ঠে আকুল আবেগে ভেঙে পড়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম যৌবনের এই নির্মম ব্যবহার কবির নিকটেও বেদনাবহ হয়ে উঠেছে। তাইতো তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন :

> শস্য-শ্যামল সজল বনের হরিণী তুমি,
> কবে কি কারণে করিলে বরণ ধূসর উষর এ মরুভূমি ?

আজ আর খর-দীপ্ত মরুভূমির বহ্নি-দাহন নয়—শস্য-শ্যামল সজল বনের স্নিগ্ধ হাওয়াই কবির কাম্য। প্রথম জীবনে কবির নিকট প্রকৃতি উদ্ধত, অমঙ্গল-প্রতীক, অসুন্দর আর আজ শান্ত, মঙ্গলময়ী, মধুর। এই চঞ্চল হ'তে অচঞ্চলে, অমঙ্গল হ'তে মঙ্গলে, অসুন্দর হ'তে সুন্দরে উন্নীত হওয়ার মর্মমূলেই নিহিত রয়েছে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মানস-পরিবর্তনের সুস্পষ্ট পরিণতি।

॥ পাঁচ ॥

॥ প্রেম-সম্পর্কে সুর পরিবর্তন ॥

জীবনের উষা-লগ্নে কবির কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল জড়ের আবেদন। চেতনা ও জড়ের মধ্যে তিনি জড়কেই প্রধান করে দেখেছিলেন। তাই প্রথম

জীবনে তিনি যেমন দুঃখবাদী তেমনি জড়বাদীও। বস্তুতঃ তাঁর দুঃখবাদ এই জড়বাদ হ'তেই উৎপন্ন। দুঃখবাদ জড়বাদেরই রকমফের মাত্র। চেতনার ধ্বংস শ্মশানে জড়ের নৃত্য-স্পন্দন কবির কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বলেই কবির কাছে প্রেমের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। প্রেমের সূতিকাগার চেতনা। প্রথম জীবনে এই চেতনা কবির নিকট মিথ্যে হয়ে ওঠায় প্রেমের আবেদনও মিথ্যে হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'প্রেম বলে কিছু নাই।' কিন্তু 'সায়ম্' কাব্য-গ্রন্থ হ'তে কবির এই জড়বাদী দৃষ্টি ভংগীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম জীবনে তাঁর মনে হয়েছিল জড় হ'তেই চেতনের উদ্ভব এবং জড়ের বুকেই চেতনের লয় কিন্তু যৌবনোত্তর যুগে তাঁর মনে হ'য়েছে জড় চেতনের ভগ্নাংশ মাত্র, চেতনের বুকেই রচিত হয় জড়ের শ্মশান-চিতা। সুতরাং উত্তর-কালে কবির কাছে এই প্রেমের স্বরূপ উজ্জল হয়ে ওঠায় নিয়তির মত অনিবার্য কারণে শত বর্ণরাগে প্রেমও বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'সায়ম্' কাব্য-গ্রন্থ হ'তে তাইতো তিনি আর প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং প্রেম তার সুকোমল অনুভূতির সাথে সমুদয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আবীর আল্পনায় কবির চিত্তকে প্রেম-ব্যাকুল করে তুলেছে। তাই আপাতঃ রুক্ষতার অন্তরালে যে রূপ-পিপাসা চাপা ছিল প্রৌঢ় জীবনে সেই রূপ-পিপাসা প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। এই রূপ-পিপাসার অভ্যন্তরলোকে তিনি অবলোকন করলেন সুন্দরের জ্যোতির্ময় মূর্তি। যতীন্দ্র-নাথের প্রেমের কবিতা এই সুন্দরের মহান প্রতিষ্ঠায় বর্ণোজ্জল হয়ে উঠেছে।

প্রেমের কবিতায় এই সুন্দরের মহান প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো এই কবিতাগুলির স্মৃতিধর্মিতা। যৌবনে প্রেমকে অস্বীকার করায় যৌবন-রাগে রঙিন হয়ে সজীব ও জীবন্ত রূপে প্রেম কবির কাছে ধরা দেয়নি—ধরা দিয়েছে স্মৃতিরূপে। স্মৃতি-ধূপের সুরভিতেই কবি উপলব্ধি করেছেন প্রেম-মৃগনাভির স্বর্গীয় বৈভব। সুতরাং কবির প্রেমের কবিতার একপ্রান্তে আছে স্মৃতির স্পর্শ অন্য কোটিতে আছে প্রৌঢ়ত্বের ম্লানতা। কবিতাগুলিতে প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শ আছে বলেই যৌবন-ধর্মী প্রেম-কবিতার অসাধারণ উচ্ছ্বাস এবং সীমাতিক্রমী আতিশয্য হ'তে এসব কবিতা মুক্ত। কবিতাগুলি একদিকে যেমন আতিশয্যহীন সহজ সুন্দর অন্যদিকে তেমনি সংহত সুকুমার। এবং স্মৃতির ভিতর দিয়ে কবি প্রেমকে আস্বাদন করেছেন বলেই বোধহয় একটি করুণ বেদনার সুর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোন কোন কবিতায় যৌবনের নির্মম আচরণের জন্যে তীব্র অনুশোচনাও লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের প্রেম-ধর্মী কবিতাগুলিও স্মৃতি আশ্রয়ী কিন্তু সেখানে অনুশোচনার এমন তীব্র দাহন নেই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতায় এই তীব্র বেদনা-বোধ ও অনুশোচনাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে :

নিবানো দীপের ব্যথা হয়ে জমা
যার দু'টি আঁখি হ'ল নিরুপমা,
ঝরা পাপড়ির নিতি নিবেদন
যাহার ওষ্ঠাধরে।

কিংবা :

দাঁড়াইয়া আজি জীবন-সীমায়
তনয় তনয়া তনুস্থষমায়
হেরি নব বেশে
তব কল্যাণ রূপ,
ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
আরতি গন্ধ ধূপ।

॥ প্রত্যাবর্তন : ত্রিযামা ॥

'ত্রিযামা' কবির জীবন-সায়াহ্নের গোধূলি-লগ্নের কবিতা-গ্রন্থ। স্মৃতি-মন্থর কল্পনা-রঙিন দিনগুলির সাথে কবির হৃদয়ভেদী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস সংযুক্ত হয়ে অধিকাংশ কবিতাকে বেদনা-বিধুর করে তুলেছে। যে বলিষ্ঠ প্রেম-সুষমাকে তিনি যৌবনে করেছেন অস্বীকার আজ বার্ধক্যের দীর্ঘ নিশ্বাসে কবি তাকেই অর্চনা করেছেন মনে প্রাণে :

তোমার যৌবন গেছে
তুমি আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনু মন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।

॥ শপথ ভঙ্গ : ত্রিযামা ॥

বহু অস্বীকৃত প্রেমকে কবি নতুনতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যৌবনোত্তর যুগে। প্রেমে আজ কবি গভীর বিশ্বাসী। জীবন ব্যাপী আজ কেবল প্রেমেরই মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্র তন্ত্র কিংবা ধর্মাচরণ কোন কিছুরই প্রয়োজন

নেই—তাঁর মুক্তি প্রেমের ভিতর দিয়ে এবং সে প্রেমের দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন প্রিয়ার নিকটে :

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতী,
গৃহিনী সচিব সখী হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।

প্রেমাসক্তি জীবনাসক্তিতে এবং জীবনাসক্তি শেষ পর্যন্ত দেহাসক্তিতেও পর্যবসিত হয়েছিল—কবির কতকগুলি কবিতায় এই দেহাসক্তির কথা প্রকাশিত হ'য়েছে। 'সায়ম্' কাব্য-গ্রন্থে "জংশন ষ্টেশন" কবিতাটীর মর্মমূলে স্পন্দিত হ'য়েছে এই দেহাসক্তির কথা :

'তবু দুয়ে' হবে ছাড়াছাড়ি
এই যে জীবন-রাতি
ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দু' জনে—
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
এ রজনী হ'বে ভোর।

কয়েকটি প্রেম-কবিতায় লঘু-চাপল্য এবং হাস্য রসিকতা স্থান পেয়েছে—প্রৌঢ়া গৃহিণীর সঙ্গে প্রৌঢ় গৃহীর কথাবার্ত্তায় হাস্য-কৌতুকের সুন্দর ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে "ত্রিযামা"-র "প্রেম ও কবিতা"র মধ্যে :

ঝামেলা এড়াতে সতী তুমি নাকি সম্মতি
দিয়েছ করিতে বাসা ভিন্ন,
কিছু কিছু খোরাকীর আশা পেলে সে নাকি
এখনি বাঁধন করে ছিন্ন।

কিন্তু এই তরল পরিহাস-সুরে যতীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার মর্মমূল ঝংকৃত হয়নি, এখানে প্রেম-কবিতার সার্থকতা নয়—এই তরল পরিহাসের খণ্ড-ভূমি অতিক্রম করে কবির প্রেম-কবিতার অনুরণন দূর দিগন্তে বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। বিরহের মাঝেই কবি প্রেমের গভীরতর রূপ দেখেছেন। কালিদাস যে নির্বাসিত প্রেমের গান গেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ আজীবন ব্যাপী যে বিরহ-বিধুর যুগল প্রেমের বন্দনায় সরব, কবি যতীন্দ্রনাথও সেই প্রেমের দুর্লভ-স্পর্শে মহিমান্বিত হ'তে চেয়েছেন :

দুর্লভ কর বন্ধু আমার
দুর্লভ কর হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
কর অতি বল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

এখানেই যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি-মন্থর প্রৌঢ়-প্রেম-নিবেদনের সামগ্রিক সার্থকতা।

॥ ছয় ॥

রোম্যান্টিকতা সম্পর্কে স্বরপরিবর্তন : যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-বিরোধী কিনা ॥

যে কারণে যতীন্দ্রনাথ প্রেম ও প্রকৃতিকে মানুষের হিতাকাঙ্খী রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি—সেই কারণেই তিনি রোম্যান্টিকতাকেও আপন গহন হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল কবিতায় রোম্যান্টিকতার আতিশয্য মানব-কুলের বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনের সহায়ক নয়—অযথা শূন্যগর্ভ বাষ্পাকুলতা আত্মবঞ্চনারই নামান্তর। এই আত্মপ্রবঞ্চনার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন 'সায়ম'-এর 'রবি-প্রণাম' কবিতায় :

শূন্যমুখে বাষ্পস্বরা,
বারংবার ঘুরে ধরা
বিধিবদ্ধ আহ্নিকে বার্ষিকে
এই পূজারতি মাঝে
এ দীপ লাগে যে কাজে
তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,
যত জ্বলি মনে হয়
জ্বালার এ অপব্যয়
কেবলই ত' আপনা বঞ্চনা।

॥ রবি-প্রণাম : সায়ম্ ॥

দূর অসীমলোক থেকে যে অজানা বার বার রবীন্দ্রনাথকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিয়েছে—এমন অজানা রহস্যের পিছনে যতীন্দ্রনাথ কোন দিনই ঘোরেন নি। যতীন্দ্রনাথের মতে এই অজানা-রহস্য অলীক-স্বপ্ন

মাত্র—এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অজানার উন্মাদনা নয় 'সম্মুখেতে যে কষ্টের সংসার' সেটাই আসল সত্য। তাই যাঁরা অজানা রহস্যের পিছনে উন্মাদ হ'য়ে ফেরেন—ওড়ার আবেগে তাঁদের দেহটা পিছনে পড়ে যাবে কিনা কবি শ্লেষ-পূর্ণ কণ্ঠে সেটা দেখে নিতে বলেছেন। আসলে প্রথম জীবনে কবি বক্র-কটাক্ষ দিয়ে সকল কিছুই দেখেছিলেন বলেই জীবনের গভীরতর সত্য অপেক্ষা দুঃখের দিকটাই তাঁর দৃষ্টিতে প্রধান হয়ে উঠেছিল—জীবনের এই 'কালো' রূপের অন্তরালেই সকল সৌন্দর্য-সুষমার সমাধি রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্র-জীবনে বার বার বিভিন্ন সংগীতে যে অসীম রহস্যময়ীর নিরব পদ-সঞ্চার হয়েছে, যে অসীম-লীলা-খেলায় কবির জীবন-বেলা বার বার উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে—সেই চির মধুর অচেনাকে চেনার জন্যে, সেই লীলা মাধুরীর কথা বলার জন্যে সহস্র সহস্র কবিতা লেখার পরও কবি বলেন :

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,……
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।…
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারই প্রকাশ।

॥ বলাকা : ৪১ নং কবিতা ॥

রোম্যান্টিক-বিরোধী কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্লেষ প্রয়োগ করার এই তো সুযোগ। অমনি তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় :

প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছ নিজ গলা,
সন্ধ্যা বেলাও ভগ্ন কণ্ঠে সে কথা হবে না বলা !
কেন এ প্রয়াস ভাই ?
যে কথা তোমার হ'ল নাকো বলা, নেই সেই কথাটাই।

॥ ঘুমের ঘোরে : ৪র্থ ঝোক : মরীচিকা ॥

এখানে যতীন্দ্রনাথ কেবল রবীন্দ্র-বিরোধীই নয় রোম্যান্টিক-বিরোধীও। আসলে প্রথম জীবনে বাস্তব দিকটা কবির দৃষ্টিতে প্রকট হ'য়ে ওঠায় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কয়েকটি 'হক' কথা সবাইকে শুনিয়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা যতীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল—তাই সকল রূপরসের বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে সরব হ'য়ে উঠেছে কবির আপাতঃ রূঢ় কর্কশ কণ্ঠ। তিনি বহুবার বলেছেন কবিতা ভোগ

বিলাসের সামগ্রী নয়—তাই লোক-মুখে তিনি কাঞ্চীপুরের কবি-প্রিয়াকে রাজ সভার নটী বলে রটিয়ে দিয়েছেন :

লোকের মুখে দেশ বিদেশে বার্তা গেল রটি'
কাঞ্চীপুরের কবি-প্রিয়া কাঞ্চীরাজের নটী।

॥ কবি জাতক কথা : ত্রিযামা ॥

তাই তিনি শেষ পর্যন্ত কবি-প্রিয়া ছন্দায়তীর বীণা যন্ত্রে বিষ মিশিয়ে ভোগ বিলাসিনী কবি-প্রিয়াকে দাহন যন্ত্রনায় দগ্ধ করেছেন—এখানে ধ্বংস হয়েছে ভোগ বিলাসীনীর বিষাক্ত মূর্ত্তি। এই কবিতার ভিতর দিয়ে কবি প্রকারান্তরে রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু রোম্যান্টিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিরোধ শোষ পর্যন্ত কবি রক্ষা করতে পারেন নি। 'সায়ম' কাব্য-গ্রন্থ হ'তে যে সমন্বয়ের সুর কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল তার পূর্ণ পরিণতি দেখি 'ত্রিযামা'য়। প্রকৃতি সম্পর্কে সুর পরিবর্তনের কবিতায় আমরা দেখেছি কবির বীণা-যন্ত্রে গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে অজানা রহস্যেরই সুর-মূর্চ্ছনা—কিন্তু এই অজানার বিরুদ্ধেই তো কবির আজীবন বিদ্রোহ! অবশ্য 'সায়ম'-এর পূর্বেই কবির কণ্ঠে এই সুর বিশেষ রূপে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলও তাঁর 'সায়ম' এর পূর্বে সংঘঠিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন চেতনাশ্রয়ী, যতীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ছিলেন জড়বাদী—এখানে রোম্যান্টিকতা ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধ। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি চেতনাশ্রয়ী—এখানেই তিনি রোম্যান্টিকানুগ এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর বিরোধের অবসান এখানে। 'ত্রিযামা'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি রোম্যান্টিক-রবীন্দ্র উভয় বিধ বিরোধাবসানের সুস্পষ্ট ঘোষণা পত্র:

নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা দখিন সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা যৌবনের রাগে
সেখানে উতল প্রাণে হৃদয় মগন গানে কবি এক জাগে।......
উঠিছে ঝিল্লির গান তরুর মর্মর তান নদী কলস্বর।
প্রহরের আনা গোনা যেন রাত্রে যায় গোনা আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে সংগীত উদার,
সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লও মনে জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র-পর্ণে প্রস্ফুট আলোকে,
পরিচয় লহ তার মহামৌণ তমিস্রার নক্ষত্র পুলকে।

কবিতাটি তো রবীন্দ্র-প্রসস্তি বটেই তা' ছাড়া যেন রোম্যান্টিক তুলির বিরলদৃষ্ট বর্ণ-বিন্যাসে আঁকা একখানি বিচিত্র মনোরম চিত্র-এ্যালবাম্।

প্রথম জীবনে কবি ছিলেন নাস্তিক—ঈশ্বরের বিশ্বাস তো দূরের কথা সেই শয়তান 'কর্মকারের' বিরুদ্ধেই তো তাঁর যত বিদ্রোহ। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি আস্তিক—ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরশীল। 'সায়ম', 'ত্রিযামা'র অনেকগুলি কবিতায় এই নির্ভরতার বার্তা ঘোষিত হয়েছে। আস্তিক মনের পরিচয় 'গান্ধীবাণী' কবিতায় সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে:

প্রত্যয়ের মত প্রত্যয় জন্মেছে অন্তরে,
তাঁর ইচ্ছার দোলা না লাগিলে
পাতাটিও নাহি নড়ে।
প্রতি নিশ্বাস সহ
বুক ভরে মোরা করি যে গ্রহণ
তাঁহারই অনুগ্রহ।

এ 'গান্ধীবাণী' নয়—যতীন্দ্রবাণী। নাস্তিকের বাণীতে ঈশ্বরের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় কখনো সম্ভত নয়। এই আস্তিকতাও তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধ মীমাংসার আর একটি দিক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম জীবনে কবির বিরোধ থাক্‌লেও শেষ জীবনে ঐকান্তিক মিলনই প্রধান হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় এ প্রসঙ্গে দুঃসাহসিকতার প্রকাশ করেছে। তাঁর মূল্যবান মন্তব্যটি এই: "যতীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধীতা করেছেন, তার মূলে কোথাও যথার্থ বিরোধ ছিল না—রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ অনুরাগই তাঁকে রবীন্দ্র-অভিমানী করে তুলেছিল। সেই অভিমান কবির পরিণত কবিতায় পরম অনুরাগেই পরিণত হ'য়েছে, কবি তাঁর স্বরূপে ফিরে এসেছেন।"

প্রথম যৌবনে রোম্যান্টিকতার সাথে বিরোধ থাক্‌লে শেষ জীবনে সে বিরোধ যে বিদূরীত হ'য়েছে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আর একপ্রকার রোম্যান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে—শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় যাকে বলেছেন 'নব রোম্যান্টিকতা' এবং রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় 'রোম্যান্টিকতার রকম ফের'।

যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি কবিতা পাই যেগুলির মধ্যে আপতঃ দৃষ্টিতে কোন রোম্যান্সের আমেজ নেই বলে মনে হয়—কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখ্‌লে সেই সব কবিতার মধ্যেও 'নব রোম্যান্টিকতার' অপূর্ব দীপ্তি চোখে পড়ে। বহু খ্যাত 'বেদিনী' কবিতাটি এই ধরণের কবিতার একটি:

ফাল্গুন হাওয়া নয়রে বেদিনী, দখিন হাওয়া এ নয়
ঈশান কোনের ফণীর ফণায় বিষের নিশ্বাস বয়।…
অকালের এই কাল বৈশাখী ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে বেদেনীর হাত ধর।…
হাওয়ার উজানে দিক ঠিক রেখে আঁধারে আঁধারে চল,
আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ পারের সাপুড়ে দল।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'বে কবিতাটি একটি বাস্তব চিত্রবাহী রোম্যাণ্টিকতা শূন্য বাস্তব কবিতা। বাস্তববোধের জন্যে 'ফণীর ফণায় বিষের নিশ্বাস', 'তাঁবুর খোঁটা,' 'ভাঙা ফাটাফুটো তৈজস,' 'ছাগলের দড়ি,' 'সাপের ঝাঁপি,' 'লম্বা লম্বা সাপ' সবই আছে কিন্তু বিদ্যুতের ঝিলিক যে কবির কাছে লম্বা লম্বা সাপ হ'য়ে ওঠে তাঁর মত রোম্যাণ্টিক কবি আর কে? অনির্দেশ্য রহস্যের পিছনে ঘুরে রোমাঞ্চের সৃষ্টি নয় বরং অতি স্থূল একান্ত বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে উজ্জ্বল রোমাঞ্চের সঞ্চারণই হলো 'নব রোম্যাণ্টিকতার' প্রধান লক্ষণ। 'বনপ্রস্থ' কবিতাটিও এই শ্রেণীর কবিতা—সেখানে পাহাড়ী নদী, বাঘা বাইসনে জল খাওয়া, গারোণীর ডাক, পথহারা গাভীর হাম্বারব সবই আছে তবুও কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবুকতার সীমা-স্বর্গ স্পর্শ করেছে। একান্ত বাস্তব জীবনের ওপর কবি এনেছেন রোম্যান্টিকতার সুর-মূর্চ্ছনা। 'নব রোম্যান্টিকতার' আমেজে কবিতাটি দুষ্প্রাপ্য মনোহর হ'য়ে উঠেছে।

॥ সাত ॥

॥ যতীন্দ্র-কাব্যের ছন্দ ও আঙ্গিক ॥

এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে গঠন-রীতির দিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথের কবিতা খাদ-শূন্য। কোন দুর্বল অংশ তাঁর কবিতায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায়নি। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সংঘর্ষ-সচেতন শিল্পী। এই সচেতন মনের প্রমান-পরিচয় তাঁর কবিতার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তাঁর কবিতার গঠন-রীতি ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনিতে অটুট। তিনি 'কর্দম' দিয়ে ঘর গাঁথেননি গেঁথেছেন 'ইষ্টক' দিয়ে। "কবিতার ক্ষেত্রে মাটীর ঘরের প্রতি কোন আসক্তি ছিলনা যতীন্দ্রনাথের; কাদা-মাটিকে বাছিয়া-ছানিয়া প্রয়োজানুরূপ বিশেষ বিশেষ ছাঁচে ঢালিয়া—তাহাকে ভাবনার তাপে তাপে শক্ত করিয়া পোড়াইয়া লইয়া তবে সেই উপাদানেই তিনি বিশেষ কবিতার আকার প্রকার গড়িয়া

তুলিতেন।" এই 'ইষ্টক' গঠনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। 'ঘুম ঘোর' কবিতাটি রচনার জন্যে তাই সুদীর্ঘ চার-পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত হ'য়েছে। একটি কবিতার পিছনে (কাব্য নয়) চার পাঁচ বছর সময় বাংলার অন্য কোন কবি ব্যয় করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু ছন্দ ও গঠন-রীতি সম্পর্কে হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথম তিনখানি কাব্য-গ্রন্থে কেবল মাত্র মাত্রিক ধ্বনি প্রধান ছন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠকের নিকট বিরক্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। দু' একটি কবিতায় ছন্দের অদল-বদল থাক্‌লেও তা পাঠক-মনে নতুনতর কোন আস্বাদন-বৈচিত্র্য এনে দিতে সক্ষম হয় নি তবে 'সায়ম' কাব্য-গ্রন্থ হ'তে কেবল মাত্র বিষয় বস্তুতে নয় গঠন রীতিতেও বিচিত্র ভংগীর পদসঞ্চার ঘটেছে। 'সায়ম' এবং 'ত্রিযামা'য় 'বলাকায়' ব্যবহৃত ছন্দের মত কিছু মুক্ত-বন্ধ ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। তিনি নতুন ধরনের অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করেন। ভাষার সাংকেতিকতা সম্পর্কে কবি ছিলেন একান্ত সচেতন এবং ভাষাকে দিয়ে তিনি অপূর্ব শক্তিসম্পন্ন সংকেত ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। কবিতার মধ্যে তিনি প্রচুর উপমা-অলংকারের ব্যবহার করেছেন—কিন্তু উপমা-প্রয়োগের মধ্যে যতীন্দ্র-নাথের 'কবি-ব্যক্তিত্ব' সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। উপমাগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন একান্ত জানা-চেনা বাস্তব-জীবন হ'তে—অথচ প্রয়োগ-নিপুণতায় তাদের লক্ষ্য অবর্থ হ'য়ে উঠেছে। তিনি অনেক আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে কেউ-ই অভিজাত শব্দগুলির পাশে এমন আটপৌরে শব্দের সুসমাঞ্জস্য পূর্ণ প্রয়োগসাধন করতে পরেননি। কবি, যতীন্দ্রনাথের পক্ষে বাংলা কবিতার ছন্দে শব্দ প্রয়োগ ক্ষেত্রে এ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। মাঝে মঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রবণতার জন্যে তাঁর কবিতা বলিষ্ঠ বক্রোক্তি এবং শাণিত স্পষ্টোক্তির লক্ষভেদী প্রয়োগ অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। বিদ্রূপাত্মক কবিতায় পরিহাস নৈপুণ্য, বক্র-বিদ্রূপ এবং শ্লেষ-সমৃদ্ধ বাক-বৈদগ্ধ বিশেষ রূপে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। তবুও বাঁধুনি এবং সংযমের অভাব হয় নি কোথাও। যতীন্দ্রনাথের কাব্য-রীতি সম্পর্কে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "তাঁর কবিতায় বিভিন্ন জাতীয় শব্দের শ্রীক্ষেত্র রচিত হ'য়েছে। তৎসম শব্দ থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন-জীবনের অনভিজাত শব্দ পর্যন্তও তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হ'য়েছে কিন্তু কবি আশ্চর্য কৌশলে সরু-মোটা সব মিলিয়ে সুকুমার ও সুগঠিত কাব্যরূপ রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় শিথিলতার স্থান নেই বল্লেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের পর কাব্য-রূপে এমন আতিশয্যহীন সংযত গাঢ় ক্ল্যাসিক্যাল গুণ বিরল দর্শন। কবিতার শব্দ-বৈচিত্র্যে যতই থাকনা কেন ইঞ্জিনীয়ার কবি তাকে অনায়াসে কংক্রিট করে তুলতে পারেন।”

যতীন্দ্রনাথ কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সার্থক গদ্য কবিতা তাঁর কাব্যে বড় নেই, অধিকাংশ মিলহীন ভগ্ন পয়ার মাত্র।

সর্বশেষে স্মরণ করি, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ। কিন্তু দুঃখবাদ পরবর্তী জীবনে ভেঙে চুরে নতুন রূপে, যদি ধৃষ্টতা না হয় তা’ হলে বলি—সুখমুখী রোম্যান্টিক বাদে পরিণত হয়েছে—তবুও যতীন্দ্রনাথের বড় পরিচয় তিনি দুঃখবাদী এবং এই পরিচয়ই তাঁর সর্বপ্রথম, সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পরিচয়। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যদি যতীন্দ্রনাথের এই বিরল-ব্যতিক্রম দৃষ্ট না হ’তো তা’ হ’লে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামটির সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য অনেক বাঙালী পাঠকের হ’তো না। হয়তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাঁর নামটিও কালান্তর-লীলায় অস্পষ্টতার স্তর অতিক্রম করে অবলুপ্ত হ’তো।

॥ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ॥

॥ এক ॥

॥ সত্যেন্দ্র-কাব্যের পটভূমিকা ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই জাতের যা কেবল উন্নত-শীর্ষ হ'য়ে নিজেকেই প্রকাশ করে না সাথে সাথে আড়াল করে অন্য সকলকে। তবুও এই সর্বগ্রাসী কবি-প্রতিভার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে ক'জন আপন স্বরূপ-স্বাতন্ত্রে এভারেষ্টের পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরির মত আপন মহিমায় উর্ধোন্মুখ হ'য়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রধান। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে উদার অসীম-ব্যপ্ত কল্পনা-গরিমার অভিব্যক্তি দেখেছি সেই সীমা-লীন ধ্যান-স্বপ্নের প্রমাণ-পরিচয় এঁদের কারো সৃষ্ট শিল্প-কর্মে নেই—তবুও এঁরা বাঙালীর অতি পরিচিত এবং প্রিয় কবি। মহৎ কল্পনা-ঐশ্বর্যে এঁরা দৈন্য হ'লেও এঁদের দৃষ্টি ভংগীতে ছিল তীর্যকতার ছায়াপাত। এক একজন পৃথকানুগ দৃষ্টি-কোণ থেকে বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ফলে রচনায় বিভিন্নতা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর রচনা তীক্ষ্ণাগ্র বাণী-বিন্যাসে বুদ্ধি-দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধির মহলে এ সব রচনার গতিবিধি নির্দ্দিষ্ট। সূক্ষ্মতার ঔজ্জ্বল্যে, ইস্পাত-কঠিন গদ্য-রীতিতে, এবং সর্বোপরি হৃদয়-বেগবিরল মনন-নিষ্ট আলাপ-চারণায় এসব রচনা তীক্ষ্ণ-ধার হ'য়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রহস্যময়তার ঘোর বিরোধী। কল্পনার চূড়ান্ত-মহিমায় রবীন্দ্রনাথের রচনা যেখা'ন অতীন্দ্রিয়লোকের রহস্যময় আবরণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে আপন-মানস-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তীব্রভাবে আক্রমন করে বলেছেন : "যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা, তাঁহাকে লইয়া গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গম্ভীর হয় না, কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট; স্বচ্ছ হইলেই Shallow বা অগভীর হয় না, কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া "miraculous" দাবী করিয়া, স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নাহে।" এ উক্তি হতেই দ্বিজেন্দ্রলালের শৈল্পিক-মানসের স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'য়ে ওঠে। তিনি কখনো

অস্পষ্টতার আবরণে স্বীয় সৃষ্টিকে ধূমায়িত করে তোলেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানস সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য স্মরণ-যোগ্য: "রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের এই তিক্ত মন্তব্যের মূল কারণ তার মানসিক স্বাতন্ত্র,— এই কারণেই তিনি রবীন্দ্রকাব্যের রহস্য-গভীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন নি। আধ্যাত্মিকতা-বিসর্জিত সদা-জাগ্রত সচেতন কবি-দৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যে স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতাকেই বড় করে দেখেছেন।"

মোহিতলালের রচনা সার-গর্ভ। কাব্যে কল্পনার প্রাচুর্য আছে। সে কল্পনার বহিঃপ্রকাশ আপন স্বভাব-স্ফূর্ত নয়—সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হ'য়ে তা' অনেকখানি সংযত ও আবেগ-বিরল হ'য়ে পড়েছে। বাস্তব-ধর্মীতা মোহিতলালের রচনার আর একটি বিশেষ গুণ। শাণ-বাঁধানো পাকা-সাহিত্যিক রাস্তায় তাঁর কবিতার যাতায়াত—সর্বত্র একটি সচেতন মনের স্পর্শ আছে। তাঁর রচনায় দুর্বল অংশ বড় কম। স্মৃতিচারী সংঘর্ষ-সচেতন মনের ব্যাকুল-বীণায় কেমন যেন একটি বেদনার সুর বেজে উঠেছে—মোহিতলালের কাব্যের অনেক স্থানে এই আত্মিক-বেদনার ম্লান ছায়াপাত হয়েছে। একটি বিদ্রোহাত্মক সুর-ধ্বনিও মোহিতলালের কাব্যে শোনা যায়—কিন্তু তা' ম্লান সন্ধ্যার পুরবীর তান—ভৈরবীর নর্তনশীল প্রচণ্ডতায় তা' আবর্তিত হ'তে পারেনি। যাহোক—মনন-নিষ্ঠতা এবং সংযত আত্মসচেতনতার ছায়াপাতে মোহিতলাল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আসনের অধিকারী। কিন্তু বুদ্ধি-দীপ্ত এবং মনন-প্রধান হওয়ায় এঁর রচনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন উপর তলার মানুষদের জন্যে সীমিত হ'য়ে আছে—আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাছে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র এঁর কবিতার ভাগ্যে জোটে নি!

নজরুল এবং সত্যেন্দ্রনাথ উভয়ের রচনাই আমাদের বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। কবিতার ক্ষেত্রে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বোধহয় এমন ব্যাপক প্রচার আর কোন কবির ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। এই যুগল কবিদ্বয়ের মধ্যে আবার নজরুল-কাব্যের প্রচার এবং প্রসার সর্বাধিক। বাংলা কাব্যের কোমল বুকে নজরুলের আকস্মিক পদসঞ্চার—তার ধমনীর মন্থর-শিথিল প্রবাহকে বিদ্যুৎ-দীপ্তির চকিত-স্পর্শে হঠাৎ তীব্রভাবে আন্দোলিত করে গেল। একটি কাল-বোশেখী ঝড় অথবা প্রচণ্ড লু বাঙালী মনের কোমল বেলাভূমির ওপর ঊর্মি-মুখর সমুদ্রকল্লোলের প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেল। কাব্য রাধা-শ্যামের কুঞ্জবনের ছায়ালোকের খেলা ছেড়ে ইরাণী-রোমাঞ্চের রৌদ্রভারে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সহজ-মসৃণ কাব্য-ধারার মধ্যে একটি সরব উচ্চ কণ্ঠের ক্ষুরধার

আহ্বান সকলকেই সচকিত করে দিল। এমন কি মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল বিস্মিত হ'য়ে ঘোষণা করলেন: "আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতালা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতালা হইতে নামেন নাই।...নজরুল ইস্‌লাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর তাই। তাহাতে পালিশ বেশী নাই; আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।...কাজী নজরুল ইস্‌লাম নূতন যুগের কবি।" নিখিল মানবের জন্যে সুতীব্র বেদনা বোধ, অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভৈরবীর মীড় রচনা করা ছাড়াও প্রেম-কোমলতার চির মধুর সুরের নবীন উদ্‌ঘাটন নজরুর-কাব্যের আর একটি দিক। কঠিন-কোমলের সংমিশ্রনে নজরুল কাব্যের আস্বাদন-বৈচিত্র্য অনবদ্য। নজরুল কাব্যে সুকর্ষিত কোন নিখুঁত কাব্য-রীতি অনুসৃত হয় নি—ভাব প্রবাল্যে ছন্দ আবর্তিত হ'য়েছে। ফলে অনেক স্থানে ছন্দের দৌর্বল্য পীড়াদায়ক। তীক্ষাগ্র বাণী-বিন্যাস কিংবা বুদ্ধি-দীপ্ত আলাপচারণা—এদের কোনটিও নজরুল-কাব্যে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। অনুভূতি এবং সহজ বেদনা-বোধের আবেগেই তাঁর কবিতা অভিনব। অনেকগুলি কবিতায় প্রকৃতি-তন্ময় মনের পরিচয় পাই। কোন কোন কবিতায় কল্পনার অসীমতা মনকে আকর্ষণ করে। সিন্ধু-হিন্দোল, পূজারিণী ইত্যাদি কবিতাগুলি তার প্রমাণ। ছন্দ মাঝে মাঝে দুর্বল হ'লেও বাংলা কাব্যে নজরুল দীপ্ত এবং চটুল ছন্দের বিচিত্র গতিপথ আবিষ্কার করেন—ফলে ছন্দ-বৈচিত্র্যও তাঁর কাব্যের আর একটি দিক। ভাব এবং প্রকাশ ভংগীর এই সরব বৈচিত্র্য-বলিষ্ঠতাই বাংলা কাব্যে নজরুলের আসন সুপ্রতিষ্ঠ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ এলেন ভিন্ন স্রোতে গা ভাসিয়ে। তাঁর কল্পনা সুদূরাভিসারী নয়। অস্পষ্টতা বা রহস্যময়তার ঘোমটা টেনে তাঁর কবিতা-বধূ বনান্তরালের কুঞ্জবন অধিবাসী হয়নি। অতি স্পষ্টতা তাঁর কাব্য-ধারার উৎস মূল হ'তে আপন-অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। এদিক দিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুসারী। মনে হয় বঙ্গ এবং ভারত ভূমির প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতির দীক্ষাও তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট হ'তে গ্রহণ করেছিলেন। মোহিতলালের কাব্যে যে সচেতন মনের স্পর্শ পাওয়া যায় সত্যেন্দ্র-কাব্য ধারায়ও তা আভাসিত হ'য়েছে। প্রমথ চৌধুরীর মনন-প্রধান বুদ্ধি-দীপ্ত রচনারও ছোঁয়াচ সত্যেন্দ্রনাথে বর্তমান। অনেক স্থানেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য আঙ্গিক সচেতনায় বুদ্ধি-প্রখর্যের দিগন্তে পদার্পণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন হ'য়েও তিনি স্পষ্টতার

দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের এবং মনন প্রবণতার দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর পদানুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ধারায় যে সুদুর্লভ কল্পনা এবং ব্যঞ্জনগর্ভ ভাবের প্রবর্তনা দেখি তা' সত্যেন্দ্রনাথে নেই—এবং তা' না থাকার জন্যে নিজের অক্ষমতাও বেশ কিছু পরিমাণে দায়ী। রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেকার কবি-মানসের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় একটী সুন্দর কথা বলেছেন: "সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানস বহু-বিচিত্র আপাত-বিরোধী মানসিকতার আশ্রয়-ভূমি। রবীন্দ্রযুগের প্রখর আলোয় বাস করেও তাঁর একটি স্বতন্ত্র জগৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে কাছে এসেও তিনি সবচেয়ে বড় অ-রাবীন্দ্রিক—এইখানেই তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র আস্বাদন-বৈচিত্র্য।"
বিভিন্ন কবির ভাব প্রেরণা এবং প্রকাশ ভংগীর ভগ্নাংশ দিয়ে সত্যেন্দ্র কবিমানস লালিত হলেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের লাবণ্য চমৎকারিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করে। সত্যেন্দ্রনাথ তৈলচিত্রাঙ্কণের কবি নন—রেখাঙ্কণের কবি। এক বিচিত্র কৌতুহল তাঁর কাব্যকে দুষ্প্রাপ্য মনোহর করে তুলেছে। এবং এই বিচিত্র কৌতুহল বাক-বিন্যাস-চাতুর্যে এবং সুনিপুণ ছন্দের আন্দোলনে অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবি মানসের যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তা' এখানেই—এই বিচিত্র কৌতূহল জিজ্ঞাসার মধ্যে, এই সুনিপুণ ছন্দের অনবদ্য সংযোজনায়।

॥ দুই ॥

॥ কৌতুক ও কৌতূহলের কবি সত্যেন্দ্রনাথ ॥

রোম্যান্টিক কবি চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য হ'লো সীমাকে অসীমের মাঝে, সংকীর্ণকে মনোহরের মাঝে, নিকটকে সুদূরের বুকে লীন করে দেওয়া। বস্তুর উপর তাঁরা কল্পনার রং-তুলি দিয়ে এমনই একটি রোমাঞ্চ-রঙিন রেখাঙ্কন করেন যা' সহজেই বস্তুকে রহস্যময় করে তোলে। সুদূর-প্রসারী কল্পনার গভীরতায় রোম্যান্টিক কবিগণ যে জগতের সৃষ্টি করেন সে জগৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়—তা' অতীন্দ্রিয় লোকের সামগ্রী। বুদ্ধি দিয়ে তাকে বোঝা যায় না—হৃদয় দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। রোম্যান্টিকানুগ রবীন্দ্রনাথ তাই হৃদয়ের কবি। মনোহরের সুবিপুল স্বপ্নরাজ্যে তাঁর পদসঞ্চার তাই অনন্যসুন্দর। অসাধারণ কল্পনা স্পর্শে বস্তুকে লীন বিগলিত করে তিনি যে সুদূর্লভ মনোরমাকে সৃষ্টি করেছেন তা'তে 'আপন মনের মাধুরী'র অংশই বেশী। এই মাধুরীতেই বস্তু

সমুদয় বাস্তবতাকে ভেদ করে, সমুদয় নৈকট্যকে ছেদন করে অপরূপ সুন্দরের দিগন্ত-বেলায় উদ্বেল হ'য়ে ভেঙে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র দেখি একটি কৌতুক 'মন'—'মাধুরী'র সেখানে বড় অভাব। এই 'মাধুরী'র অভাবেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা তথ্যপুঞ্জের বুকে এবং বস্তুর ব্যঞ্জনার মাঝেই গুমরে মরেছে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার মধ্যেই সে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে দেউলিয়া হ'য়ে পড়েছে, এই নিঃসম্বল অবস্থায় সে আর রসলোকের অরূপ দিগন্তে পদচারণা করতে সাহসী হয়নি। দিগন্ত-বিহারী কল্পনার নব কোমল-উত্তাপে বস্তুকে বিগলিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ যখন লাবণ্য-ক্ষরা অরূপ রতন সৃজনে ব্যস্ত সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেই বস্তুকে বস্তুরেখেই কয়েকটি রেখাঙ্কনের অপরিসীম কৌতূহ'লে মত্ত। বস্তুকে বিগলিত করে রসমূর্তি গঠন করার দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল না। বস্তুকে বস্তু রেখে বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবদৃষ্টিতে তিনি তার কয়েকটী আঙ্গিক-সুষম রেখাঙ্কন করেছেন মাত্র।

বর্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ উভয় কবিই অনেক গুলি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষা সম্বন্ধীয় কবিতায় বাদল-ঝরা ধ্বনির অন্তরালে পূরবীর মোহন তানের মত আর একটি ঝংকার শোনা গিয়েছে—যে ঝংকার আমাদের সমগ্র সত্বাকে ভাবোদ্বেল ক'রে এই বস্তু-ম্লান জগতের দিগন্ত বিদীর্ণ করে এক মহান অরূপ জগতের দ্বার-প্রান্তে নিয়ে হাজির করে। 'কি জানি পরাণ কী যে চায়' কিংবা

> 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল গেলরে দিন বয়ে।
> বাঁধন হারা বৃষ্টি ধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
> একলা বসে ঘরের কোণে কি ভাবি যে আপন মনে
> সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে।'

ইত্যাদি কবিতায় বর্ষা আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আর এক সুধা বর্ষণের অবিরল ধারার সাথে বেজে উঠেছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের 'বর্ষা' কবিতায় আছে উল্লাস। বাদল-বরিষণে কবি যেন পেখম তুলে বনান্তরালের কুঞ্জবনে ময়ূরের মত নৃত্য শুরু করেছেন, পরম উল্লাসে তাঁর চিত্ত আবেগ-বিহ্বল হ'য়ে উঠেছে :

> ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগ্‌লী জেগেছে,
> ছাই মাখা তার মাথার জটা আকাশ ঢেকেছে।

প্রথম হ'তেই কবির কণ্ঠে এই যে একটি উল্লাসের সুর সংযোজিত হ'য়েছে এই সুরই কেবল পর্দা পরিবর্তন করে করে বয়ে চলেছে একটানা। শেষের দিকে অবশ্য তিনি বলেছেন :

কোন মোহিণীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,

পুবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;

বলাবাহুল্য এই মোহিণী রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা-বিচিত্রা' সম্ভূতা নন—ইনি একান্ত ভাবেই বাস্তবের। 'ওড়না'ই এ মোহিণীর এক মাত্র সাজ—'ওড়না' ছাড়া রহস্য লোকের কোন অস্পষ্ট আবরণ এঁর অঙ্গে তুলে দিলে ইনি লাজে ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েন।

শরৎ এবং বসন্ত সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতেও উভয় কবির দৃষ্টি ভংগীর এই মৌলিক পার্থক্য স্পষ্টালোকে উদ্ভাসিত। মর্তের অযুত-সম্ভাবনাযুক্ত ম্লান ধুলিকণাকে সত্যেন্দ্রনাথ স্বর্গের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যেতে পারেন নি। রোম্যান্টিক কবি প্রকৃতিকে পর্যাবেক্ষণ করেছেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—নেমে গিয়েছেন তার অন্তর্মূলে, গভীরতম প্রদেশে ; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে পর্যাবেক্ষণ করেছেন কেবল মাত্র কৌতূহলী সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে—উপরটাই দেখে তিনি সন্তুষ্ট হ'য়েছেন, গভীরতম প্রদেশে নেমে যাওয়ার সাহস হয়নি। তাই যে দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির সাথে তন্ময় হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ বসন্তকেও বল্‌তে পেরেছেন 'রোদন ভরা এ বসন্ত'—সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসন্তের একটি ছোট্ট ফুলকে নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছেন। বসন্তের এই চির-উজ্জল মুহূর্তেও যে নিখিল বিশ্বব্যাপী এক করুণ বেদনার ম্লান ছায়াপাত হ'য়েছে তা' সত্যেন্দ্রনাথের অনুভবেরও বাইরে। শরতের উজ্জল আলোয় আর পত্র-পল্লবের শ্যামলিমায় রবীন্দ্রনাথ যখন 'মধুর মূরতি' দেখে পরম বিস্ময়ে নির্বাক হন তখন সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে 'তাল-বাকল', 'শোল-পোনা' :

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,

সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !

দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,

শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে !

এখানে প্রকৃতির তন্ময়তা নেই—আছে বৈশাখের উছল আবেগ, আছে শ্রবণ-সুখকর শব্দের আল্পনা-বিন্যাস। প্রকৃতি-সমুদ্রের উপরের ঢেউ গুলিই সত্যেন্দ্রনাথের সম্বল—ডুবরীর মত গহন-তলে অবগাহন করে মুক্তা তোলার অধিকারী তিনি নন।

ফুল সম্পর্কে বিশ্বের সকল দেশের সকল কবিই কিছু না কিছু সংখ্যক কবিতা লিখেছেন। ডেফোডিল-কে নিয়ে পাশ্চাত্য কবির দল মাতোয়ারা, গোলাপ নিয়ে পারস্যের, আর বাঙালী কবিগণ বাসা বেঁধেছেন কেতকী কিংবা কদম্বের

ডালে। ফুল-সম্পর্কে কবিতা রচনায় প্রায় সকল কবিই ভাবের উচ্চ-গ্রাসে আপন সুরটি বেধেছেন। গোলাপ নিয়ে পারস্যের কবির দল প্রিয়ার রঙিন ঠোঁট অতিক্রম করে চলেগেছেন আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ পথে, ডেফোডিল নিয়ে ওয়ার্ডওয়ার্থও তাই। কীট্‌স্ ডেফোডিলের বর্ণ-সুষমায় লাগিয়েছেন আর এক 'ভাবের রং'—কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ওসব ভাবের ঘরে যাতায়াত করেন নি। ফুল-পেয়ে ছোট্ট কিশোরীর মত তার রং নিয়ে পাগল, 'চাঁপার বরণ তপনের আলো, চামেলী চাঁদের হাসি'-ই কবিকে দিশেহারা করেছে। এই হাসির অন্তরালে আর মহান হাসির স্নিগ্ধরূপ তাই তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। 'একটি চামেলির প্রতি' কবিতায় চামেলী ফুলের মধ্যে ইরাণী-রোমাঞ্চ এনেছেন। কিন্তু এই রোমাঞ্চ সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত। চামেলীকে তিনি সুন্দরী কোন্ বাদশাজাদীর কামনা', 'বান্দা-হাটের কোন্ সে বাঁদীর আঁখিজল' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। চামেলীকে সম্বোধন করে যখন তিনি বলেন :

কোন্ সে পরীর গলার হারে, রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন্ প্রমোদার সুধার ভারে—টুপ্‌টুপে তোর দল'—

তখন আমরা একটি বিশেষ রোমাঞ্চ অনুভব করি। কিন্তু একটু গভীর করে দেখ্‌লেই বোঝা যাবে এ রোমাঞ্চ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবানুগ। চামেলীকে ভাল লাগায় কবি আপন খেয়াল-খুশীমত কল্পনার আমেজে মালা গেঁথে চলেছেন। এবং এ কল্পনা তথ্য জগতের—ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন কল্প জগতের স্থান এতে নেই। বলাবাহুল্য ফুল সম্পর্কিত কবিতা গুলিতে সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনার দৈন্য বিশেষ রূপে ধরা পড়েছে।

মোগল-গৌরব তাজমহলকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'তাজ' কবিতা দু'টিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। জ্যোস্নালোকিত অরূপ তাজের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছেন তার অন্তর্বেদনার গভীর ক্রন্দন : 'ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'। গতির বেগবান স্রোত ধারায় তাজমহলকে ভাসিয়ে দিয়ে কবি কল্পনার সুউচ্চ-শিখরে সুর বেঁধে যেন উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন। বাস্তব-চেতনা, বাস্তব-জগতকে বিলীন করে দিয়ে কবি যেন রূপ-স্বপ্নের সীমাহীন দেশে হারিয়ে গিয়েছেন। বস্তুকে ভেদ করে কল্পনার কি ব্যঞ্জনা-দীপ্ত মহান প্রকাশ! কিন্তু তাজমহলের মর্মমূল হ'তে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ কোন নীরব বাণী শোনেন নি—তাঁর চোখে পড়েছে তাজের রকমারী পাথরের বিভিন্নতা, তাদের কোনটি কোন দেশ থেকে আনিত হ'য়েছে তাদের কথাই কবির কল্পনার ভীড় করে করে এসেছে :

সিংহলী নীলা রাঙা আরবী প্রবাল
তিব্বতী ফেরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা রাশি, আরাকানী লাল
সুলেমানী মণি থরে থর ;
ইরাণী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখরাজ, বুঁদি, গুল্‌নর।······

এখানে 'তাজমহল' একটি জড়বস্তু মাত্র। বস্তুভেদী কোন দূরাগত ভাবকল্পনার ব্যঞ্জনা এ কবিতার মধ্য হ'তে আত্মপ্রকাশ করেনি। বস্তু বস্তুর মধ্যে সীমিত হ'য়ে রং-রেখায় কেবল একটু ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে মাত্র।

স্বদেশ এবং ঐতিহ্য-প্রীতি সম্পর্কে কতকগুলি কবিতাতেও কবির এই স্থূল দৃষ্টি ভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়। সে স্বদেশ প্রীতি এবং ঐতিহ্যপ্রীতি বাংলার প্রান্তসীমা অতিক্রম করে বড় জোড় সর্বভারতীয় হ'য়ে উঠেছে কিন্তু বিশ্বনিখিলের সম্পত্তি হ'য়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সংগঠন সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিও যেখানে কল্পনার বিশালতায় জন্যে নিখিল বিশ্বের সর্ব-কালের সর্ব-দেশের সকল মানুষের প্রাণ সম্পদ হ'য়ে উঠেছে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার গান'এর মন্ত্রে অহিংসার উদ্ঘাটন কিংবা 'আমরা'র মধ্যে বাঙালীত্বের ছায়াপাত একান্তভাবে সীমিত দেশের গণ্ডীতে গুমরে মরেছে। এখানেও কবির কল্পনা উদার অম্বরতলে সরব ঘোষণায় আপন মাধুরিমা বিস্তার করতে পারেনি। (সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-জগৎ যে জ্ঞান এবং বুদ্ধিগোচর, সেখানে যে কোন রহস্য এবং সংশয় নেই, তা' যে বিশেষরূপে বস্তুনির্ভর এবং খণ্ডিত সে সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকের মূল্যবান উক্তি এই : "সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় অদৃশ্য বা অ-ধরার জন্য কোনো সূক্ষ্মতর কামনা মর্মরিত হ'য়ে ওঠে না, কবিচিত্তের দূরায়মান অশরীরী বাসনা দূর নেপথ্যলোকের আভাসে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে না,—অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জগৎছন্দের আল্পনায় সুন্দর হ'য়ে ওঠে। এই কারণেই প্রত্যক্ষ জগতের অতীত কোন ভাবাত্মক অনুভূতি তাঁর কাব্যে রসরূপ লাভ করে নি। তাই সত্যেন্দ্রনাথের মানস-জীবনে বিচিত্ররূপিনী কল্পনার স্থান অধিকার করেছে কৌতুক ও কৌতূহল। কৌতূহলে অনুসন্ধান বৃত্তি তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই কৌতূহলে একটা বিরতির চিহ্ন পড়ে। তা'ছাড়া কৌতূহল জ্ঞানের সীমাভুক্ত, রসের এলাকায় তার যাতায়াত নেই।"

॥ তিন ॥

॥ ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন সে তাঁর ভাব-বিচিত্রতার জন্যে নয়, সে গৌরব তাঁর প্রাপ্য হয়েছে ধ্বনি-গৌরব-দীপ্ত বহু বিচিত্র ছন্দের প্রবর্তনায়। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি বহুলেখা লিখেছেন এবং আশ্চর্যরূপে সফলতা লাভ করেছেন। বহু বিচিত্র ছন্দের প্রবর্তনা এবং তাদের সফলতার মূলে রয়েছে কবিমানসের এক বিশেষ জাগ্রত প্রবণতা। সদা জাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দকে কবিতার মধ্যে এমনভাবে গ্রথিত করেছেন যাতে বন্ধনের বেড়া ডিঙিয়ে ছন্দের অভিনব ঝংকারে কবিতা এক বিশেষ রসমূর্তি ধারণ করেছে। ধ্বনি-গরিমা-দীপ্ত নতুন শব্দের সৃষ্টি এবং প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দকে নতুম অর্থে প্রয়োগ—সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-বৈচিত্র্যের আর একটি বিশেষ দিক। তিনি এমন কতকগুলি নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছেন যেগুলি পাঠক-মনে এক অভিনব সুর-ঝংকার তোলে এবং এগুলির সম্মুখীন হয়ে পাঠক-চিত্ত হঠাৎ যেন চমকিত হয়। 'ইল্‌শে গুঁড়ি' কবিতায় আমরা এমনি কতকগুলি শব্দের সাথে পরিচিত হই :

ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলায় হিম।
কেয়াফুলে ঘুন লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে
আল্‌তা-পাটি শিম।

এখানে 'হিম' শব্দটি ধ্বনি-গৌরব-লাবণ্যের অভিনব সংযোজনা। 'কেয়াফুলের ঘুন' এবং 'আল্‌তা পাটি শিম' শব্দগুলি কবির স্বকীয় সৃষ্টি। বলা বাহুল্য এই সৃষ্টি-সংযোজনায় কবিতার লাবণ্য ও অঙ্গ-সুষমা শতগুণে বেড়ে গেছে। এখানেই শেষ নয়—ইল্‌শে গুঁড়িকে নিয়ে কবির কল্পনা নতুন-শব্দ-সৃষ্টির উল্লাসে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে। ইল্‌শে গুঁড়িকে তিনি বলেছেন হিমের কুঁড়ি, ঘুম-বাগানের ফুল, পরীর ঘুড়ি, পরীর কানের দুল, জলের ফাঁকি, ঝুরো কদম ফুল,। বলা-বাহুল্য শব্দগুলি এক একটি অপূর্ব রূপ-কল্পনা এবং ভাবের দ্যোতক। এই উজ্জ্বল টুকরো অলংকারে সজ্জিত হ'য়ে কবিতা-সুন্দরী কী অপূর্ব সম্ভ্রম আর লাবণ্য-শ্রীই না ধারণ করেছে। ইল্‌শে গুঁড়ির ঝুরো-ধারার সাথে কবির মন

স্বর্ণমসলিনের টুকরো দিয়ে এক একটি চির-সুন্দর চিত্রকণাকে ধরে রেখেছে।

'পাল্কীর গান' এবং 'দূরের পাল্লা' কবিতা দুটি ঘাত-প্রধান ছন্দের অপূর্ব চিত্ররূপ। উল্লাস মনের গোপনে যে অপূর্ব ধ্বনি জেগেছে তাই এই কবিতায় বিশেষ রূপে ধরা পড়েছে। গ্রীষ্মের প্রখর-দীপ্ত দাহন সহ্য করে বেহারারা পাল্কী নিয়ে ছুটে চলছে গ্রামের মাঝ দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে, নদীর কিনারা বেয়ে দূর গন্তব্য পথে। জোর কদমে ছুটে চলেছে বেহারাবৃন্দ। তাদের চলার তালটিও আমূর্ত হয়ে উঠেছে কবিতার ছন্দে :

পাল্কী চলে !
পাল্কী চলে।
গগন তলে
আগুন জ্বলে !...
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !

ক্লান্ত বেহারাদের ঝিমিয়ে পড়া স্তিমিত গতি চিত্রও ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছে। স্বরাঘাত ছন্দের অপূর্ব মুক্তি ঘটেছে দূরের পাল্লা কবিতায়। এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ দেখি রবীন্দ্রনাথে—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের এল বাণ" ছড়ার মধ্যে। পরবর্তী কালে এই ছন্দই অপূর্ব কৌলিন্য লাভ করেছে বিশ্বকবির হাতে—এমন কী খেয়া এবং গীতাঞ্জলীর সংগীত-মুখর কবিতাগুলির মধ্যেও এই ছন্দের ছায়াপাত ঘটেছে। এই ক্রম-কৌলিন্যের অধিকারে শেষ পর্যন্ত এই ছন্দের মধ্য হ'তে স্বরাঘাত বিলুপ্ত হ'য়ে ক্রমান্বয়ে জেগে উঠ্‌লো এক অপূর্ব মন্থর-বাহী কোমলতা। উৎসমূল হ'তে জন্মগ্রহণ করে শাল-পিয়ালের বন চিরে বন্ধুর দুর্গম পাহাড়ী-পথ অতিক্রম করার সময় ঝর্ণাধারায় যে নর্তনশীলতা জাগে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ তাই—কিন্তু মোহনার মিলন-তীর্থে স্রোতের যে মন্থর-পদচারণা তাতে আর কোন চাপল্য নেই—স্বরাঘাতের ধ্বনি সেখানে আশা করা বাতুলতা। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ সাগর-মিলনে নদী-স্রোতের মত শান্ত সমাহিত হ'য়ে গেছে। তাই এই ছন্দের সূত্রপাত যদিও রবীন্দ্রনাথে—তিনি এর মধ্যে বৈচিত্র্য-সম্পাদন করাও সম্ভব ছিল না—কেননা দিগন্ত বিস্তারী গম্ভীর ধ্যান-কল্পনার গুরুভার বহন করা এই ছন্দের সাধ্যাতীত। গম্ভীরতা শূণ্য উল্লাস এবং কৌতুহল প্রকাশের পক্ষে এ ছন্দ অনবদ্য। তাই উল্লাস

এবং কৌতূহলের চারণ কবি সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই এই ছন্দের দিগন্ত সুপ্রসারিত হয়েছে। ধ্বনির আঘাতে, শব্দের দ্যোতনায় কৌতূহল আর উল্লাস যেন একসাথে জমাট বেঁধে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া' ইত্যাদি ঝিমিয়ে পড়া রাবীন্দ্রিক-স্বরাঘাত ছন্দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কী তীব্র গতিবেগেরই না সঞ্চার করেছেন :

ছিপখান্ তিন-দাঁড় তিনজন মাল্লা—
চৌপর দিন-ভোর দেয় দূর-পাল্লা।…
রূপশালি ধান বুঝি এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী তার হাসি মিষ্টি।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানসের পক্ষে এই স্বরাঘাত ছন্দ বিশেষ উপযোগী হ'য়েছিল। উল্লাস এবং ছন্দ, ছন্দ এবং উল্লাস দুই যেন সমান তালে পাল্লা দিয়ে একই সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে।

'দূরের পাল্লা'র মধ্যে নৌকো যাত্রার কথা বর্ণনা করা হ'য়েছে এবং এই বর্ণনার মধ্যে কৌতুহলী কবির জাগ্রত ইন্দ্রিয়-চেতনার প্রমাণ-পরিচয় প্রায় সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। পথ যাত্রার দু' পাশের ছোটখাঁট কোন দৃশ্যই তাঁর দৃষ্টি হ'তে আত্মগোপন করতে পারে নি। পান্নার টাঁকশাল, কঞ্চির ঘর, শ্যাওলার মাঝে বন-হাঁসের ডিম লুকানো, ঘোমটা দেওয়া বৌ, পানকৌড়ি, কলসীর বক্‌বক্ শব্দ ইত্যাদি যতকিছু কৌতুহল জাগান ক্ষুদ্রের ভীড়ে 'দূরের পাল্লা' আমাদের মনে দূর-পল্লীর এক অপূর্ব চিত্র উদ্ঘাটিত করে দেয়।

'পিয়ানোর গান' কবিতায় দেখলাম লঘু স্বরাঘাত ছন্দের আর এক অপূর্ব উন্মত্ততা। ছন্দ এবং শব্দবিন্যাসে পিয়ানোর টুংটাং শব্দগুলিও পর্যন্ত যেন আমরা শুন্‌তে পাই :

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল?

'সবুজ-পরী' কবিতায় স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের দেখি আর এক রূপ। এই কবিতার কোথাও ভাব-গম্ভীর কিংবা ধ্যান-সমাহিত কল্পনা নেই—কেবল উচ্ছল প্রাণের আবেগ শত ধারায় শব্দ ঝংকারে প্রকাশমান :

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি তুলিয়ে চাও।

"নিপুণ কারুকরণ ভাষাতিরিক্ত রসধ্বনি ও সঙ্কেত-তির্যক চিত্রিত ভাষণ এই উল্লাস উচ্ছল রূপাভিলাসের যথার্থ কবিভাষা। সত্যেন্দ্রনাথ এই ভাষার সিদ্ধকাম শিল্পী। এই শ্রেণীর কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকল্প প্রভৃতিতে এক খেয়াল-বিলাসের আমেজ বাদসাহী ঐশ্বর্যে বিলাসিত।"

'চরকার গান' কবিতাটি মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথের ধ্বনিপ্রধান ছন্দের অপূর্ব সংযোজন। এখানে ধ্বনি-গৌরব কবিতাটার প্রাণ-সম্পদ। অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমুদয় তথ্যজাল-দীর্ণ করে, সমুদয় যমকানুপ্রাসের ফল উপেক্ষা করে ধ্বনি গৌরব তার আপন বৈচিত্র্যে ঝলকিত হয়ে উঠেছে:

চরকায় সম্পদ, চর্‌কায় অন্ন,
বাংলার চরকায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ!
বাংলার মস্‌লিন বোগ দাদ্‌ রোম চিন
কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন!

সত্যেন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর কোন কবির কাব্যে ধ্বনির এমন মাহাত্ম প্রচারিত হ'য়েছে বলে মনে হয় না। ধ্বনির গৌরব প্রসারে সত্যেন্দ্রনাথ সার্থক এবং অপরাজেয় শিল্পী।

কিন্তু এই ধ্বনি প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ও সম্ভ্রমকে ম্লান করে দিয়েছে। ধ্বনির স্রোতে কবি এমন গা ভাসিয়ে দিয়েছেন যে কোন কোন কবিতায় ধ্বনির ঠং ঠাং ছাড়া আর অন্য কোন ভাবেই প্রকাশিত হয় নি। ধ্বনির বিচার হীন প্রাধান্য 'চরকার গান'-এও লক্ষিত হয়। 'সিংহল' এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ কবিতায় ধ্বনির ঝংকার ছাড়া সিংহলতত্ত্বের কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। ধ্বনির আড়ম্বর-বহুল সরব-ঝংকারে বেচারা সিংহলকে দূর পথের প্রান্তে নিঃসম্বল ভিখারিণী সাজ্‌তে হ'য়েছে:

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গ ফুল, কর্পূর কেলি-ধূপ;

Young Lochinvar-এর ছন্দ অনুকরণ করে 'সিংহল' কবিতা রচনা করে নূতনত্ব আনা সত্ত্বে তিনি যেমন ব্যর্থ হ'য়েছেন—তেমনি সংস্কৃতের মন্দাক্রান্ত ছন্দের অনুকরণে 'যক্ষের নিবেদন' রচনা করেও বিশেষ সফল-কাম হ'তে পারেন নি। দেশ বিদেশের অনেক কবির ছন্দকে অনুকরণ করে কবি বাংলা ছন্দে কিছু নূতনত্ব আন্‌তে চেয়ে ছিলেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে।

স্বরপ্রধান কিংবা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ছাড়াও যান্মাত্রিক ছন্দেও সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি কবিতা, যতীন্দ্রনাথের বিরহ-গাঁথা, এবং নজরুলের সাম্যবাদীর বিনির্ভিক ঘোষণাতেও যান্মাত্রিক ছন্দের অপূর্ব্ব ছায়া-পাত দেখি। মনের কোন গহন-চিন্তা যান্মাত্রিক ছন্দে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামোত্তুতায় লিপ্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার যেন এই যান্মাত্রিক ছন্দ। ধীর গম্ভীর-নাদী বেগে মনের সব আকুতি যেন নিঃসীম ভাবে প্রকাশিত হয়। অনাচারীর বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথের গণ-জাগরণের ঘোষণা পত্রও রচিত হ'য়েছে এই যান্মাত্রিক ছন্দের বহ্নিমান দোলায়ঃ

> কে আছ আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?
> কে আছ ক্ষুব্ধ, কে বা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?
> যুগ যুগ ধরি' কী করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
> পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !

যান্মাত্রিক ছন্দের মধ্যে বিদ্রোহী দুলাল যে বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ গতিবেগ এনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে-তার কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়।

'গ্রীষ্মের সুর' এর ছন্দ কী জানি না—বোধ হয় পয়ার—কিন্তু ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বাংলা ভাষা সবেমাত্র যে দিন অপভ্রংশের গর্ভ হ'তে জন্মগ্রহন করে মুক্ত আলো বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছিল—সেই সুদূর অতীতকাল হ'তে আজ প্রর্যন্ত কোন কবির এই ছন্দে একটিও কবিতা লিখছেন বলে মনে পড়ে না। প্রতিটি স্তবকে বারটি লাইন আছে। প্রথম ছ'টি লাইন কাব্য-পাঠের দিক থেকে সুন্দর কিন্তু শেষের লাইন ছ'টি পাঠের দিক থেকে বিঘ্ন জন্মায়। উপরের স্তবকে প্রতিটি প্রথম চরণে মাত্র কম এবং শেষের চরণে মাত্র বেশী—ফলে প্রথম ছ'টি চরণ মাত্রা-বৃত্ত ছন্দে পরিণত হ'য়েছে। শ্বাসাঘাতের ফলে পাঠ-কালে এ ছন্দ মনোরম হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি স্তবকের শেষের ছ'টি চরণ নিয়ে

মুস্কিল। কেননা এর প্রতি প্রথম চরণে মাত্রা বেশী এবং শেষের চরণে মাত্রা কম। ফলে পাঠের দিক দিয়ে সর্বত্র একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। যাই হোক এ ছন্দের নূতনত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কবিতাটির মধ্যে গ্রীষ্মের একটি ভয়াল-সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছে। পিঙ্গল আকাশ, পিপাসাতুর চাতকের করুণ-বিলাপ, চম্পাকলির ক্লান্ত হাসি, এবং সর্বোপরি রৌদ্রের দীপ্ত-দাহন সকলে মিলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতাকে নির্মম-মনোহর করে তুলেছে। চিত্র হিসেবেও কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ধ্যান-কল্পনা এবং ছন্দ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মহাসরস্বতী কবিতাটি সমগ্র সতেন্দ্র-কাব্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এমন কবিতা সত্যেন্দ্র-নাথে বিরল-দৃষ্ট। কবিতাটিকে কবির একটি ব্যতিক্রম রচনাও বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'উর্বশী' কবিতাটির সাথে 'মহাসরস্বতী' কবিতার একটি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। শব্দ-নির্বাচন, ছন্দ এবং কিয়ৎ পরিমানে ভাব-সম্পদেও কবিতা দু'টি কী নিবিড় আত্মিক-সম্পর্কে একীভূত। দু'টি কবিতা হ'তে দু'টি স্তবক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম:

সুরসভাতলে যবে নৃত্যকর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি ওঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥ [—উর্বশী]

উদ্ভাসিছ সত্যলোকে নির্নিমেষ ও তব নয়ন;
তপলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর চ্যুত জ্যোতির্ময় পদরেণু তব;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব।
পুরাতনে নবীয়ান;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ!
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেশ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

কবিতা দু'টির মধ্যে অপূর্ব শব্দ-চয়ন এবং গম্ভীর-নাদী ছন্দের দিক থেকে যে একটি গূঢ় সম্পর্ক আছে সে আর কোন প্রমাণ-পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। দু'টিতেই শব্দ-যোজনা এবং ছন্দ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব লালনা এবং রোমাঞ্চ-রস পাঠক-চিত্তকে অনাবিল আনন্দে ভরপুর করে দেয়। এই ছন্দে এবং ভাবঐশ্বর্যে সত্যেন্দ্রনাথ সারা জীবনে আর একটি কবিতাও লেখেননি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ছন্দের ধ্বনি-গৌরব এবং ভাব-মহান কবিতা বিরল।

সংস্কৃত শব্দের মত বাংলা কবিতায় আরবী পার্সী শব্দ যোজনা করে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা-ছন্দকে এক অপূর্ব শ্রী-গৌরব মণ্ডিত করেছেন। বিচিত্র শব্দের কলনাদী-স্পর্শে কবিতা যেন বারবার চমকিত হয়ে উঠেছে। লাল-পরী, নীল পরী, সবুজ-পরী, জর্দা পরী, কবর-ই-নূরজাহান ইত্যাদি কবিতাগুলি আরবী পার্সী শব্দের রহস্যঘন লাজনম্র স্পর্শে ইরাণী-রোমাঞ্চের নিটোল রসে কম্পমান। সুদূর ইরাণের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে, পারস্যের গোলাপকুঞ্জ সকলে যেন বহুদূরে যেতেও আপন রহস্য-লোকের মধ্য দিয়ে আমাদের গহন-মনে দূরাগত কলগুঞ্জণের মত ভীড় করে জমে ওঠে। এই শব্দ-চয়ন সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য এবং ছন্দকে একটি বিরল-বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

যে কৌতূহল এবং সদাজাগ্রত দৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম হ'তে দেখা গিয়েছে—তা আমরণ কাল তার কাব্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রবীন্দ্র কাব্যে সায়াহ্ন-কোমলতা এবং অপরাহ্নিক ছায়াছন্নতার যে ম্লান ছায়াপাত হ'য়েছে সত্যেন্দ্র-কাব্যে তা' হয় নি। তাঁর কাব্যের নৃত্যে-চপল কৌতূহলী ছন্দ সকল ধূসরতা এবং বিষন্নতাকে আপন-বেগে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র একটি প্রাণবন্ত সজীবতা এবং রঙিন রোমাঞ্চ আপন গৌরবে দেদীপ্যমান। সত্যেন্দ্রনাথ রূপোল্লাসের কবি—তাঁর ছন্দ তাই ভাস্কর সুঠাম এবং নৃত্যচপল।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-ছন্দ সদাজাগ্রত মনের দান। ছন্দের দোলন এবং সৌকুমার্যের পিছনে কবির ত্রুটি 'বিশেষ অন্তর' পড়ে ছিল। সংস্কৃত অলং-কারিকদের মতে ছন্দ-বিনির্মাণে কবির কোন পৃথক যত্ন বা আর্তির প্রয়োজন নেই। কেননা ভাবের সাথে ছন্দের দ্রুততা এবং রসাভিব্যক্তির মধ্যেই ছন্দের প্রাণ-সম্পদ বিদ্যমান। ভাব এবং রস-বিন্যাসের চাতুর্যের মধ্যেই ছন্দের হয় অপূর্ব পরিবেশন। কিন্তু ছন্দ-গঠনে সত্যেন্দ্রনাথের পৃথক চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ছন্দ-সুষমাকে হরণ করেছে। অতি-সতর্কতা অতি পতনের কারণ।

বনান্তরে পত্র-পল্লবের আড়ালে লোক-চোক্ষুর অন্তরালে যে কলি ফোটে তার যৌবন-মদিরা ও রূপ-গৌরবের কাছে তিন তলার উপর কার্নিশের কিনারায়

টপের ওপর ফুটে ওঠা পুষ্পের যাবতীয় সমারোহ অতি সহজেই পরাজিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-নির্মানেও তাই হ'য়েছে। অতি সতর্কতা যেখানেই প্রকট হ'য়েছে কবিতার ব্যর্থতা সেখানে অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। শত দোষ ত্রুটি থাকা সত্বেও ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ অমর। সল্পায়ু জীবনে তিনি ছন্দের যে বিচিত্র বীণা বাজিয়ে গেছেন তাঁর মোহতান আজও বাঙালীর অন্তরে পূরবীর মিড় রচনা করে চলেছে।

॥ চার ॥

॥ সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য ॥

সত্যেন্দ্রনাথের কবি বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক তাঁর অনুবাদ-প্রিয়তা। বাংলার কোন কবি বোধহয় এত অধিক সংখ্যক বৈদেশী কবিতা অনুবাদ করেন নি। আরব, মিশর, পারস্য, জার্মান, চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি বহুদেশের বহু কবির বহু কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও এই বিচিত্রতা-সম্পাদন সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কবি-মানসেরই পরিচয়বাহী। অনুবাদের পিছনেও তাঁর সেই বিচিত্র কৌতূহলী মন সক্রিয় ছিল বলেই মনে হয়।

কিন্তু অনুবাদ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের বড় পরিচয় এই বিচত্রতা-সম্পাদনের মধ্যে নয়—মূলের রস অনূদিত কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার মূলেই অনুবাদক হিসেবে কবির সার্থকতা নিহিত। ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় এমন মূলানুগ অনুবাদ হ'য়েছে মনেই হয় না। স্বয়ং বিশ্বকবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতায় মুগ্ধ হ'য়ে যে বাণী পাঠান তার মধ্যেই রয়ে গেছে অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়: "মূলের রস কোন মতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরব তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য।"

অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতীত্ব এইখানে। প্রায় সর্বক্ষেত্রে অনুবাদগুলি এমন প্রাঞ্জল ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে শোভনীয় হ'য়ে উঠেছে যে কবিতাগুলি কোনক্রমেই অনুবাদ বলে মনে হয় করা যায় না। কবিতার শেষাংশ হ'তে যদি মূল রচয়িতার নামটি উঠিয়ে দেওয়া যায়—তা' হ'লে কবিতাটিকে সত্যেন্দ্রনাথের মানস-সন্তান বলেই মনে হ'বে। কবির সেই

ভাস্কর্য-সুঠাম কলানিপুণতা, ইরাণী রোমাঞ্চের প্রতি সেই আত্মিক প্রবণতা, কৌতূহল-রঙিন সেই রসোচ্ছল কৌতুক দৃষ্টি—সবই এই কবিতাগুলির অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে।

প্রিয়া আমার
শোনো, চপল!
গাহে কে! আর
কাঁদে কেবল।

কিংবা:

মৌন-মদির চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে!

এ সব কবিতাকে কৌতূহল এবং ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া অন্যকারুর রচনা বলে মনে করার দুঃসাহস আমাদের কই? সত্যেন্দ্র-পরিচয়-বাহী 'পাল্‌কীর গান' কিংবা 'দূরের পাল্লা'র সাথে এ সব কবিতার কী নিবিড় যোগ!

অনুবাদক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি বড় পরিচয় অনূদিত কবিতায় মূল-ছন্দের প্রবর্তনা। বিদেশী কবিতাকে কেবল অনুবাদ করেই ছাড়েন নি—তার ছন্দকেও অনূদিত কবিতার মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন! সম্রাট শাজাহানের কবিতার মূল ফরাসী ছন্দের অনুসরণে "তাদের প্রথম প্রশস্তি"র মধ্যে এর প্রমাণ রয়েছে:

জগৎ-সার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেষ
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ!

এ কবিতায় মূলের ধ্বনি-বৈচিত্র্য এবং স্বরাঘাত বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়।

॥ পাঁচ ॥

॥ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-বৈশিষ্ট্যের সারসংকলন ॥

এখন সত্যেন্দ্রনাথের কবি-বৈশিষ্ট্যের সার সংকলন করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি সত্যেন্দ্রনাথের কবি মানসের গতি কৌতুক এবং কৌতূহলের মধ্যে নিবদ্ধ। কৌতুক এবং কৌতূহলের দিগন্ত ছিন্ন করে তাঁর ধ্যান-কল্পনা বিচিত্রগামী হ'তে পারে নি। আদিগঞ্চল-বিথারী কবি কল্পনা তাঁর নেই—

অন্তত: কবিতার কোথাও তার পরিচয় মেলে না। সুতরাং ভাব-সম্পদে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা দৈন। চিরস্থায়ী সম্পদ তার ভিতরে কিছুই নেই। কৌতুক এবং কৌতূহল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ—অঙ্কের মত—অথবা প্রশ্নাকুল শিশুমনের একটি বিশেষ অবস্থা। প্রশ্নের সমাধানের সাথে সেই প্রশ্নের প্রতি যেমন শিশুমনের আর কোন গহন জিজ্ঞাসা থাকে না তেমনি কৌতূহল একবার ধরা পড়ে গেলেই তার রসসৃষ্টির সমুদয় গবাক্ষপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা স্পষ্ট-চেতনা-সমৃদ্ধ—সুতরাং সে চেতনায় চিত্তকে-রসবাহী করার কোন দ্যোতনা নেই।

অনুবাদ কবি যতই করুন—আপামর বাঙ্গালী তাঁর অনুবাদের খোঁজ খুবই কম রাখে। তাদের ব্যাগ্রমন তাঁর মৌলিক কবিতার বিচিত্র স্পন্দমান ছন্দের দিকেই নিবদ্ধ। ছড়াছন্দের চটুল মূর্চ্ছনা দিয়েই তিনি বাঙ্গালীর শিশু মনকে জয় করেছেন। ছন্দের এমন সজাগ-লালন, 'সঙ্কেত-তিযক চিত্রিত ভাষণ' এবং আঙ্গিক-প্রকরণের এমন মনোরম-ঐন্দ্রজালিক বৈচিত্র্য ইতিপূর্বে বাঙ্গালী দেখে নি। ছন্দের এই ইন্দ্রজাল দিয়ে তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়-ভাণ্ডার একবারে লুট করে নিয়েছেন। বাংলার অসীম কাব্য-সমুদ্রের সুনীল জলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা যেন ছন্দের একটি লাজনম্র ভীরু কোরক—এর পূজা বাঙ্গালী চিরদিনই করবে। সত্যেন্দ্র-কবি-মানসের সমুদয় বৈশিষ্ট্য এই ছন্দ-মাধুর্যের মধ্যেই সীমিত—অন্য কিছুতে নয়। ছন্দের মূর্চ্ছনায় তিনি আমাদের বিভোর করেছেন—গহন-চারী ভাব-কল্পনার দ্যুতি দিয়ে তিনি আমাদের মনোলোক জয় করতে পারেন নি।

॥ বিহারীলাল ॥

॥ এক ॥

॥ বাংলা কাব্যের সুর পরিবর্তন ॥

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন যেন প্রথম বন্ধন-মুক্ত প্রমিথেটস। মধ্যযুগীয় বৈচিত্র্যহীন পয়ার-লাচাড়ী ছন্দে গ্রথিত বাংলা গাঁথা-সাহিত্যের কোমল-বক্ষ বিদ্রোহী বিশ্বমিত্রের আবির্ভাবে যেন দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। কাব্য-রমণীর অঙ্গ হতে খসে গেল পয়ারের শিথিল-বিন্যাস, লাচাড়ীর বৈচিত্র্যহীনতা। বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের মানস-লঙ্কায় যে গর্জনোন্মুখ জোয়ার-কল্লোল জেগে উঠেছিল তারই দুর্নিবার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোমল কাব্য-রমণীকে হতে হলো বীরাঙ্গনা, প্রমীলার অপরাজেয় প্রমত্ততা নিয়ে তাকে অগ্রসর হ'তে হলো প্রমোদ কানন হ'তে স্বর্ণালঙ্কার পথে। শ্যামের বাঁশী তলোয়ারে পরিণত হলো। গাঁথা-কাব্যের বুকে সঞ্চারিত হলো ক্লাসিক্যাল এপিক কাব্যের নর্তনশীল বৈভব।

ক্লাসিক্যাল শিল্পকলার ন্যায় ক্লাসিক্যাল সাহিত্যও ভাস্কর্য সুঠাম। ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনিতে দৃঢ়-নিবদ্ধ। কোথাও কোন দুর্বল অংশের স্থান নেই—সর্বত্রই একটি সুকঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বর্তমান তীক্ষ্ণাগ্র-বাণী-বিন্যাসে তার নিটোল অঙ্গ দীপ্তোজ্জ্বল। এপিক কাব্যের প্রাণ-সম্পদ হলো বর্ণনা ভংগীর স্পষ্টতা (bold ness), চরিত্রবলীর সুস্পষ্ট রূপায়ণ, দ্রুত নাটকীয়তা (dramatic elements), ভাবরাশির গাম্ভীর্যময় সমুন্নতি (sublimity) এবং বস্তু ধর্মের প্রাচুয (objeetivity)। মহাকাব্যের যে লক্ষণগুলির সাথে আমরা পরিচিত এগুলি একান্ত ভাবে বহিরাগত কবি কল্পনার নয়। বস্তুতঃ পক্ষে মহাকাব্যে কল্পনা ও ব্যক্তিহৃদয়-প্রকাশের অবকাশ খুব কমই আছে। আত্ম-তন্ময়তা নয়—বস্তু বিভোরতাই হলো মহাকাব্যের প্রাণৈশ্বর্য। এর চরিত্রাবলী, এমন কী ভাব রাশিও বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এর সকল সৌন্দর্য-সুষমা সুস্পষ্ট রেখাঙ্কনের মাঝে বিবৃত হয়েছে। সুস্পষ্টতার প্রদীপ্ত চরণ-তলে অস্পষ্টতা এবং কল্পনার সকল কিছুই নতি স্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে লিরিক-কাব্য অস্পষ্ট। এখানে কবির কল্পনাই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রোম্যান্টিকতার স্বর্ণ-গোধূলিতে

লিরিক কাব্যের সকল কিছুই অস্পষ্ট মনোহর হয়ে ওঠে। এ কাব্যে কবির ব্যক্তি-স্বরূপ শতবর্ণরাগে বিকশিত হয়ে ওঠে। আত্মলীনতা এবং আত্মতন্ময়তাই লিরিক কাব্যের সূতিকাগার।

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে ধারার সূত্রপাত করলেন, সেই দৃঢ়-কঠিন ধারার মাঝে শিশির-কোমল লিরিকের স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ মধুসূদন-প্রতিষ্ঠিত সেই ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এঁদের কাব্যের কোথাও যে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার কথা লিপিবদ্ধ হয় নি—এমন কথা বলা চলে না। এঁদের কাব্যের নায়কগণ প্রচণ্ড বিক্রমে আকাশ-পাতাল বিমোথিত করে সর্বদাই গদা ঘুরিয়ে ফেরেন নি—সেই রণোন্মত্ততা এবং বিপুল কর্মোন্মাদনার ফাঁকে ফাঁকে আপন ব্যক্তি-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খার কথাও প্রকাশ করেছেন। সেখানে কবি-চিত্তের স্বরূপ অনেকখানি ধরা পড়েছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহু স্থলেই লিরিকের সুকোমল সুরে এপিকের বস্তু-কেন্দ্রিকতা (objectivity) খণ্ডিত। তথাপি সামগ্রিক ভাবে এই যুগের কাব্য এপিকধর্মী। বহির্জগৎ এবং বহির্জীবনকে নিয়েই এই যুগের কাব্য স্পন্দমান। বহির্বিশ্বের ঘটনা-সঙ্কুল আবর্তের দিকেই এই যুগের কবিদের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে মহাকাব্যের কর্মোন্মাদনার পাশে নিভৃত মনের গান বলা হয় কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একমাত্র 'আত্মবিলাপ' জাতীয় কয়েকটি কবিতা ছাড়া আর কোথাও ব্যক্তি-হৃদয়ের আত্মমুখীনতা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়নি। যথার্থ লিরিক কবিতার উচ্ছ্বাস একটি কবিতাতেও আছে কিনা সন্দেহ। মুকুন্দরাম প্রমুখ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কবিদের রচনায় ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেদনা-ব্যথার প্রকাশ আছে কিন্তু গীতি কবিতার সায়াহ্ন-কোমল সুরটি সেখানে নেই। সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদাবলীই আমাদের কাব্য ধারায় আদর্শ গীতি কবিতা বলে সমাদৃত। কিন্তু সেখানেও কবির ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার সুষ্ঠু প্রকাশ নেই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অন্তরালে কবির গহন মনের বাসনা অনেকখানি পঙ্গু ও মূক হয়ে পড়েছে—স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নেই। এখানে কবির ধ্যান-ধারণা অনেকখানি রাধা-কৃষ্ণেন্দ্রিয়, আত্মেন্দ্রিয় নয়। বৈষ্ণবপদাবলীর একপ্রান্তে আছে রাধা-কৃষ্ণ অপর কোটিতে আছে কবি-মানস। এই দুই কোটির ছন্দিত-আন্দোলনে বৈষ্ণব পদাবলী সুন্দর—তবুও গীতি কবিতার অখণ্ড সুর-প্রবাহ এ'তে নেই। কবি-ব্যক্তিত্ব এখানে খণ্ডিত। বস্তুতঃ আধুনিক কাব্যের পূর্ব অধ্যায়ে ব্যক্তি-জীবনের আশা-আকাঙ্খার সুরটি

বিরলশ্রুত। এপিকের সাথে লিরিকের সংমিশ্রণ ঘটলেও কিংবা পদাবলী সাহিত্যে লিরিকের আমেজ এলেও কোথাও লিরিক কবিতার সুরটি একান্তভাবে ঝংকৃত হয়ে ওঠেনি। একান্তভাবে লিরিক কবিতার সুরটি প্রথমে শুনতে পেলাম বিহারীলালের মধ্যে। বিহারীলালই সর্বপ্রথম দৃষ্টিকে বহির্বিশ্বের কর্ম-কোলাহল হতে সরিয়ে এনে নিবদ্ধ করেছেন অন্তর্লোকে। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখীন। আপন মনের ধ্যান-চিন্তা, মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিই বিহারীলালের কাব্যে রোমাঞ্চ-রঙীন হয়ে উঠেছে। কাব্যের উপাদান-সংগ্রহের জন্যে এই যুগের এপিক-কবিগণ যখন উন্মত্তবেগে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত্ত, জল-স্থল একাকার করে ফেলছেন তখন বিহারীলাল কল্পনা-পক্ষীরাজের বহির্মুখী বেগকে দমন করে ছুটিয়ে দিয়েছেন অন্তর্লোকের রহস্যঘন মহাসাগরের তীরে তীরে। সেখান হ'তেই তিনি লাভ করেছেন তাঁর কাব্য-প্রেরণা, সৃষ্টির আবেগ। তাঁর কাব্য প্রচণ্ড-স্রোতা পদ্মা নয়—অন্তরবাহী ফল্গু ধারার সুকোমল অভিব্যক্তি। আত্মমুগ্ধ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি, আত্মনিষ্ঠ রহস্যময় প্রেম-চেতনা তাঁর কাব্যকে অনন্তসুন্দর করে তুলেছে। এপিক-কবিগণের কাব্য-দিগন্ত স্পষ্ট কিন্তু বিহারীলালের কাব্য-দিগন্ত রহস্য-ঝিলিমিলিতে দূর-প্রসারী —অস্পষ্ট। তাঁর কাব্যের সকল সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে অজানা রহস্য শত বরণে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনের হৃদয়-বেদনায়, প্রকৃতি-প্রীতির অভিনব আন্দোলনে বিহারীলালের কবিতা সহজ-বলিষ্ঠ এবং অবঙ্কিত। এই ব্যক্তি হৃদয়ের স্পন্দন এবং নিসর্গপ্রীতি রোম্যান্টিকতার সুর মূর্চ্ছনায় একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। সুতরাং বিহারীলালই বাংলা কাব্যের সুবঙ্কিম ধারায় সর্বপ্রথম লিরিক কবি। সর্বপ্রথম তাঁর কাব্যের মধ্যেই লিরিক কবিতার সুর-বৈচিত্র্য কাকলী-মুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় এপিক কাব্যানুগ বিপুল ঐশ্বর্য নেই—আছে আত্মবিভোরতার রূপমুগ্ধ মন, আছে সরল মনোহর আত্মলীন অভিব্যক্তি। মঙ্গল কাব্যের গাথা-বৈচিত্র্য নয়, এপিকের ছন্দ-হিল্লোল নয়, পদাবলীর কৃষ্ণ-হারা ব্যাকুলতাও নয়—ব্যক্তিহৃদয়ের বিপুল বাসনা-কামনার বিচিত্রানুভূতির রূপাল্পনায় বিহারীলালের কাব্য চির মধুর। সুতরাং সৌন্দর্য-পিয়াসী বিহারীলালের হাতেই আধুনিক লিরিক কবিতার যথার্থ প্রবর্তনা। বাংলা কাব্যপ্রবাহ এখান হতেই ভিন্নমুখী হয়ে নব সৃষ্টির উন্মাদনায় স্বতন্ত্র খাতে বইতে শুরু করেছে। বিদ্রোহী মধুসূদনের হাতে গাথা কাব্যের যে ধারা মহাকাব্যের ঊর্মিমুখর মহাসাগরের বুকে দিক হারিয়েছিল বিহারীলালের হাতে সেই ধারাই গীতি কবিতার বিপুল-বিস্তারী রহস্যময় রাজ্যে দিক হারালো।

॥ দুই ॥

॥ সুর পরিবর্তনের স্বরূপ : সারদামঙ্গল ॥

নিষ্ঠাবান সমালোচক কালিদাস রায় কবির প্রতি তাঁর মুগ্ধ মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন: "উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যালোকে বিহারীলাল একেবারে দল ছাড়া, Like a star that dwelt apart. স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উন্নতশীর্ষ কবি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।"

বিহারীলাল সম্পর্কে এ কথা পূর্ণ সত্য। তাঁর কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম সায়াহ্ন-গোধূলির এক স্বপ্নাচ্ছন্ন আমেজ পেলাম। যে স্বপ্নাচ্ছন্ন ধ্যান-দৃষ্টিতে কবি নিখিল বিশ্বের সর্বত্রই অবলোকন করেছেন এক বিমোহন মূর্তি। সজল মেঘমালার বুকে বুকে, বিকশিত পুষ্পের দল-পাঁপড়িতে, পল্লবঘন কানন শ্রেণীতে, নীড়-মুখী বিহঙ্গের কাকলিতে, বিশ্বনিখিলের অনুপরমাণুর সর্বত্রই কবি অনুভব করেছেন তাঁর মানস-প্রিয়ার নীরব পদসঞ্চার। বলাবাহুল্য এই মানস-প্রিয়াই কবির বহু-খ্যাত 'সারদা'। এই সারদাকে কোন নির্দিষ্ট রূপ-গণ্ডীর মধ্যে ধরা যায় না, স্পষ্ট রেখাঙ্কনের মধ্যে এই সারদাকে আবদ্ধ করা অসাধ্য। কবি শেলী যেমন বিশ্বের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করেছিলেন সৌন্দর্যের শাশ্বত বেগ—Spirit of Beauty—তেমনি কবির সারদাও নিখিল-ব্যাপ্ত। এই মানস-প্রিয়া সীমার মাঝে থেকেই অসীমকে প্রকাশ করে অথচ স্বয়ং সীমাতীত। এই সারদা অতি নিকট হ'তে দূর দূরান্ত দেশের, অসীমলোকের ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, আভাসে ইংগীতে কবির নিকট চির অজ্ঞাত অসীম-রহস্যলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, অথচ কবির কাছে তিনি পরম রহস্যময়ী। দূর দূরান্ত হ'তে কবি একটুখানি রূপ-স্বপ্নের আভাস পান মাত্র—তাঁর নিবিড় সাহচর্যের ও সঙ্গ-লাভের জন্য কবির দেহমন লালসা-মদির হয়ে ওঠে অথচ তাকে একান্ত করে পাওয়া যায় না। এই মানস প্রিয়া সুরধনী-তীরে বাস করে, কমলে-কামিনীর মত অসীম রূপ-সম্ভার ও পরম-লাবণ্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই মরীচিকাময়ী। এই অসীম রহস্য-লীলাশ্রয়ী দিগন্তের কোল হতে বারে বারে ইসারা ইংগিতে কবিকে পাগল করে দিয়েছে—তাই তো কবি আজীবন-আচরণের সকল সুখ-দুখের মাঝে, সকল আশা-নিরাশার মাঝে সেই রহস্যময়ীর সন্ধানেই ফিরেছেন, জীবনের সকল ছন্দে গানে তাকেই পূজা করেছেন।

কবির অতন্দ্র-সাধনা বার বার আশা-নিরাশার মাঝে দোলায়িত হয়েছে—রহস্যময়ীর ইংগিতধর্মী রূপাল্পনায় কবি-চিত্ত বার বার প্রশ্ন-চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন :

জ্যোতির প্রবাহ মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে,
কে তুমি লাবণ্য লতা মূর্ত্তি মাধুরিমা !

নন্দন-নিকুঞ্জের মিলন-লীলায় এই জ্যোতির্ময়ী মেয়ে বার বার কবিকে আকর্ষণ করেছে, বার বার চিত্ত-চাতককে পিপাসা-কাতর করেছে কিন্তু তবুও কবি তাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করেছেন :—

তবে কি সকলই ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা-লতার ?

এই চেনা-অচেনা, এই পাওয়া-না-পাওয়ার আল্পনায় গড়া মায়া-মৃগীর মরীচিকা-ময়ী স্বরূপটি "সারদামঙ্গল"-এ অভিনব চিত্র-গরিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথও তাই সারদামঙ্গল পাঠ করে বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন : "সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য-স্বর্গ হইতেও একটি অপূর্ব পূরবী রাগিনী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" 'সারদামঙ্গল' কবির মানস-প্রিয়া সারদারই রূপ-চিত্র। এই মানস-প্রিয়ার স্বরূপটি কবি নিজেও ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে কোন 'সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী'র জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—"ধেয়াই কাঁহারে, দেবী ! নিজে আমি জানিনে।"

এই না জানার বেদনায় কবি-চিত্ত বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে। হৃদয়-বীণায় বিরামহীন ললিত-রাগিণী বেজে চলেছে অথচ তার স্বরূপ জানা যায় না ; সুর শোনা যায়, মন-মোহিত হয় অথচ তাকে পাওয়া যায় না—এখানে কবি-চিত্তে হয়েছে নীরব দাহন-জ্বালার বেদনা-ম্লান ছায়াপাত। বিহারীলালের কাব্যে যে একটি অপূর্ব রূপ-তন্ময় Romantic melancholy-র সুর ধ্বনিত হয়েছে—

তারও উৎসমূল এখানে। এ প্রসঙ্গে বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বহুখ্যাত উক্তি স্মরণীয়: "যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয়, এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

কবির সমগ্র জীবন-ব্যাপী যেন একটি করুণ নিঃসঙ্গতার বেদনা রয়ে রয়ে পরম আবেগে গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। "বঙ্গসুন্দরী"র উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি-পরিবেশে মিলন-আগ্রহে যে বেদনার জন্ম, "সারদামঙ্গলে" মানস-সুন্দরীকে না পাওয়ার অন্তর্দাহে তারই পূর্ণ পরিণতি। এখানে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে অধিকাংশ রোম্যান্টিক কবিগণের মনে এই যে বেদনা-দাহ এ বেদনা-দাহের কারণ কী? 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। রোম্যান্টিক কবিগনের অন্তর্লোকে বাস করে তাঁদের মানস-সুন্দরী, কবি-প্রিয়া—সে প্রিয়া কল্পনায় গড়া, চির যৌবনা উর্বশী। কবিরা বাস্তবের বুকে তাঁদের সেই মানস-প্রিয়ার অন্বেষণ করেন। কিন্তু 'ইতর' বাস্তবের বুকে সেই লাবণ্য-দীপ্তা মানস প্রতিমার সন্ধান তো পাওয়া যায় না। কল্পনার স্বপ্ন-মন্থর সোনালী চিত্র অপেক্ষা বাস্তব চিরদিনই কুৎসিত, ক্লিন্ন। বিহারীলাল তাঁর কল্পলোকের কোমল-প্রিয়া সারদার অন্বেষণ করেছেন নিখিলের প্রত্যেক বস্তুতে। প্রত্যেক প্রাণীর মাঝেই পেতে চেয়েছেন সারদার পূর্ণরূপ। কিন্তু 'বিশ্বের কবিতা'-কে 'গৃহের বনিতা'-র মধ্যে পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। হয়তো সেই মানস-প্রিয়াব একটু আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু পূর্ণভাবে তো পাওয়া যায় না। বিহারীলাল তা পানও নি—এখানে কবিহৃদয় বেদনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। সারদামঙ্গলের বহু কবিতায় গীতোচ্ছ্বাসের অন্তরাল হতে সেই বেদনা-হত ম্লান সুরটি গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে:

চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।

অথবা:

পূর্ণিমা প্রমোদ আলো;
নয়নে লেগেছে ভালো;
মাঝেতে উথলে নদী দু'পারে দুজন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দুপারে দুজন!

দু'পারে দু'জন অথচ মাঝে অথৈ জলের গর্জন-মুখর প্রবাহ। সম্ভবতঃ এখানেই রোম্যান্টিক মেলানকলি সুর-মূর্চ্ছনার পূর্ণ পরিণতি।

উপরের আলোচনা হ'তে আমরা কবির রোম্যান্টিক ভাব-ধারার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু এই রোম্যান্টিকতার সুর শেষ পর্যন্ত রহস্যময় রোম্যান্টিকতার দিগন্ত অতিক্রম করে মিষ্টিসিজ্‌ম্‌-এর বিপুল সাম্রাজ্যে পদার্পণ করেছে। কবির চিন্তাধারা ও ভাব-প্রবাহ—কেমন করে ক্রম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে রোম্যান্টিকতা হতে মিষ্টিসিজ্‌ম্‌-এ প্রবেশলাভ করলো তা আলোচনা করার পূর্বে আমারা রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌ এবং মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ এর মধ্যকার ভেদটি বুঝে নিতে চেষ্টা করবো।

কাব্যে রোম্যান্টিকধর্ম এবং মিষ্টিকধর্ম পরস্পর বিরোধী নয়, উভয়ের মধ্যকার ভেদটা প্রকার গতও নয়—একান্ত ভাবেই স্তরগত। মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ হলো রোম্যান্টিসিজম্‌-এরই ঘণীভূত রূপ মাত্র। যে মানসিক ধ্যান-গভীরতায় কবি রোম্যান্টিক হয়ে ওঠেন—সেই ধ্যান-সমাহিত মন আর একটু গভীরে প্রবেশ করলেই মিষ্টিক হয়ে ওঠে। রোম্যান্টিকতার অবস্থায় বিশ্বের সকল কিছুই রহস্যময়, চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে একটা প্রবল বিরোধ সেখানে চিরদিনই বর্তমান। রোম্যান্টিক অবস্থায় মনে হয় অস্পষ্ট কুহেলীর অন্তরালে কী যেন গোপন রয়ে গেল, কল্পলোকের ধ্যান-স্বপ্নকে যেন পাওয়া গেল না, সর্বদাই নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক সুগভীর বেদনা চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অসীম রহস্য-রাজ্যে মানস-প্রিয়াকে অন্বেষণের মধ্যেই যে মন সীমিত তা' একান্ত ভাবেই রোম্যান্টিক। কিন্তু মিষ্টিক কবি-মানস এই অন্বেষণের মাঝে, এই না পাওয়ার বেদনার মধ্যেই থামে না—"সে আরও অগ্রসর হইয়া এই কুহেলীর যবনিকা ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের আলোতেই তাহার ভিতরে একটা অদ্বয় সত্যকে লাভ করিতে চায়। যখন সকল রহস্যের ভিতর একটা অদ্বয় সত্য লাভ হইল, সংশয়ের দোদুল্যমান চিত্ত যখন একটা দৃঢ় বিশ্বাসের অবলম্বনে নিশ্চল হইল, তখন মানুষ হয় মিষ্টিক। মিষ্টিসিজ্‌ম্‌-এর প্রধান লক্ষণ এই, সে মানুষের মনকে শুধু অপরিচিত ঘাট হইতে ঘাটে ভাসাইয়া চলে না, সে হৃদয়ে আনে একটা গভীর বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস তাহাকে চালাইয়া লইয়া যায় বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি অদ্বয় সত্যের দিকে।" রোম্যান্টিক্‌ মন কেবল রহস্যের মাঝেই দিক হারায়—কিন্তু মিষ্টিক্‌ মন সেই রহস্যের বক্ষ বিদীর্ণ করে সত্যকে লাভ করে। রোম্যান্টিক অবস্থায় চিত্তে জাগে না পাওয়ার বেদনা, আর মিষ্টিক অবস্থায় নিখিল মনপ্রাণ পাওয়ার আনন্দে পরম প্রশান্ত রূপ ধারণ করে।

আমরা পূর্বের আলোচনা হ'তে দেখেছি মানস-প্রিয়া সারদাকে না পাওয়ার জন্যে কবি-চিত্তে নেমেছে বিষাদের সুর মূর্চ্ছনা—এই অবস্থায় বিহারীলালের

কবিমানস একান্ত ভাবেই রোম্যাণ্টিক। কিন্তু এই অবস্থা অতিক্রম করে চিন্তার গহন-গভীরে নেমে অসীম রহস্যজাল দীর্ণ করে কবি লাভ করেছেন এক অদ্বয় সত্যকে—এই অদ্বয় সত্যকে লাভ করার অঙ্গীকার আছে সারদামঙ্গলের শেষের দিকে এবং বিশেষ করে সাধের আসনের প্রথম অধ্যায়ে। এখানে বিহারীলালের কবি মানস একান্ত ভাবেই মিষ্টিক হয়ে উঠেছে। পূর্বে কবির কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হয়েছে মানস-প্রিয়াকে না পাওয়ার বেদনা—এখন তিনিই বলেন ঃ

কবিরা দেখেছে তাঁকে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

অন্যত্র ঃ

কহে সে রূপের কথা,
বসন্তের তরুলতা ;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন ফুল ;
শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলঢুল্।

রোম্যাণ্টিক কবি-কল্পনা এখানে স্পষ্ট মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এ পরিণত হয়েছে। মানস-প্রিয়ার সন্ধান যে কবি প্রকৃতির মধ্যে পেয়েছেন, কবির নৈরাশ্য চেতনার মধ্যে যে একটি সুগভীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এসেছে তারই অভিনব স্বীকৃতি দেখি 'সাধের আসনে'র প্রথম অধ্যায়ের একটি কবিতায় ঃ

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে
কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান-গীতি বাজিতেছে সমস্বরে।
চাহি এ সৌন্দর্য পানে
কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে।

এখানে কবি তাঁর চির আরাধ্য সারদাকে পেয়েছেন। এ সারদা কেবল সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম এবং জ্ঞানেরই প্রতিচ্ছবি নয়—এ "সারদা বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিতা মূল মায়াশক্তি।" এ সারদাই অনাদি আদিম শক্তিরূপিণী—সেই শক্তির বলেই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরম রহস্যময়।

॥ তিন ॥

॥ সৌন্দর্য চেতনা : সাধের আসন ॥

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করে নেওয়া ভাল—বাংলা কাব্যের এপিক ধারাকে গীতি কবিতার সীমাহীন সৌন্দর্য-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করালেও যে অসীম-ভেদী কল্পনা-ঐশ্বর্যে (Cosmic Imagination) বিশ্বের অন্তর্নিহিত উৎস-কেন্দ্র হ'তে সৌন্দর্যরাশি ছিনিয়ে আনা যায় তা' বিহারীলালের ছিল না। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বিহরীলালের সৌন্দর্য-চেতনা খণ্ডিত এবং অপূর্ণ।

বিহারীলালের সৌন্দর্যচেতনার ক্রমপরিণতির ধারা আলোচনা করলে আমরা তিনটি স্তর পাই—"বঙ্গসুন্দরী"-তে সৌন্দর্যানুভূতির প্রাথমিক বিকাশ, "সারদা মঙ্গল" এবং "সাধের-আসনে"র প্রথম সর্গে সেই সৌন্দর্যানুভূতির পরিণতি এবং "সাধের আসনে"র দ্বিতীয় সর্গ হতে শেষ সর্গগুলিতে সেই সৌন্দর্যানুভূতি ক্রম-জটিল হয়ে এলায়িত এবং খণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তবুও মোটামুটিভাবে "সাধের আসন"কে সারদামঙ্গলের পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে।

সাধের-আসনের প্রেম-চেতনা এবং সৌন্দর্যানুভূতি অনেকটা সারদামঙ্গলেরই দোসর। বিশেষ করে এই কাব্যের প্রথম সর্গটিকে যেন সমগ্র সারদামঙ্গলের সুরটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এখানে অতীন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতির দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। তবুও এই সৌন্দর্যানুভূতি লাবণ্য-সুষমায় নম্র-নত এবং চির-জ্যোতিষ্মান। একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতি অপরদিকে অতীন্দ্রিয় রূপ-সম্ভার—এই দুই বিপরীত কোটির দ্বন্দ্বে বিহারীলালের সৌন্দর্য-চেতনা বিকশিত হয়ে উঠেছে। যে 'সারদা'কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তিনি বলেছেন :

> কে তুমি জননী, পিতা,
> নন্দিনী, রমণী, মিতা
> প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস ?

অন্যদিকে সেই সারদাকে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-সম্ভারে বিভূষিতা করে তিনি লিখেছেন :

> কে তুমি মা জল স্থল
> মহান অনিলানল
> নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ।

বিশ্ব এবং কান্তি এই দুয়ের সমন্বয়েই সৌন্দর্য সার্থক। একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য অন্যদিকে অতীন্দ্রিয় রূপ-লাবণ্য, একদিকে 'কংক্রিট' অন্যদিকে 'অ্যাবসট্রাক্ট'—এই দু'য়ের সমন্বয়-সাধনে সৌন্দর্য পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ পক্ষে বিহারীলাল পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিক-চেতনার সাথে প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তার (মায়া) সমন্বয়-সাধন করতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি অসীম-ভেদী কবি-কল্পনা বিহারীলালের ছিল না—সুতরাং অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্যচেতনার উৎস-মূল আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সাধের আসনের সমগ্র অংশটির সাথে প্রথম অংশের যেন কোথায় একটা বিরোধ আছে। দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ 'গোধূলি ও নিশীথে' অংশটিতে আমরা দেখেছি প্রকৃতির প্রাধান্য। এখানে অতীন্দ্রিয়চেতনা অনেকাংশে অবলুপ্ত। মোটামুটিভাবে এ অংশে প্রাচ্য-আধ্যাত্মিকতা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তৃতীয় সর্গের প্রথমাংশে আছে প্রকৃতি-বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশের 'যোগেন্দ্রবালা' বাস্তব-কল্পনার সংমিশ্রণে গড়া নারী-মূর্তি, অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। চতুর্থ সর্গের মধ্যে একান্তভাবে মানবীয় প্রেমের কথা বিঘোষিত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় রহস্য নয়—মানবীয় প্রেমই এখানে উচ্চকণ্ঠ। মর্তের মৃত্তিকার অমোঘ আকর্ষণে কবির রোম্যাণ্টিক নভঃস্পর্শী মন ধূলি-মলিন হয়ে উঠেছে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই—এখানে কবি মূল প্রসঙ্গ অতিক্রম করে পদাবলী সাহিত্যের তত্ত্বকথায় প্রবেশ করেছেন। পঞ্চম সর্গে অমরাবতীর পথ-পরিক্রমায় পাই কবির পৌরাণিক উপলব্ধির কথা। ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে ভক্তিভাব এবং প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা কবি চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। এখানেও সৌন্দর্যানুভূতির বিশুদ্ধ রূপ আবিল হয়ে উঠেছে। নবম, দশম ও উপসংহার অংশে আমরা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনার আর এক বিপর্যয় লক্ষ্য করি। এখানে আর সারদা কবির মানস-প্রিয়া নয়—আসন দাত্রী সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনীই সারদার আসন গ্রহণ করেছেন। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সাধের আসনে কবির সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেম-চেতনা বিশুদ্ধ নয়—পাঁচমিশেলী চিন্তা-ভাবনায় এ সৌন্দর্য-বোধ খণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ধ্যান-কল্পনার বিচ্ছিন্নতার জন্য অনেকাংশ অসংলগ্নও বটে। সাধের আসনের প্রথম সর্গটির সাথেই যা সারদামঙ্গলের যোগ—অন্য অংশগুলি হ'তে কবি যে কাকে ধ্যান করেন বা তাঁর সৌন্দর্যানুভূতির স্বরূপ কী তা' বোঝা যায় না। বস্তুতঃ পক্ষে এখানে যে কাব্যরূপ পাই তা'তে সারদা মানস-প্রিয়া, বিবাহিতা পত্নী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, আসনদাত্রী

দেবী সব কিছু। সকলে মিলে সারদা হওয়ার দাবী করায় শেষ পর্যন্ত, কেউই সারদা হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। সাধের আসনে কবির সৌন্দর্য-চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ে এখানেই সব থেকে বড় বাধা। বস্তুতঃ পক্ষে এ বাধা বিহারীলালের একার নয়—ঐ যুগের কবি-মানসের। সুরেন মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি সকলের মাঝেই রোম্যান্টিক ভাবধারার আবেগ লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সার্থক হ'তে পারেননি কেউ। এঁরা সকলেই অর্ধ ক্লাসিক এবং ছদ্ম রোম্যান্টিক। একদিকে রোম্যান্টিকতার রহস্যলোকে ওড়ার দুর্নিবার আবেগ অন্যদিকে মৃত্তিকার অমোঘ আকর্ষণ—এই দুই বিপরীত কোটির দ্বন্দ্বে এঁরা না ক্লাসিক না রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছেন। অবশ্য বিহারীলালের মধ্যে রোম্যান্টিকতার স্বর্ণগোধূলিতে পক্ষ-বিস্তার করার স্পৃহাই অধিক—তবুও মাটির মমতাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি এবং এই জন্যেই তাঁর রোম্যান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি এবং প্রেম-চেতনা দ্বিধাগ্রস্থ এবং দুর্বল। 'বিহারীলাল রোমাঞ্চ কুহকিনীর অস্পষ্ট আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন মাত্র। হৃদয়ে ব্যাকুলতা জেগেছে চোখে তৃষ্ণা জেগেছে কিন্তু গৃহ, গৃহিণী, পারিবারিক পরিমিতি এবং ধর্মীয় সংস্কার এক বিরাট সীমার গণ্ডী এঁকে দিয়েছে। তাই কবি এই পরিমিতিকে কাটাতে পারেন নি। এই পরিমিতিকে অতিক্রম করে যেদিন বাঙালীর গৃহাঙ্গন দূর মেঘলোকের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো—সেই দিনেই রোম্যান্টিকতার নব-যৌবন-সঞ্চার। এর জন্যে যে সোনার কাঠির প্রয়োজন তা' ছিল কবির শ্রেষ্ঠ শিষ্য, বাংলা সাহিত্যের কল্প-স্বপ্নের সেই প্রথম রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে।'

॥ চার ॥

॥ বিহারীলাল যত বড় কবি তত বড় শিল্পী নন ॥

'নীরব কবিত্বে'র যদি কোন পৃথক মূল্য থাকে তা' হলে বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথের সাথে এক করে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে পদচারণা করেছেন ; (অবশ্য স্বকীয় সৃষ্টিই প্রধান) কিন্তু বিহারীলাল স্ব-নির্মিত পথেই করেছেন যুগাভিসার। স্থানে স্থানে তাঁর রোম্যান্টিক ভাব-কল্পনা সার্থকতার উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছে। যে মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর মহান সংগীত-সুষমায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল বিশ্বের হৃদয় লুট করে নিয়েছেন

প্রকৃত পক্ষে বিহারীলালের হাতেই তার প্রস্তাবনা। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বিহারীলালের 'সারদা'রই পরিমার্জিত রূপান্তর মাত্র। 'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন:

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী"

বহুপূর্বেই আমরা বিহারীলালের কাব্যে তার সন্ধান পেয়েছি:

অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!

কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাষিত?

বিহারীলাল যাকে বলেছেন:

কি যেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে…
কে যেন কতই রূপে একা লীলা খেলা করে।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই একই লক্ষ্য শিল্প-সুষমায় দোসরহীন অনন্য সুন্দর হয়ে উঠেছে:

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিণী!
একটি স্বপ্নমুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী'—বলে কবি যার রূপ-তন্ময়-ধ্যান করেছেন এবং যে সুন্দরী আজীবন কবির কবিতায় নানাভাবে, বিচিত্র রূপ-সম্ভারে বিকশিত হয়ে উঠেছে—বস্তুতপক্ষে 'সারদার' সাথে তার কোনই পার্থক্য নেই। (শেলীর কবিতায় যিনি 'এপিসাইকিডিয়ান', রবীন্দ্র-কাব্যে যিনি 'মানস-সুন্দরী', বিহারীলালের কাব্যে তিনিই 'সারদা'। তবে প্রকাশের দৈন্যে এই সারদা নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য-নিকেতনের লীলা-রহস্যময়ী হয়ে উঠ্‌তে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রিয়া এক দিকে 'গৃহের বণিতা' আবার অন্যদিকে 'বিশ্বের কবিতা' কিন্তু বিহারীলালের মানস-সুন্দরী পূর্ণরূপে 'গৃহের বণিতা'ই—আংশিকরূপে 'বিশ্বের কবিতা' মাত্র। অবশ্য এই মানস-প্রিয়াই যে 'কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাষিত' বিহারীলালের কবিতা-কুঞ্জের বহুস্থানেই আমরা

তার আভাস পেয়েছি—তথাপি এ সুন্দরী শেষ পর্যন্ত খণ্ডিতা হয়ে বিশ্বের বিপুল পথ হতে সরে এসে গৃহের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই চলাফেরা করেছে। বিহারীলালের কাব্যগুলি গভীর ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় অসীম-ভেদী কল্পনার সকল আয়োজনই তাঁর মধ্যে বীজাকারে নিহিত ছিল। কিন্তু সে গুলি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি।)তাঁর কাব্য যেন ডিমের মধ্য হ'তে সদ্যজাত চোখ-না-ফোটা শাবক—প্রাণ আছে, পাখা আছে কিন্তু তাদের যথাযথ কার্যক্ষমতা নেই। এই শাবকই (বিপুল পক্ষ বিস্তার করে দূর নভঃলোকের সৌন্দর্য-পথে অভিনব স্পন্দন জাগিয়ে উড়ে গেছে রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে। প্রকৃতি রমণীকে বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রেম নিবেদন করেছেন—কিন্তু এই প্রেম নিবেদনের স্তরগত পার্থক্য আকাশ পাতাল হয়ে উঠেছে। বিহারীলালের প্রেম নিবেদনে একটি মৌখিক স্বীকৃতি আছে মাত্র মরমিয়া প্রেমিকের আত্মহারা ভাব নেই ঃ)

প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে।

এই প্রেম-নিবেদেনর অতল-স্পর্শী চিত্র পাই রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতায়। নিবেদন প্রারম্ভিক লগ্নেই সমাপ্ত হয়েছে—এখন সেই প্রেম-পরিণয়ের সম্ভোগ-চিত্র ঃ

······হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া,বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে।

এতো কেবল মৌখিক স্বীকৃতি নয়। বিরহী যক্ষ যেন যুগ যুগ তপস্যান্তে আজ পেয়েছে তার প্রিয়ার, নিবিড় সাহচর্য। যেন লক্ষ কোটি যুগের ব্যাকুল প্রতীক্ষিত তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় কোটি কোটি মুখের পিপাসা নিয়ে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য-নির্যাসকে দুর্নিবার আগ্রহে পানোন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এ চিত্র বিহারীলালে কোথায়?

বিহারীলালের কবি-কল্পনায় শিখর-স্পর্শী চিন্তা আছে, তাঁর কবি মানস অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-চেতনায় ভাস্বর কিন্তু কবি-মানস আর কাব্য এক নয়। প্রকাশই কাব্য, ধ্যান-চিন্তা কাব্য নয়। অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ যখন শিল্প-কৌশলের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অভিনব রূপ-সম্ভারে প্রকাশিত

হয় তখনই কাব্য-রসিক-চিত্ত বিমুগ্ধ। বিহারীলালের কল্পনা ছিল অকৃত্রিম—কিন্তু প্রকাশ ছিল পঙ্গু। যে স্বর্ণ কাঠির ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শে কল্পনা কাব্য হয়ে ওঠে বিহারীলাল ছিলেন সেই স্বর্ণকাঠির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত। তাঁর সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। তিনি যে পরিমাণে চিন্তা-নায়ক সে পরিমাণে রূপ-শিল্পী নন। তিনি মূলতঃ স্বভাব কবি, তাই সহজাত আবেগেই তাঁর কাব্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। রূপায়ণের জন্য যে রূপকল্পনার প্রয়োজন তা তাঁর কাব্যে নেই। বিশিষ্ট সমলোচকের ভাষায় তাই বলা যায় "সার্থক শিল্প রচনার ক্ষেত্রে যে পরিমার্জনা ও সর্তকতার প্রয়োজন তার চিহ্ন তাঁর কবিতায় নেই। অনেক সময় কলাকৌশলহীন ভাষণই তাঁর লেখনীমুখে স্বতোৎসারিত হয়েছে। এ যেন এক বিচিত্র-কীর্তি সাহিত্যিক অভিমন্যু, যিনি অনায়াসে ব্যূহ ভেদ করনে কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ জানেন না।"

রহস্যময়ী সারদা দূরলোক হ'তে রূপম ইংগিতে কবিকে পাগল করেছে। কবির দেহমন ব্যাকুল—সেই ব্যাকুলতার প্রকাশ এই :

একি, একি কেন কেন,
রসাতলে যাই যেন!…

এই পর্যন্তই থাক্। একে কবিতা বলবে কোন পাগলে! অন্যত্র এই রহস্যময়ীর কথাই :

চিনেছি মা, আয়, আয়
বিকাইব রাঙা পায়!
তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে!
বিপদ সম্পদে, রাখ,
অলক্ষ্যে আগুলে থাক ;—
যখন যেখানে আছি চেয়ে আছ মুখ-পানে!

রাঙা চরণ-তলে নিজেকে বিলীন করার ইচ্ছা কবির মধ্যে প্রবল—কিন্তু কেমন ভাবে নিজেকে বিলীন করা যায় তা' কবির অজ্ঞাত। তাই শেষ পর্যন্ত 'অলক্ষ্যে আগুলে থাক' বলেই আপন-হারা ব্যাকুল-আত্মার মূলে বজ্র হেনেছেন। নিজেকে আর রাঙা পায়ে বিলীন করা হয়ে ওঠেনি।

একটি রাত্রের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন :

রাতি করে সাঁই সাঁই,
জনপ্রাণী জেগে নাই,

কাব্য রসিকের কাছে এ এক অদম্য হাসির খোরাক।

অধিক উদ্ধৃতি দিলে হয়তো আমরা শ্রদ্ধা হারিয়ে কবির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবো—কিন্তু উদ্ধৃতি না দিয়েও বলা চলে বিহারীলালের সমগ্র কাব্যের তিন-

চতুর্থাংশ প্রকাশের এই চরম দুর্বলতা বহন করে নিয়ে চলেছে। ক্ষীণতম এক ভগ্নাংশমাত্র কাব্য হয়ে উঠেছে। যেখানে তিনি কূল-প্লাবী ভাব-বন্যাকে সুকঠিন তটরেখায় আবদ্ধ করে দূর মোহনার পথে অগ্রসর করে দিতে পেরেছেন সেখানে তিনি সার্থক কবি—বড় কবি। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে এমন অংশ বিরল-দৃষ্ট। হৃদয়ে ভাব এসেছে কিন্তু মুখে ভাষা ফোটেনি। শিল্পী হিসাবে বিহারীলালের চরম ব্যর্থতা এখানে। তাঁর কাব্যের ছন্দে একান্ত ভাবে দুর্বল—পীড়াদায়ক। অন্ত্যানুপ্রাস অধিকাংশ স্থলে সুশ্রাব্য নয়—ভাষার তো কথাই নেই। 'প্রচণ্ড মার্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া—ধপ্ করে বিছানায় পড়িল শুইয়া' জাতীয় গুরু-চণ্ডালে ভাষা প্রায় কবিতার সৌন্দর্য-সম্ভ্রমকে সমূলে ধ্বংস করেছে। মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় ছড়ার ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। ফলে অতীন্দ্রিয় ভাব-বাহী কবিতা অধিকাংশ স্থলে ছেলে ভুলান ছড়ার মত হয়ে উঠেছে।

বিহারীলালের এই দৌর্বল্যের প্রধান কারণ—তিনি সচেতন ভাবে কাব্যের ভাষাকে কোন দিনই অনুশীলন করেন নি। যত্নকৃত কলা-কৌশলের অনুশীলন যেন তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বিহারীলালের কাব্যের রসভঙ্গের আর একটি প্রধান কারণ তাঁর কাব্যে অলৌকিক এবং লৌকিক চিন্তার নিরন্তর মিশ্রণ। তবুও মাঝে মাঝে যে তাঁর কাব্য 'সুন্দর' হয়ে ওঠেনি এমন নয়—সারদা-মঙ্গলের ঊষা-বর্ণনায় তিনি লিখেছেন :

> বিরল তিমির জাল,
> শুভ্র অভ্র লালে-লাল
> মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।

সন্ধ্যার রূপ-বর্ণনায় কবির কণ্ঠ হ'তে শুনি :

> সন্ধ্যাদেবী হাসিছেন রক্তাম্বর পরি,
> ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবী সুন্দরী।

"এই সকল চকিত চমকের ভিতর দিয়া কবির কাব্য-প্রতিভার পরিচয় মেলে—কিন্তু চকিত চমকের ন্যায় তাহা বড় ক্ষণস্থায়ী। কাব্যের লোকোত্তর চমৎকারিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত আসিয়া গিয়াছে এমন অনেক লৌকিক বর্ণনা ও তাহার লৌকিক ভাষা যে আমাদের স্বপ্নও সব সময়ে জমিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই ; স্বপ্নময় মন সোনালি হইয়া রাঙিয়া উঠিতে না উঠিতেই দম্‌কা বাতাসে অপ্রত্যাশিত কালো মেঘ আসিয়া পড়িয়াছে।"

বলাবাহুল্য এই সব স্থলেই বিহারীলালের লাবণ্য-দীপ্তা কবিতা-সুন্দরী রাহু-গ্রস্তা।

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

॥ এক ॥

॥ প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক প্রবন্ধকারগণের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরীর রচনা তীক্ষ্ণধার, দীপ্তোজ্জ্বল এবং বলিষ্ঠ। বক্তব্য নয়, বলার রীতিই তাঁর প্রবন্ধের প্রাণ-সম্পদ। অনমনীয় ইস্পাত-কঠিন গদ্য-রীতিতে তিনি যা' প্রকাশ করেছেন তা' যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি দৃঢ়-পিনদ্ধ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রবণতা তাঁর রচনার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। "Style is the man himself"—এ কথা প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাবে সত্য। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় বক্তব্য এবং বলা দুই-ই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। তিনি যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন বক্তব্যই সেখানে উচ্চ-শির হওয়ার কথা, তথাপি বলার গুনে সেই দুরূহ তথ্য ও তত্ত্ব কথা সরস হয়ে উঠেছে। বক্তব্য এবং বলা দুই-ই সমান্তরাল সরলরেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর রচনার মত রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা যদিও তীক্ষ্ণ-ধার হয়ে ওঠেনি তথাপি তাঁর রচনা মর্ম্মস্পর্শী। প্রমথ চৌধুরীর রচনা অতিস্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণধার হওয়ায় অধিকাংশ সময়ে কর্কশ মনে হয় কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় সর্বত্র একটি মসৃণ কমনীয়তা বিরাজমান। এতে রচনার লাবণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ রচনা সৃষ্টি-ধর্মী। মৌলিক চিন্তাধারার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে প্রবন্ধগুলি অনন্য-সুন্দর হয়ে উঠেছে। বক্তব্য এবং বলার রীতি উভয়ের মাঝে একটি সহজ-মনোরম অদ্বৈত সম্বন্ধ আছে। তাঁর বক্তব্য প্রদীপ্ত এবং প্রাণবন্ত। বলার রীতি সহজ এবং সাবলীল। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা বলেন্দ্রনাথের মত সৃষ্টিধর্মী নয়—প্রধানতঃ সংকলন-ধর্মী। প্রখ্যাত মনীষীদের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে তিনি আপনার মত করে সংকলন করেছেন। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে মৌলিক চিন্তাধারার যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ আছে তা' রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে প্রধান হয়ে না উঠ্‌লেও মাঝে-মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সেই গুণেই তাঁর প্রায় রচনা মৌলিক সৃষ্টির প্রান্ত-সীমা-স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর বহু পথেই পদচারণা করেছেন। বহুবিধ উপাদানকে তিনি প্রবন্ধ রচনার বিষয়ীভূত করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—১॥ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ২॥ বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ ৩॥ সৌন্দর্য তত্ত্ব এবং ৪॥ সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। সকল প্রকার লেখার মধ্যে প্রবন্ধের গুণ গুলি বর্তমান। তথ্য-তত্ত্ব, ধ্যান-ধারণা, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি গুণাবলী তাঁর প্রবন্ধগুলিকে আদর্শস্থানীয় করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর রচনায় প্রবন্ধ সাহিত্যের এই মৌলিক গুণাবলীর অতিরিক্ত আছে এক সাহিত্যিক আমেজ এবং এই সাহিত্য-স্পর্শেই তাঁর তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলিও লাবণ্য-শ্রীতে অনন্যসুন্দর হয়ে উঠেছে। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে লেখক আপন মনের মাধুরীর এমন সঞ্জীবন-স্পর্শ রেখে গেছেন যে প্রবন্ধগুলি আপাতঃ-রূঢ়তার খোলস ত্যাগ করে সজীব হয়ে উঠেছে। দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধবলীতে সাহিত্যিক গুণের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধের প্রধান গুণ বিষয়-বক্তব্যের অতিরিক্ত যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি সে সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল গীতি শাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শন-শাস্ত্র বা রসায়ন শাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন তাহাতে আপত্তি করিব না! কিন্তু বিষয়টী যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।" বিজ্ঞান এবং দর্শনের নিরস তথ্য ও তত্ত্বগুলি যথাযথ পরিবেশন করলে যে তা প্রবন্ধ হয়ে উঠ্‌বে না তা' ত্রিবেদী মহাশয় ভালভাবেই জান্‌তেন এবং সেই জন্যেই তাঁর প্রবন্ধের সর্বত্রই তথ্য ও তত্ত্বের অতিরিক্ত সৌন্দর্য-সুষম-স্পর্শ ফুটে উঠেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধ রচনার আর একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সুগভীর তত্ত্বকথা এবং বিষয়-ভরাক্রান্ত জিনিষগুলিকে সৃষ্টির আবেগে সহজ, সরল ও সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারতেন। পণ্ডিতের মত তিনি জটিল বিষয়ের ওপর পাণ্ডিত্যের আর এক পোঁচ তুলি টেনে জটিলতর করে তোলেননি! দুরূহ সকল বিষয়কে তিনি সর্বপ্রথম আপনার হৃদয়-মূলে গ্রহণ করতেন তারপর আপনার জারক-রসে জরিয়ে বিষয়ের সকল জটিলতম-গ্রন্থি উন্মোচিত করে একান্তভাবে আপনার মত করে নিয়ে তবে প্রকাশ করতেন। ফলে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটি সরল এবং সহজ প্রাণ-স্পর্শ মিশে থাকতো—বস্তুতঃ তাঁর বক্তব্য হলো আপনার হৃদয়ের কথাকে আপনার মত করে বলা।

দুরূহ এবং কঠিন বিষয়ের অবতারণের পূর্বে তিনি পরিবেশটাকে অত্যন্ত সহজ এবং আকর্ষণীয় করে নিতেন। কেননা তিনি জানতেন গম্ভীর বিষয়কে যদি আরও একটু গম্ভীরভাবে উপস্থিত করা যায় তা' হলে পাঠক আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তাকে গম্ভীরভাবেই এড়িয়ে যাবে। ফলে প্রথমেই তিনি পরিবেশটাকে এমন সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলতেন যে পাঠক হাসিমুখেই সেই দুর্গম পথে পদচারণার জন্যে এগিয়ে আসতো। 'মুক্তি' (salvation) একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য এবং পাচ্যের ধর্মজগৎকে মন্থন করে তার সারতম অংশ দিয়েই গড়েছেন 'মুক্তি' প্রবন্ধ। কিন্তু সেই দুর্গম গবেষণারণ্যে প্রবেশ-পথটি তিনি কী সুন্দরভাবেই না আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রবন্ধটির সর্বপ্রথম পরিচ্ছেদ এই: "ডাক্তার জ্বর পরীক্ষার পর রোগীকে কুইনীন ব্যবস্থা করিলেন; বলিলেন, তোমার কুইনীন সেবন কর্তব্য। এই সময়ে যদি কেহ গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, কুইনীন সেবন মানুষের কর্তব্য নহে, পরোপকারই মানুষের কর্তব্য, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, রোগীর কোন উপকার হয়না!"

এই মন্তব্যে পরিবেশ যে কত তরল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই পরিবেশ তারল্যকৃতের মধ্যে আর একটি জিনিষ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে—তা' বিশুদ্ধ হাস্যরস। বস্তুতঃপক্ষে এই হাস্যরস সৃষ্টিও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রায় প্রবন্ধের কঠিন ভূমি হাস্যরসের অনাবিল স্রোতে সরস হয়ে উঠেছে। 'প্রলয়' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যখন তিনি বলেন: "বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই, পৃথিবী একসময় উল্টিয়া যাইবে। সেদিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কিনা স্মরণ নাই। মনের ভিতরে প্রবল বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালায় একটি প্রাচীনতর বন্ধু আশ্বাস দেন পৃথিবী উল্টাইবে সন্দেহ নাই, তবে এখনো তাহাতে লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে। এই আশ্বাস-বাণী শুনিয়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উল্টান অপেক্ষাও পণ্ডিত মহাশয়ের বর্তমান সামীপ্য অধিক উদ্বেগের কারণ নির্ধারিত করিয়াছিলাম—" তখন আমরা না হেসে থাকতে পারিনে। এমনি ভাবে তিনি প্রবন্ধের বহুস্থানেই আমাদের যথেষ্ট পরিমানে হাসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধের মধ্যে এই গুণটি বর্তমান।

রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক প্রবন্ধের মধ্যে একটি 'ব্যক্তি-স্পর্শ' লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ প্রবন্ধে এমন একটি স্বভাবানুগ মনোহর স্পর্শ আছে যা' রমেন্দ্রসুন্দরকে বাংলার অসংখ্য প্রবন্ধ লেখক হতে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

ঘরোয়া ভাবে কথোপকথনের একটি ভাব ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিকে একান্ত সরসতা দান করেছে। বৈঠকী আলোচনার মত তিনি লঘুচালে কথা বলে গেছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুলে শ্রোতাদের নিকট হ'তে উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতে সমগ্র প্রবন্ধটি বলিষ্ঠ-ঋজুতায় সহজ-সুন্দর হয়ে উঠেছে।

অসংখ্য উপমা-প্রয়োগই বোধহয় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক প্রবন্ধাবলীতে যখনই তিনি কোন দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করেছেন সাথে সাথেই তিনি দিয়েছেন অসংখ্য উপমা-দৃষ্টান্ত। ফলে বিষয়টির কাঠিন্য অধিকাংশে হ্রাস পেয়েছে। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটিতে যেন দৃষ্টান্ত-উপমার শ্রী-ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। এই উপমা প্রয়োগে বক্তব্য বিষয়ের কোন অঙ্গহানি তো ঘটেইনি বরং সৌন্দর্য-সম্ভার ও সরলতা-মাধুর্যে অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই উপমা-প্রয়োগের সার্থকতম সব্যসাচী। এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগের মধ্যেও যে রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিক সাহিত্যিক মনের পরিচয় মিশে রয়েছে সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্তের মন্তব্য স্মরণযোগ্য: "এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা প্রয়োগের ভিতরেও রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা তিনি প্রায়শই গ্রহণ করিতেন প্রাচীন ভারতীয় নানাবিধ শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে; ফলে তাঁহার লেখার বিষয় বস্তুতেই শুধু নয়, লেখার রীতিতেও একটি ভারতীয় গন্ধ ছিল। রামেন্দ্র-সুন্দরের লেখা পড়িলে বেশ বুঝা যাইত, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার একটি নিবিড পবিচয় ছিল এবং সেই নিবিড় পরিচয় তাঁহার মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করিয়াছিল।"

প্রচুর বক্রোক্তি-ব্যবহার রামন্দ্রসুন্দরের রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর বাক-বীর্যক ভাষণের অন্তরাল হতে একটি বিদ্রূপাত্মক মনো-ভাব শাণিত হসির মত ঝলকিত হয়ে উঠেছে। এই হাসির স্মিতালোকে প্রবন্ধের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথকে সহসা আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছে। প্রথম চৌধুরীর মধ্যে আমরা ব্যঙ্গ-বক্রোক্তির প্রচুর নিদর্শন পেয়েছি। রবীন্দ্র-নাথের বহুতর প্রবন্ধ এই বক্রোক্তির প্রাণোচ্ছল রূপায়ণ।

আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাকে প্রধানতঃ সংকলনধর্মী বলেছি—কিন্তু মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভাও তাঁর ছিল। সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-চিন্তাগুলি একান্তভাবেই মৌলিক। তাঁর বিদ্যাসাগরের জীবনালেখ্যটিও মৌলিক-সৃষ্টি-ধর্মী। এখানে কেবল কতকগুলি ঘটনা ও তথ্যকে বার হ'তে জুড়ে দেওয়া

হয়নি—অন্তরের অসীম অনুরাগে তা অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধীয় লেখাটি আজিও আমাদের চিত্তকে বিস্ময়ে বিমণ্ডিত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন সার্থক প্রবন্ধ শিল্পী। তাঁর প্রবন্ধ যে একেবারে ত্রুটীশূন্য তা' নয়—তথ্যের ভারে ও তত্ত্বের চাপে মাঝে মাঝে পীড়িত হয়ে উঠেছে, বর্ণনা এবং প্রকাশ ভংগীও কোন কোন সময় নীরস মনে হয়—কিন্তু তিনি যে দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তা'তে এই ত্রুটীগুলি একান্তভাবেই গৌণ। তিনি সুকৌশলী শিল্পীর মত, সুনিপুণ পথ প্রদর্শকের মত পাঠককে ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়েছেন তত্ত্বের গহনতম প্রদেশে আবার সেখান হতে বার করে নিয়ে এসেছেন মুক্ত আলো-বাতাসে। শিল্পী হিসাবে বোধহয় রমেন্দ্রসুন্দরের চরম সার্থকতা এখানেই।

॥ দুই ॥

॥ রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানানুসন্ধান এবং তিনি সংশয়বাদী কিনা ॥

'জিজ্ঞাসা'র প্রথমেই লেখক পিতৃদেবের চরণে মুগ্ধমনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন: "জীবনদাতা, পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্তিভেদ।" জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে এতবড় প্রিয় সত্য-ভাষণ বোধহয় আর কোথাও নেই। গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন-চঞ্চল মনের কত শত ব্যাকুল জিজ্ঞাসাই না আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনটি দর্শনের, কোনটি বিজ্ঞানের, কোনটি রসায়ণের, কোনটি পদার্থের, কোনটি জ্যোতিষের, কোনটি সাহিত্যের, কোনটি সমাজের আবার কোন প্রশ্ন বা রাষ্ট্রের মূল সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সত্যই "জিজ্ঞাসা" গ্রন্থ অনন্ত জিজ্ঞাসার বিচিত্র এ্যালবাম। সত্যকে জানার জন্য, অজানার আবরণ উদ্‌ঘাটনেব চেষ্টায় কত না অসীম জিজ্ঞাসা মনীষী ত্রিবেদীর মনে উদ্বেল হ'য়ে ভেঙে পড়েছে। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ সেই অনন্ত জিজ্ঞাসারই বিচিত্র সংযোজনা। গ্রন্থে সংযোজিত প্রবন্ধগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিনিষ্ট মন বিনা যুক্তিতে কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নির্ভেজাল সত্যবলে গ্রহণ করেনি। সব তথ্য, সব তত্ত্বকেই তিনি যুক্তির বেড়াজালে ফেলেছেন এবং বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছেন সব সত্য সেই জালের আয়ত্তাধীন কিনা। তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানে তাঁর চেষ্টার সীমা নেই। সংগ্রহ তিনি করেছেন অনেক কিন্তু সব কিছুর সত্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয়ও জেগেছে অনন্ত। কেননা

অনেক প্রতিষ্ঠিত তথ্যই যেন ধোপে টেঁকে না। জিজ্ঞাসা গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির দু'চারটি আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব তাঁর জিজ্ঞাসা কত অনন্ত এবং সেই জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর সংগ্রহের জন্যে তাঁর কী অসীম ব্যাকুলতা।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে বা দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি অস্বীকার যেমন করেননি তেমনি সব সত্য বা তত্ত্বকে মেনে নিতেও পারেননি। দু-একটি জায়গা ছাড়া অবশ্য তিনি কোথাও নতুন তত্ত্বের বা তথ্যের সন্ধান দেননি।

বিজ্ঞানের তথ্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'য়ে তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি সত্যের অবতারণা করে তার বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। বিজ্ঞানের মূল সত্য সমগ্রভাবে পদার্থের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। পদার্থের ধ্বংস নেই, শুধু পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে মাত্র। বিজ্ঞান এই সত্যে উপনীত হয়েছে পদার্থ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে। যেহেতু আজ পর্য্যন্ত পদার্থের ধ্বংস দৃষ্টিগোচর হয়নি সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্যে উপনীত হয়েছেন পদার্থের ধ্বংস নেই। অতএব এই তথ্যকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু প্রবন্ধকারের মন্তব্য এই যে তা' হলে এ সত্য মানুষের ধারণার অপেক্ষা রাখে। অতএব এ সত্য আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু কাল অনন্ত, সেই অনন্ত কালের মধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবেনা বা মানুষের ধারণাশক্তি প্রসারিত হবে না এমন কথা কে বলতে পারে। অনেক সত্যের ক্ষেত্রেই তো দেখা গিয়েছে মানুষের জ্ঞান প্রসারের সাথে পূর্বতন সত্যের দৃঢ় ভিত্তিও শিথিল হ'য়েছে। জড় পদার্থের ধ্বংস নেই—ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কারের পর এই মূল সত্যের ভিত্তিও যেন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। অতএব কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ধ্রুব সত্য বলে ধারনা করা যায় কেমন করে? সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে যাকে আমরা সত্য বলে মনে করছি তা' হয়তো আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়।

বিজ্ঞানের আর একটি সত্য প্রকৃতিতে মিরাকল্ কিছু নেই। প্রকৃতির খেয়াল বলে কিছু নেই, সব কিছুরই মধ্যে আছে একটি চিরন্তন নিয়ম, যে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মিরাকল্ বা অতিপ্রাকৃতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচারী বা বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি এসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, সুতরাং কোন্‌টি প্রকৃতির নিয়ম আর কোন্‌টি নিয়ম নয় তার স্থিরতা কি! ফলে কোন ঘটনা সাধারণতঃ অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'লেও তা' অপ্রাকৃত নাও হ'তে পারে বা আজ যাকে অপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছে, জ্ঞানের প্রসারণের ফলে কাল তাকে প্রাকৃত বলেই মনে হ'তে

পারে। হাজার হাজার বৎসর ধরে একই নিয়ম চল্‌তে দেখে আমাদের মনে কতকগুলি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে এই নিয়মগুলি চিরন্তন সত্য। মাধ্যাকর্ষণ, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি বিষয়গুলির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এতে দেখা গিয়েছে এই অতিবিশ্বাস অনেক সময় মানুষের সর্বনাশ সাধন করেছে। মানুষ তার এই অতিবিশ্বাসের ফলে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির পাদদেশে বসবাস শুরু করল, কিন্তু একদিন দেখা গেল হঠাৎ আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যদগার করে মানুষের অতিবিশ্বাসের অনুচিত সাহসের প্রতিফল দিয়েছে। তাই সূর্য্য আজ যে নিয়মে চলছে কালও যে এই নিয়মে চল্‌বে শতবর্ষ পরেও যে এই নিয়ম ঠিক থাক্‌বে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? জগদ্‌যন্ত্রের গতির পর্য্যালোচনা করে এই সকল সত্যের আবিষ্কার করতে হয়। ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সকল প্রাকৃতিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূয়োদর্শন যত বাড়ে এই সকল সত্যের মূর্ত্তিও তেমনি পরিবর্ত্তিত হয়। চিরকাল এক মূর্ত্তি থাকে না। সকল অলৌকিক সত্যের মধ্যে আবার সবচেয়ে ব্যাপক সত্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধেও লেখকের মনে জেগেছে বিরাট জিজ্ঞাসা। গ্রহগুলি মহাকাশে অবিরাম নিশ্চিন্তে আপন আপন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেন? কিসের বলে? এ সম্পর্কে সুদূর অতীত কাল হ'তে অনেকে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত মানুষ জানত পৃথিবী ঘোরে না সূর্য্যই ঘোরে। কোপলার দেখালেন সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে এবং উপবৃত্তকার পথে ঘোরে। গ্রহসমূহ নিজ-নিজ দূরত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সূর্য্যকে আবর্ত্তন করে। কিন্তু তারা ঘোরে কেন এ প্রশ্নের সদুত্তর কোপলার দিতে পারেননি। কোপলারের পর দেকার্তে বললেন সূর্য্য-মণ্ডলকে ও সৌরজগৎকে ঘিরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে, গ্রহগুলির সেই ঝড়ের অভিমুখে ভেসে চলেছে। এই ঝড় যতদিন না থেমে যাবে ততদিন গ্রহগুলি আপন আপন পথে ঘুরবে। পরে নিউটন এলেন নতুন পথের সন্ধান নিয়ে। তিনি দেখালেন পরস্পরের আকর্ষণ বল আছে বলেই তারা ঘুরে। এই আকর্ষণের বলের একটা আঙ্কিক পরিমাণও তিনি স্থির করলেন। গ্রহ সূর্য্যকে ঘুরে কেন? সূর্য্য অভিমুখে বল আছে বলে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও এই গতি বলের মধ্যে কোন নিয়ম থাকতে পারে তা'তো আমাদের জানা ছিল না। নিউটন জানালেন। নিউটন দেখিয়েছেন আপেল ফল যে নিয়মে নীচে পড়ে—গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড সেই নিয়ম অনুসারেই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এর পরেও

কেন আছে। তারা একটা নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে চলে মাত্র, কিন্তু কেন চলে সে প্রশ্নের তো জবাব মেলে না। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধে লেখক এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা কতকগুলি উপমা প্রয়োগের দ্বারা প্রমান করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। এইরূপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ পদার্থ বিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাননি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি 'বিজ্ঞানে পুতুল পূজা' দিয়ে তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের, বিরাট জিজ্ঞাসার যবনিকা টেনেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন : "কল্পিত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ বা পর্য্যবেক্ষনলব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার মাত্র ; আমরা দেবতাকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি এবং এক একটি পুতুলের এক একটি মূর্ত্তি দিয়াছি। বিজ্ঞান বিদ্যা মনুষের মন গড়া মূর্ত্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা হীনতা নাই; কেন না যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান, প্রকৃতি সংকীর্ণ ভাবে—মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মনুষের বিজ্ঞানকে উল্লিখিত সংকীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।"

উপরের বিভিন্ন আলোচনায় আমারা দেখলাম বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যের উপর লেখকের ঠিক যেন আস্থা নেই—গোপন প্রাণের কোথায় যেন একটু সংশয় দেখা দিয়েছে। তবু লক্ষণীয় বিষয় এ সংশয় কোথায়ও মিথ্যার দিগন্ত স্পর্শ করেনি। সুতরাং খাঁটি অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পূর্ণ সংশয়-বাদী বলা চলে না।

দার্শনিক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর একজন ভাববাদী। দার্শনিক তথ্যানুসন্ধানেও তাঁর আগ্রহের সীমা নেই, জানবার ইচ্ছা সেখানেও প্রবল। কিন্তু জিজ্ঞাসা সেখানেও আছে, রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসন্ধিৎসু মন সেখানেও হাজার প্রশ্ন তুলেছে। সুখ বেশী না দুঃখ বেশী এ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে লেখক বিভিন্ন পন্থীদের মতামতের মধ্যে উত্তর হাতড়িয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কি সাহিত্যিক, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক কারও মতের দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলে মনে হয়। এক এক পক্ষের ঝোক একদিকে। সুখ বেশীদের মতে সুখ বেশী বলেই মানুষ এখনও টিঁকে আছে এবং জীবনের উপর তার মোহ আছে। দুঃখ বেশী হলে দুনিয়ায় আত্মঘাতীর সংখ্যা বেশী হত। দুঃখ বাদীদের মতে দুঃখই বেশী—সুখ নেই বললেই হয়। বাঁচবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা

নয় এ ইচ্ছা দুঃখ হ'তে নিষ্কৃতির ইচ্ছা; তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। আমাদের দেশে দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্বাণবাদ এই চিরন্তন দুঃখ হ'তে মুক্তি লাভের আকাঙ্খার ফল। দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভের পথ নির্দেশ করতে গিয়েই বৌদ্ধ-ধর্মের জন্ম। ভারতীয়দের মতে ভোগে সুখ নেই, আছে দুঃখ। ত্যাগেই সুখ অর্থাৎ দুঃখকে সহ্য করাই সুখ। বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা—সুখের প্রলোভন দেখিয়ে সে দুঃখেরই পথে মানুষকে নিরন্তর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুখ বড় না দুঃখ বড় লেখকের এই প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নের সমাধান ঠিক হল না, তবে মনে হয় দুঃখের দিকেই লেখকের ঝোঁক বেশী।

জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধেও লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য, অন্য সম্প্রদায়ের মতে এটা কাল্পনিক। উভয় মতই নিরহ মানুষকে নিয়ে টানাটানি করছে। জগৎ যদি থাকে তার স্বরূপ কি? এ প্রশ্ন নিয়ে তর্কই চলেছে কিন্তু মীমাংসা হয়নি। জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রলে দু'টি অংশ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমি, দ্বিতীয়তঃ আমা-ছাড়া অর্থাৎ আমা ছাড়া আর যা কিছু আছে। আমার অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই, তা হলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তারপর আমা ছাড়া জগৎকে নিয়ে গণ্ডগোল। বহির্জগৎকে স্বীকার করে নিলেও বল্‌তে হয় এর খানিকটা প্রত্যক্ষ গোচর খানিকটা অনুমান গোচর।

জড়জগৎ যে সদ্বস্তু নয় সে সম্পর্কে প্রাচী ও প্রতীচীর সকল জ্ঞানিগণই এক-মত। তবে দৃশ্যমান মায়াপটের অন্তরালে যে একটা সৎপদার্থ আছে তা' যেন বুঝা যায়, তা' অজ্ঞেয় অব্যক্ত। এরূপ দার্শনিক মত দ্বৈতবাদ। সদ্বস্তু দুই—উভয়ই অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয়—একের নাম পুরুষ বা আত্মা বা জ্ঞ, অপরের নাম প্রকৃতি বা জ্ঞেয়। কিন্তু এ মত সর্বজন গ্রাহ্য নয়। বেদ বলে 'ব্রহ্ম'ই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। কিন্তু এর স্বরূপ কি? এই আনন্দ স্বরূপের প্রকাশ কিসে এ প্রশ্নের সমাধান হয়নি। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক যেন কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। সেখানে ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধেও যেন সন্দেহ জেগেছে। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু তিনি তো সৌন্দর্য-ময় তবে জগতে এত কুৎসিতের স্থান হ'লো কেমন করে? তিনি তো করুণাময় তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো ন্যায়বান তবে দুর্বলের উপর পীড়ন কেন? অনেকেই বলেন শয়তানের কারসাজিতে এইরূপ হয়। তাহলে বুঝতে হবে তিনি সর্বশক্তি মান নন। এর উত্তরে অনেকে বলেন সুন্দর, করুণা, ন্যায়

প্রভৃত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্যই অসুন্দর, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নানা মতের অবতারণা করেছেন, বহু যুক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছেন, বিনা যুক্তিতে কিছু তিনি স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু বহু যুক্তিতেও প্রশ্নের মিমাংসা কতটা হয়েছে বলা শক্ত। 'এক না দুই' প্রবন্ধে ব্রহ্ম ও জীবের দ্বয়ত্ব বা অদ্বয়ত্ব আলোচিত হয়েছে। অনেক যুক্তি তর্কের পরে লেখক যেন অদ্বত্বকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ প্রর্যন্ত সেই সংশয়—আমি কে? এর উত্তর আর পাওয়া যায়নি।

এইরূপ দর্শনের সুবিশাল ক্ষেত্রের সর্বত্রই লেখক যুক্তিবাদী মন নিয়ে পদচারণা করেছেন। মুক্তিতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব কিছুই বাদ যায়নি! সব কিছুই জানবার ইচ্ছা যেন লেখককে প্রবলভাবে গ্রাস করেছে। তাই দেখি—লেখকের জ্ঞান পিপাসা বা জিজ্ঞাসা অনন্তের দিগন্তাভিসারী। দেশী, বিদেশী, জ্যোতিষতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব, বিজ্ঞান—কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি। সব কিছুরই সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু পিপাসা যেন তাঁর মেটেনি। তত্ত্ব ও তথ্যকে স্বীকার করেও সর্বত্র—তাঁর সংশয় রয়ে গিয়েছে—পূর্ণ সমাধান—যেন মেলেনি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছেন—সেখানে প্রকৃতির নির্বাচনতত্ত্ব, প্রয়োজনতত্ত্বের আমদানি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন ডারউইনের মতবাদ দিয়ে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, মনই সেখানে সব, অনুভূতিই প্রধান।

এমনি ভাবে আমরা দেখ্তে পাই সর্বত্রই লেখকের যুক্তিবাদী মনের প্রশ্ন-চঞ্চল সঞ্চারণ। জানার আবেগে তিনি যেন অণুপরমাণুর বুকে বুকে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্বের গ্রন্থশালার গ্রন্থরাশি পড়ে শেষ করে ফেলেছেন—তবুও প্রশ্নের সমাধান হয়নি—জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনি। মরু-গ্রাসী পিপাসায় অনন্ত জিজ্ঞাসা বেড়েই গিয়েছে। তাই গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে যে বাণী-শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন জিজ্ঞাসা গ্রন্থ সম্পর্কে তা' পূর্ণ সত্য।

॥ কাব্য লোক ॥

॥ এক ॥

॥ নাট্যরস ও কাব্যরস ॥

সাহিত্য-স্বরূপ ও তত্ত্বালোচনায় আমাদিগকে সহসা বহুতর জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এদের দর্শন যত সুলভ, বলাবাহুল্য সমাধান তত সহজ নয়। স্মরণাতীত কালে কোন শুভক্ষণে এক হৃদয়বান চিন্তাশীল মানব মনের গহনাগারে চকিত-ইসারায় এদের জন্ম, তারপর চিন্তা-প্রবাহের খাত পেরিয়ে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে বহু হৃদয়ে বহু মনে বহুভাবে এরা লালিত-পালিত হয়েছে—কিন্তু এই লালন-পালনে সমস্যা-গ্রন্থি শিথিল না হয়ে অধিকতর জটিল আকার ধারণ করেছে—মুক্তি-লীলা ক্রমান্বয়ে সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্যমান বিষয় নাট্যরস এবং কাব্যরসকে কেন্দ্র করেও অনুরূপ জটিলতর পরিস্থিতির সৃষ্টি। এই উভয় রসকে কেন্দ্র করে যে জিজ্ঞাসাগুলি দানা বেঁধে উঠেছে সেগুলি এই ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে: নাট্যরস এবং কাব্যরস কী? কাব্য নাট্য-গুণ সম্পন্ন কী না? উভয় রসের মধ্যে কোন রস শ্রেষ্ঠ? ইত্যাদি। যতদূর সম্ভব বিভিন্ন দলের বাদানুবাদের মসী-যুদ্ধ-জটিলতা পরিত্যাগ করে আমাদের আলোচনায় উভয় দলের সার গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

নাট্যরস-সম্পর্কিত আলোচনা যে কত প্রাচীন তা' আজ নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই—তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভারতমুনির গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি পাশ্চাত্ত্য মনীষী আরিষ্টটলের ন্যায় মনে করতেন নাটক কাব্য অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট। ভারতমুনি কাব্য এবং নাটক উভয়কেই কাব্য বলেছেন। কাব্য হলো শ্রব্য এবং নাটক হলো একই কালে শ্রব্য এবং দৃশ্য। তাঁর মতে শ্রব্য কাব্য বা মহাকাব্য অপেক্ষা শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য বা নাটক অনেক বেশী শক্তিশালী, পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মনে নাট্যরসের প্রভাব সুদূর-প্রসারী। কেননা কাব্য কেবল পাঠ্য—পাঠককে পাঠ করে তবে তার থেকে রস গ্রহণ করতে হয় কিন্তু নাটক অভিনীত হয়। ফলে তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে দর্শককে বিস্ময়-বিমণ্ডিত করে

দেয়। কাব্যের রসধারা অস্পষ্ট। নাটকের রসধারা স্পষ্ট। একটি সুপ্ত অপরটি জাগ্রত।

আনন্দবর্ধন কিন্তু নাটককে কাব্যের উপরে স্থান দেননি—তিনি নাটক এবং কাব্যকে এক সমভূমিতে দাঁড় করিয়ে উভয়কে সমান বলেছেন। রস-সম্পর্কে তাঁর কাছে কাব্য ও নাটক উভয়ে সমান। রসই কাব্য এবং নাটক উভয়েরই প্রাণ।

এরপর ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট ইত্যাদি লেখকগণ কাব্য এবং নাটককে এক বলে স্বীকার করলেও রসকেই কাব্যের প্রাণ বলেননি। তাঁদের কারো মতে রস কাব্যের অলংকার আবার কারো মতে একটি গুণ মাত্র।

কাব্য এবং নাটক যে এক এবং উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য নেই—এই মত একাদশ শতাব্দীর লেখক অভিনব গুপ্তের মধ্যে সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যাবলী যেমন দর্শকের সম্মুখে স্পষ্টালোকে উদ্ভাসিত হয় তেমনি কাব্য পাঠের সময়ও পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে কাব্যে বর্ণিত দৃশ্যাবলী মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সুতরাং কাব্য এবং নাটকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই অভিনবগুপ্ত ঘোষণা করলেন: "কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব। কাব্যং চ নাট্যমেব।" অর্থাৎ "কাব্য প্রধানতঃ দশরূপক বা নাটকসমূহের স্বভাব-সম্পন্ন। কাব্য বস্তুতঃ নাট্যই।"

তবে এখানে বিশেষরূপে লক্ষণীয় বিষয় এই অভিনবগুপ্ত কাব্য বল্‌তে কেবলমাত্র মহাকাব্য বা আখ্যানমূলক কাব্যকেই বুঝেছেন—কোন গীতিকাব্য বা নিসর্গ কাব্যকে বোঝেন নি। মহাকাব্য বা আখ্যানমূলক কাব্য মূলতঃ অসংখ্য ঘটনার বাস্তবালেখ্য। মহাকাব্য ঘটনা-মুখর এবং ঘটনা-প্রবাহে তা' গতিশীল—একটির পর একটি ঘটনা সমগ্র মহাকাব্যের কাহিনীকে দ্রুত সঞ্চারমান রাখে। নাটক ও মূখ্যতঃ ঘটনা-কেন্দ্রিক—ঘটনার উত্থান-পতনেই নাটকের বক্ষ আবেগে কম্পমান। সুতরাং মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের সাথে নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান—উভয়েই ঘটনা-মুখর। সুতরাং আখ্যানমূলক নাট্যধর্মী কাব্য এবং নাটকের প্রাণ যে রস এবং উহারা যে একই ধর্মানুসারী সে বিষয়ে বড একটা মতভেদ নেই। কিন্তু গীতিকাব্য বা নিসর্গকাব্য নাট্যগুণ-সম্পন্ন নয়—এখানেই কাব্য এবং নাটক দুই সতন্ত্রধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এবং এখানেই রচিত হয়েছে উভয়ের মাঝে দুরতিক্রমী ব্যবধান।

গীতিকাব্য কবির আত্মলীন অভিব্যক্তি, নাটক কবির বস্তুলীন প্রকাশ। একটি অন্তর্মুখী, অপরটি বহির্মুখী। একটি ঘটনা-বিহীন, কবি-মনের রূপাল্পনা

কল্পিপরটি ঘটনা-কল্প, ব-মনের সরব ঘোষণা। সুতরাং উভয়ে এক হ'তে পারে না। ফলে সমস্ত কাব্য নাট্যধর্মী নয়। শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার দাসগুপ্ত মহাশয় তিনটি যুক্তি নির্দেশ করে 'কাব্যং চ নাট্যমেব' এই মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত করেছেন।

১॥ শ্রদ্ধেয় দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রথম যুক্তি অনুযায়ী কাব্য যতই নাট্যগুণ সম্পন্ন হোক্ না কেন উভয়ের আস্বাদন সমান নয়। কেননা নাটকে লেখক কেবলমাত্র পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় থাকে যেগুলি সহৃদয় পাঠক মনের অনুভূতি ছাড়া পাত্র-পাত্রীর মুখনিসৃত বাণীতে প্রকাশিত হতে পারে না। নাটকের প্রকাশধর্মিতা এখানেই পরাজিত এবং সীমিত। কবিকে কিন্তু এই বাঁধনের পীড়নে পীড়িত হতে হয় না। যে বিষয়গুলি পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে প্রকাশিত হলো না সে বিষয়গুলি কবি স্বয়ং কাব্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে প্রকাশ করে দেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষরূপে স্মরণযোগ্যঃ "যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না; কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া ও কথা নাট্যকারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে সেটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সমগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি হতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কাব্য ও নাটক এক নয়। নাটকের যে গুণ তা'তো কাব্যে আছে উপরন্তু কাব্যের আছে একটি নিজস্ব-গুণ যা নাটকে অনুপস্থিত। যা নাটকে বা পাত্র পাত্রীর মুখে প্রকাশিত হলো না তা' কবি প্রকাশ করলেন স্বয়ং—আপন মনের মাধুরী দিয়ে। হাতে তাঁর মুরজ মুরলী—সে অমিয় তানে পাঠক-শ্রোতা বিভোর—তন্ময়। নাটকের এই মোহিনী শক্তি কোথায়?

২॥ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় শ্রদ্ধেয় দাসগুপ্তের দ্বিতীয় যুক্তিও বিশেষ মূল্যবান। তাঁর মতে নাটক অপেক্ষা কাব্যের আস্বাদনে পাঠক-চিত্ত অধিকতর আনন্দ-উদ্বেল হয়ে ওঠে। নাটকের আস্বাদ পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের উপর নির্ভর

করে বলে তা' স্পষ্ট, বলিষ্ঠ কিন্তু স্থূল। একান্তভাবে পরিদৃশ্যমান বলেই পাত্র-পাত্রীর অভিনয়াদি আমাদের চিত্তের গহন দ্বারে বিশেষ অলোড়নের সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কাব্যপাঠের সময় পাঠকের মন হয়ে ওঠে ক্রম-অন্তরমুখীন। কাব্যে বর্ণিত সকল বিষয় পাঠককে আস্বাদন করতে হয় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাই কাব্যের সকল বিষয় পাঠকের বিপুল-বিস্তারী বাসনালোকে অপূর্ব আলোড়ন-আন্দোলন, রোমাঞ্চ-শিহরণ জাগ্রত করে। কাব্যরস প্রধানতঃ পাঠকের কল্পনা এবং ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করে বলেই সে রস সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাধর্মী, অধিকতর সৌন্দর্য-সুষম। নাট্যরস যেখানে কেবলমাত্র 'সুন্দর' কাব্যরস-প্রবাহ সেখানে সুন্দরের তটভূমি বিদীর্ণ করে 'মনোহরে'র বিপুল মোহনা স্পর্শ করে।

৩॥ কাব্য যে নাট্যগুণসম্পন্ন নয় সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দাসগুপ্তের তৃতীয় মন্তব্যটি অধিকতর মূল্যবান। তিনি বলেছেন "নাটকে যে সকল রস থাকিতে পারে, মহাকাব্যে বা আখ্যানমূলক কাব্যে তাহা থাকিতে পারেই, গীতিকাব্যেও থাকিতে পারে। কিন্তু অব্যক্তব্য অংশের প্রকাশ হেতু কাব্যে এমন কতকগুলি রস থাকিতে পারে ও আছে, খাঁটি নাট্যকাব্যে যাহাদের থাকা সম্ভব নয়।"

আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র রসকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—অভিনেয় রস ও অভিধেয় রস। যে রসের অভিনয় করা চলে তাই অভিনেয় রস বা নাট্যরস। বীরের কার্য্যাবলীতে বীররস প্রকাশমান, সুতরাং বীররস অভিনেয় কিন্তু এমন অনেক রস আছে যা' অভিনয়ে প্রকাশ করা যায় না, বিশেষরূপে চিন্তা করে আস্বাদন করতে হয়, পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা যে রস গহন মনে জাগ্রত হয় তাই অভিধেয় রস। শান্ত, বাৎসল্য, ভক্তি ইত্যাদি রসগুলিকে অভিনয়ের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করা কখনই সম্ভব নয়। এরা কোন ঘটনার আবর্তে প্রকাশিত হয় না—এরা অভিনয়ের অতীত। সুতরাং এ রসগুলি অভিধেয় রস। বিশুদ্ধ গীতিকবিতার রসও এই অভিধেয় রসের অন্তর্গত। কেননা গীতি কবিতার অন্তর-প্লাবী রসকে তো কোন ঘটনার আবর্তে ফেলে, অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা চলে না। গীতিকাব্যের রসকে অভিনয়ে প্রকাশিত করা চলে না—কিন্তু তারাতো প্রকাশিত হয়। অভিনয়ের মাধ্যমে যখনই রসের প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় তখনই কবি আসেন অগ্রসর হয়ে—অলংকার, উপমা ইত্যাদির ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শে অতলান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশ হতে সুকৌশলে তুলে আনেন অযুত মণি-মাণিক্য,

বিকশিত করে দেন সৌন্দর্য-পদ্মের সুষমা-সম্ভার। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতা :

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।

'হৃদয়ের নাচ' কে দেখাবে অভিনয় করে? 'শতবরণের ভাবউচ্ছ্বাস'কেই বা কে প্রকাশ করবে? এ কেবল কবির 'জীয়ন-কাঠি'র স্পর্শেই সম্ভব—অন্যত্র নয়।

বৈষ্ণবপদাবলী হ'তে বিদ্যাপতির আর একটি কবিতা :

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহে ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥…

এখানে মানব-চিত্তের স্থায়ী ভাবটি করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনিতে জীবন্ত-রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে শ্রীরাধা আলম্বন-বিভাব, অনুভাব কিংবা সঞ্চারী ভাব নেই আছে প্রবল উদ্দীপন বিভাব। নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালা, বর্ষনোন্মুখ শাওন-রাত্রি, মাহে ভাদরের নির্জন বর্ষণ-মুখর নিশিথে শ্রীরাধার অন্তরের তীব্র মিলনাকাঙ্খা, মিলন-মিথুন দাদুরির আনন্দ-সিক্ত মত্ততা এবং সর্বোপরি অবিরল বর্ষণ-সিক্ত নিশিথের সুকমোল পরিবেশ—এই সকল উদ্দীপন-বিভাব শ্রীরাধার অন্তরনিহিত বেদনা-ব্যাকুল শৃঙ্গার রসকে অভিনব আলোক সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। এই অভিনব পরিবেশেই শ্রীরাধার ক্লান্তকণ্ঠের ব্যাকুল আর্তি 'এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।' কাব্যের বিভিন্ন উপাদান-জাত শ্রীরাধার বিরহ-ম্লান মনের এই যে আনন্দ-ঘন, বেদনা-বিধুর প্রকাশ—নাটকে এর সম্ভাবনা কোথায়? অন্ততঃ সেখানে এই অখণ্ড প্রকাশ খণ্ডিত হ'তে বাধ্য। আমরা পূর্বেই বলেছি এই কবিতায় অনুভব নেই, সঞ্চারী ভাবও বিরল-প্রায় তথাপি রস স্ফুরণের দিক দিয়ে তো এ কবিতা তুলনারহিত। সুতরাং এ কবিতার রসকে বিকলাঙ্গ বল্‌বে কে? এতো চরম পূর্ণতারই প্রতীক।

সুতরাং সকল দিক দিয়ে বিচার করলে 'কাব্যং চ নাট্যমেব' এই মন্তব্য একান্ত-

দুর্বল হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ নাট্যরস এবং কাব্যরস এক ও অভিন্ন নয়। নাট্যরসের সকল গুণ কাব্যরসে বর্তমান কিন্তু কাব্যরসে যা' আছে নাট্যরসে তা' নেই। নাট্যরসের বাইরে কাব্যরস আছে—সেই রসই অভিধেয় রস। "ইহা উপাদান-বিচারে কখনও বা পূর্ণাঙ্গ, কখনও বা বিকলাঙ্গ, কিন্তু রসের স্বরূপ-বিচারে সর্বদাই সমান ও সম্পূর্ণ।"

॥ দুই ॥

॥ কয়েকটি আলংকারিক পরিভাষার ব্যাখ্যা ॥

ক ॥ স্থায়ীভাব : মানব-চিত্তকে ঘিরে কয়েকটি ভাব স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী রূপে বর্তমান—এই ভাবগুলিকে স্থায়ীভাব বলে। কোন বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে রাখার প্রয়োজন এদের নেই এবং এরা স্ফুলিঙ্গের মত চকিতে ঝলকিত হয়েই মিলিয়ে যায় না। মানবের আদিমতম প্রবৃত্তির সাথে এদের সুনিবিড় যোগ বর্ত্তমান। গ্লানি সাময়িক ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে আবার ধীরে ধীরে অন্তর্নিহিত হয়ে যায়—কিন্তু রতি ? রতি তো এমন ভাবে কখনো মিলিয়ে যায় না। মানবের আদিতম সত্তার সাথে তার যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই রতি স্থায়ী ভাব। পণ্ডিতগণ ন'টি স্থায়ীভাবের উল্লেখ করেছেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং কাম। 'শকুন্তলা' নাটকের স্থায়ী ভাব রতি।

খ॥ বিভাব : স্থায়ীভাবগুলি যে মানব-চিত্তে স্থায়ীরূপে বিরাজমান সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই স্থায়ীভাবগুলি সর্বদা জাগ্রত থাকে না—বিশেষ কারণে তারা সুপ্ত অবস্থা হ'তে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। যে কারণে বা যার দ্বারা এই সুপ্ত স্থায়ীভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে তাকে বলে বিভাব। বিভাব দুই প্রকার—১ ॥ আলম্বন বিভাব ২ ॥ উদ্দীপন বিভাব।

১ ॥ অবলম্বন বিভাব : যে বস্তু অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকে অবলম্বন বিভাব বলে। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আলম্বন বিভাব। কেন না শকুন্তলা নাটকের স্থায়ী ভাব যে রতি—দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে কেন্দ্র করেই তার জন্ম, লালন, পালন এবং বিকাশ।

২ ॥ উদ্দীপন বিভাব : যে বস্তু রসকে উদ্দীপ্ত করে তাই উদ্দীপন বিভাবের অন্তর্গত। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বহুবিচিত্র বেশভূষা এবং মালিণী-তীর, পুষ্পোদ্যান, কোকিল-কূজন, জ্যোৎস্নালোকিত রজনী ইত্যাদি সকলেই

নাটকের কেন্দ্রিয়রস শৃঙ্গারকে (ভাব-রতি) উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ এবং উত্তেজিত করেছে। সুতরাং এগুলিই উক্ত নাটকের উদ্দীপন বিভাব।

গ ॥ অনুভাব : যা' আলম্বন বিভাব অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদিগের কার্য, যে কার্যাবলী দিয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ভাব-প্রবাহকে উপলব্ধি বা অনুভব করা যায়—তাই অনুভাব। শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার ছল করে পদতল হতে কুশ-কণ্টক উন্মোচনের চেষ্টা, দীর্ঘ-নিশ্বাস, কটাক্ষ ইত্যাদি দ্বারা শকুন্তলার হৃদয় যেন আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং কটাক্ষ ইত্যাদি কাযগুলিই এ নাটকের অনুভাব।

ঘ ॥ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব : যে ভাবসমূহ স্থায়ী ভাবরাজীর পরিপোষক তাকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলে। এদের কোন স্থায়ী রূপ নেই—মুহূর্তে উদয় মুহূর্তে বিলয়। এরা সকল সময়েই আত্মদান করে মূল ভাবের পরিপোষণ করে। শকুন্তলা নাটকে চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, স্মৃতি, হর্ষ ইত্যাদি সকলই সঞ্চারী ভাব। কেননা এই চিন্তা, হর্ষ এদের কোন স্থায়ী রূপ নেই—অথচ এরা সকল সময় মূল রতিকেই পরিপোষণ ও পরিবর্ধন করে। এরা সকল সময় মূল ভাবের অভিমুখে বিচরণ বা সঞ্চরণ করে বলেই এদের ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলা হয়।

ঙ ॥ বিভানা ব্যাপার : যে ব্যাপার দ্বারা পাঠক-চিত্তে লৌকিক জগতের নায়ক-নায়িকা-স্থিত রতি ইত্যাদি স্থায়ীভাবগুলি উদ্বুদ্ধ হয়ে রসে পরিণত হয় তাকে বিভানা ব্যাপার বলে। বিভাব অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের সাহায্যেই বিভানা-ব্যাপার সুসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা নাটকে আলম্বন বিভাবের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা (নায়ক-নায়িকা), উদ্দীপন বিভাবের পরিবেশ (জ্যোস্না, কুসুম-কানন, কোকিল-কূজন ইত্যাদি) এবং অনুভাবের কার্যাদি (কটাক্ষ, দীর্ঘ-নিশ্বাস ইত্যাদি) সকলে মিলে মূল ভাব রতিকে শৃঙ্গার রসে পরিণত করেছে। সুতরাং এই বিভাব (আলম্বন, উদ্দীপন) এবং অনুভাবের সাহায্যেই বিভানা-ব্যাপার—অর্থাৎ লৌকিক ভাবকে অলৌকিক রসে পরিণত করা—সুসম্পূর্ণ।

চ ॥ সাধারণী-করণ : আমাদের আপন আপন সদাজাগ্রত ব্যক্তিত্ব-বিসর্জিত হয়ে যখন নাট্য-কাব্য-চিত্রিত চরিত্র ভাবের সাথে আমাদের মনের একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাকেই সাধারণী বলে। একটি উদাহরণে বিষয়টির আপাত-জটিলতা দূর হবে। প্রেক্ষাগৃহে নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্যে নানা জাতীয় দর্শকের আগমন হয়। কেউ উকিল, কেউ অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার, কেউ কবি, আবার কেউবা শোকাতুর, কেউবা বিরহ-কাতর।

পেশাতে যেমন সকলে ভিন্ন তেমনি মানসিক অবস্থাতেও এক নয়। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সকলেই আপন আপন ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন—একটি পৃথক ব্যক্তিসত্তা সকলকে পৃথক করে রেখেছে। হঠাৎ আলো নিভে গেল—যবনিকা উত্তোলনের সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। এই অবস্থাতে সকলের দৃষ্টিই যবনিকার দিকে নিবদ্ধ, কেবল নিবদ্ধ নয় সকলেই আপন ব্যক্তি সত্তাকে ভুলে গিয়ে আকুল-আগ্রহে নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্যে অপেক্ষামান। এখানে সকলেই পেশাগত পার্থক্য ভুলে, মানসিক বিভিন্নতা বিস্মৃত হয়ে—একটি সর্বসাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন—এর নামই সাধারণী করণ। কাব্য পাঠের সময়ও আমরা আমাদের পৃথক ব্যক্তিসত্তাকে চরিত্রাদির ব্যথা-বেদনায় অশ্রুবিসর্জন করি, তাদের আনন্দ-উপভোগে নিজেদিগকে ধন্য মনে করি। এখানেও আমরা সাধারণী করণের মধ্যে এক হয়ে যাই।

ছ ॥ অঙ্গীরস : একটি কাব্যে বা নাটকে একাধিক রস থাকৃতে পারে—তাদের মধ্যে একটি রস প্রধান বা মুখ্য হয়ে সকল রসকে আচ্ছন্ন করে দেয়—এই মুখ্য রসটিই অঙ্গীরস। 'ওথেলো' নাটকের অঙ্গীরস করুণ।

জ ॥ দীপ্তিকাব্যও দ্রুতিকাব্য : নিখিল বিশ্বের বাইরের বস্তুর সাথে আমাদের গহন মনের দু'টি সম্পর্ক আছে—একটি বোধময় অপরটি ভাবময়, একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অপরটি হৃদয়ধর্মী। একটিকে বুদ্ধি দিয়ে আমরা হৃদয়ে গ্রহন করি অপরটি অনুভাবের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কাব্যেরও দু'টি রূপ—একটি দীপ্তিকাব্য অপরটি দ্রুতি কাব্য। দীপ্তিকাব্য তাকেই বলব, যে কাব্যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত, হৃদয়বেগের চাঞ্চল্য অপেক্ষা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে বহুল পরিমানে বর্ত্তমান। 'দীপ্‌'+করণ বাচ্যে 'ক্তি'=দীপ্তি। আর দ্রুতিকাব্য সেই ধরণের কাব্য যেখানে ভাব-সঞ্চার এবং রসনিষ্পত্তির জন্য হৃদয় বিগলিত অথবা বিদ্রুত হয়ে যায়। 'দ্রব'+করণ বাচ্যে 'ক্তি'=দ্রুতি।

ঝ ॥ বাচ্যর্থ ও ব্যঙ্গার্থ : সুন্দরী রমণীগণের দেহ এবং লাবণ্যের মত শব্দেরও দু'টি অর্থ আছে। একটি হলো বাচ্যার্থ এবং অপরটি হলো ব্যঙ্গার্থ। শব্দের শব্দগত বা বাচ্যগত অর্থ অর্থাৎ আভিধানিক অর্থই হলো বাচ্যার্থ এবং যে অর্থ বাচ্যের অতীত, আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে এক নতুন অর্থের সৃষ্টি করে তাই ব্যঙ্গার্থ। লাবণ্য যেমন দেহ হতে অবিচ্ছিন্ন নয় আবার একও নয় তেমনি ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থ হতে বিভিন্ন নয় আবার একও নয়। বাচ্যকে অবলম্বন করেই তার জন্ম তবুও সে বাচ্যাতীত।

॥ তিন ॥

॥ ভাবের স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে ভেদ স্বীকারের প্রয়োজন ॥

ভাব সমূহকে স্থায়ী এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারীরূপে বিভাগ করার স্বার্থকতা কী এ প্রশ্ন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে সর্বপ্রথম ভাবের এ দু'টি বিভাগ করেছেন। বলাবাহুল্য এই বিভাগ প্রাচীন আচার্যগণের গভীর বিশ্লেষণাত্মক অন্তরদৃষ্টিরই পরিচায়ক।

কয়েকটি ভাব আছে যারা কেবল মানবের নয়, নিখিল প্রাণী জগতের অন্তরদেশ দিয়ে নীরব ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। রতি, ক্রোধ, ভয়, শোক এই ভাবগুলি মানব-পশু ইত্যাদি প্রাণী মাত্রেরই সকলের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত। আবার হাসি, উৎসাহ, জুগুপ্সা এবং বিস্ময় এই ভাবগুলি প্রধানতঃ মানব-চিত্ত-স্পর্শী। গাভীর মধ্যে ভয় আছে, ক্রোধ আছে। যখন সে লেজ গুটিয়ে পালায় তখন তার মধ্যে ভয় প্রধান আর ক্ষুদ্র শিং দু'টিকে সবেগে আন্দোলিত করে যখন তেড়ে আসে তখন সে ক্রোধকেই প্রকাশ করে। কিন্তু ভয় বা ক্রোধ থাকলে গাভীর মধ্যে হর্ষ নেই—হম্বা রবের বদলে যদি সে কোন দিন খিল খিল করে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতো তা হলে সেটা পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় হতো। যা' হোক রতি, হাস ইত্যাদি এই ভাবগুলি কেবলমাত্র মানবের মনলোকেই বিরাজমান। অনাদি অতীতের মানব-মনে যেমন এগুলি প্রবল ছিল তেমনি অনাগত ভবিষ্যতেও এগুলি মানব-চিত্তকে আলোড়ন-বিক্ষুব্ধ করবে। এরা চিরস্থায়ী। বিভাব, অনুভব ইত্যাদি ভাবগুলি এদের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে অনুবর্তন করে। এদের বিনাশ নেই, মানব-চিত্ত হতে নির্বাসন নেই—স্বতন্ত্রভাবে মানস-লোকে এদের শাশ্বত এবং চিরন্তনী অধিষ্ঠান। এই জন্যই এরা স্থায়ীভাব। এই স্থায়ীভাব-অবলম্বনে রচিত সাহিত্যই মানবজগতে চিরন্তন সাহিত্য হয়ে উঠে। স্থায়ী ভাব হতেই স্থায়ী সাহিত্য। স্থায়ী-ভাব অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করেছিলেন বলেই ভার্জিল, হোমর, সেক্সপীয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, হাফেজ, শাদী অমর—এঁদের কাব্য নিত্যকালের মানব-সমাজের চরম পূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয়।

সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। ভরতমুনি কেবল 'ব্যভিচারী' কথাটি উল্লেখ করেছেন—'সঞ্চারী' শব্দটি প্রয়োগ করেননি। যা' হোক তাঁর ব্যাখ্যায় ব্যভিচারী ভবের স্বরূপ ইত্যাদি বিশেষ রূপে ব্যাখ্যাত হয়নি। পরবর্তী কালের আচার্যগণ, বিশ্বনাথ ইত্যাদির ব্যাখ্যায় আমরা বিশদ ব্যাখ্যাসহ সঞ্চারী কথাটিও পাই। রতি ইত্যাদি স্থায়ী ভাবগুলি যেন বিশাল

সমুদ্র আর ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবগুলি যেন তার উপরিভাগের লীলা চঞ্চল তরঙ্গ। এই তরঙ্গমালা একবার উদ্দাম হয়ে উচ্চশির হচ্ছে আবার পরক্ষণে অতল তলে মিলিয়ে যাচ্ছে। এদের কোন স্বতন্ত্র স্থায়ী অস্তিত্ব নেই—এরা কাব্যে সর্বদাই কোন না কোন স্থায়ী ভাবের অধীন হয়ে প্রকাশ পায়। স্থায়ীভাবের পরিপুষ্টি সাধনই এদের লক্ষ্য। স্থায়ীভাবের আলোচনায় আমরা দেখেছি স্থায়ীভাব অবলম্বনে স্থায়ী কাব্য রচনা সম্ভব—কিন্তু সঞ্চারী ভাব নিয়ে অনুরূপ কাব্য রচনা সম্ভব নয়। হর্ষ একটি সঞ্চারী ভাব—কিন্তু কেবল 'হর্ষ'কে নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এই সঞ্চারী ভাবকে অবলম্বন করে অনেক 'কমিক' বা 'ফার্স' জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে কিন্তু একটু গভীর করে দেখলেই বোঝা যাবে এই সকল গ্রন্থের মূলে সর্বদাই কোন না কোন স্থায়ী ভাব বর্তমান। সেই স্থায়ীভাবকে কেন্দ্র করেই 'হর্ষ' ইত্যাদি সঞ্চারী ভাবগুলি আলোড়িত হয়েছে মাত্র। ঠিক একই কারণে নিদ্রাকে নিয়ে কোন 'নিদ্রা-সংহার কাব্য' রচিত হয়নি। ভাবকে স্থায়ী এবং সঞ্চারী রূপে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানেই। যদিও উভয়েই ভাব তবুও একটি আসল অপরটি নকল। উভয়ের মাঝে এইভাবে বিভেদের সীমারেখা টানায় আসলটি গ্রহণ করার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হয়েছে। অমৃত এবং জল উভয়ই পানীয়—তবুও একটি পান করে মানুষ বাঁচে, অপরটি পান করে মানুষ হয় চিরঞ্জীবী।

॥ চার ॥

॥ রস অভিব্যক্ত হয়—বলার পিছনে যুক্তি ॥

রস অনুভূতির জিনিষ, হৃদয়-মনে আস্বাদের জিনিষ—তবুও বলা হয়েছে রস অভিব্যক্ত হয়—প্রকাশিত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে মন্তব্যটি আপাতঃ বিরোধী। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মন্তব্যটি হতে আমরা সমন্বয়-ধর্মী সত্য-সার গ্রহণ করতে পারবো।

রস নিষ্পত্তি হয় এই কথাটি আমরা প্রথম পেয়েছি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে। রস সম্বন্ধে তাঁর বহু-খ্যাত উক্তিটি এই ঃ

নাহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থ প্রবর্ত্ততে

তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারী সংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তিঃ।

ভরতমুনির উক্তির সর্বশেষ শব্দ দুটি 'রস নিষ্পত্তিঃ' এই মন্তব্যের সূতিকাগার। এই নিষ্পত্তি শব্দটিকে নিয়েই যত বাদানুবাদ। আচার্যগণ শব্দটির অর্থ যথা-

ক্রমে উৎপত্তি, অনুমতি, ভক্তি, ও অভিব্যক্তি বলে ধরেছেন। ভরতমুনি ব্যবহৃত এই মন্তব্যটিকে গ্রহণ করে মর্মভট্টও বলেছেন রস নিষ্পত্তির কথা। এ বিষয়ে বিভিন্ন আচার্যগণের বিজ্ঞ উক্তির জটিলতা যতদূর সম্ভব পরিহার করে আমরা বিষয়টিকে জটিলতা-মুক্ত করতে চেষ্টা করবো।

রস মানসিক অবস্থার স্ফুরণ। তাই জ্ঞানের উৎপত্তির উপাদানের মত রসেরও দু'রকম উপাদান আছে—বাহ্যিক এবং মানসিক। রস সৃষ্টিতে বাহ্যিক উপাদান কিন্তু বাইরে থেকে আসে না—আসে কবি-সৃষ্ট কাব্য-জগৎ থেকে। আর মানসিক উপাদান আসে গহণ মনে সুপ্ত ভাবরাজী বা ইমোশনগুলি হতে। বস্তুতঃ এই ভাব বা ইমোশনই হলো মানসিক উপাদান। আলংকারিকের মতে কাব্যের ঐ বাহ্যিক উপাদান এবং মানসিক উপাদানের সঙ্গে যখন রাসায়নিক সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখনই সৃষ্টি হয় রসের। 'শোক' একটি মানসিক উপাদান বা 'ভাব'। কিন্তু কেবলমাত্র এই শোকই কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। যদি তা' হতো তা' হলে পুত্র-শোকাতুরা মাতার ক্রন্দনই কাব্য হয়ে উঠতো। কবি যখন প্রতিভা বলে এই লৌকিক শোক এবং তার কারণকে অলৌকিক কাব্যের মাধ্যমে সুনিপুণ সন্নিবেশে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেন তখন আমাদের সমগ্র চিত্ত অদ্ভুত বিস্ময়ে বিমণ্ডিত হয়ে ওঠে—জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে জাগে চরম বিস্ময়। এই বিস্ময় এতই আনন্দময় এবং দুর্নিবার যে সে সুখ-ব্যঞ্জন-গর্ভ ধারায় আমাদের সমগ্র দেহমন স্নাত হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক দুঃখাদি বিস্মৃত হয়ে সেই আনন্দ সুধাকে আকণ্ঠ পান করি। এই আনন্দই হচ্ছে ব্রাহ্মস্বাদ-সহোদর। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই আনন্দের আর এক নাম দিয়েছেন 'অলৌকিক চমৎকার।' বাস্তব-জীবনে দুঃখ আছে আবার সুখও আছে কিন্তু সে সুখ-দুঃখের আস্বাদ এই ব্রাহ্মস্বাদ-সহোদর নয়। এই লৌকিক সুখ-দুঃখকে কবি আপন 'জারক রসে জরিয়ে' আপনার প্রচণ্ড হৃদয়-উত্তাপে গলিয়ে কাব্য-জগতে সর্বসাধারণের অন্তর-প্লাবী আনন্দের উৎস করে তোলেন। এই আনন্দ-প্লাবনে আমাদের চিত্তের চার পাশে প্রাত্যহিক সংসারের গড়া প্রাচীর ভেঙে পড়ে, চিৎসত্তা আপন-স্বরূপে আপনার অন্তরে রসের আস্বাদ উপলব্ধি করে। দু'কূল-ভাঙা জোয়ার প্লাবনে রস তো তখনই প্রকাশিত হয়—অভিব্যক্তি লাভ করে। শাস্ত্রকারের কণ্ঠে তাইতো শুনি: "রত্যাদ্য বচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেবরসঃ।"

আমাদের আলোচনার বিস্তৃত বপুকে সংযত করে বলা যায়: সাধারণ অবস্থায়

রসের প্রকাশ সম্ভব নয়। মানসিক উপাদান পাঠক-চিত্তে সুপ্ত আর বাহ্যিক উপাদান কাব্যের পৃষ্টায় নির্বাক। পাঠকালে এই উভয়ের সংমিশ্রণে প্রকাশিত হয় রস—কাব্যপাঠের আনন্দ থেকে উৎপন্ন অনুকূল পরিবেশেই পাঠক গ্রহণ করে সে রসের মর্ম-নির্যাস।

॥ পাঁচ ॥

॥ রস অলৌকিক এবং কাব্যের আত্মা ॥

রস অভিব্যক্ত হয়—এই মন্তব্যের মূলেই রস যে অলৌকিক এই বিষয়ের সার নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা সূত্রাকারে রসকে কেন অলৌকিক বলা হয় সে বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করবো।

বাহ্যিক এবং মানসিক এই দুই উপাদানের রাসায়নিক সংযোগেই রসের সৃষ্টি। বাহ্যিক উপাদান পাই কবির সৃষ্ট কাব্য জগৎ থেকে। এই বাহ্যিক উপাদান অবশ্য কবি গ্রহন করেছেন বাস্তব জগৎ থেকেই। কিন্তু কাব্য পাঠ কালে পাঠক সেটি গ্রহণ করে কাব্য জগৎ থেকে—বাস্তব জগৎ থেকে নয়। আর মানসিক উপাদান আসে মন থেকে—মনের ভাব বা ইমোশন গুলিই হলো মানসিক উপাদান। বাহ্যিক উপাদান আসে কাব্য জগৎ থেকে কিন্তু মানসিক উপাদান আসে লৌকিক জগৎ থেকে। লৌকিক জগতেই মানসিক উপাদানের অস্তিত্ব। 'শোক' একটি মানসিক উপাদান বা 'ভাব'। কিন্তু এই শোক আসে লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণ থেকে—যেমন কোন বিধবার পুত্র মারা গেছে। এই মৃত্যুটা বিধবার কাছে পরম শোকের। কিন্তু এই 'শোক' বিধবার কাছে 'রস' নয়—কেননা বিধবার কাছে শোকটি রসের হলে নিশ্চয় সে আনন্দ পেত। রস আনন্দ দেয়। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দ পায় কোন বিধবা? আবার এই শোকের কারণ এবং কাযাবলীও কাব্য নয়। তাই যদি হ'তো বিধবার প্রলাপ এবং শোকবাক্যগুলিই তা' হলে সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য হয়ে উঠ্‌তো। কবি যখন এই লৌকিক শোক এবং তার কারণাদিকে কাব্যে রূপায়িত করেন তখনই তা' সীমিত লৌকিক-গণ্ডী ছাড়িয়ে অলৌকিক রসের জগতে প্রবেশ করে। শোক হয়ে ওঠে করুণ রস। এবং এই করুণ রস তখন আর দুঃখের বস্তু থাকে না—পরম আনন্দের সামগ্রী হয়ে ওঠে। "রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও তার পরিনাম যে 'রস' তা নিত্য আনন্দের

হেতু।" কবির কণ্ঠে তাই তো শুনি Our sweetest songs are those that tell of saddest thought। সুতরাং লৌকিক জগতের ভাব যখন কাব্যের মধ্যে রস রূপে আত্মপ্রকাশ করে—তখন আর তা' লৌকিক থাকে না, লৌকিকতার আবরণ ছিন্ন করে অলৌকিক হয়ে ওঠে। রসের জগৎ, কাব্যের জগৎ তাই মায়ার জগৎ, অলৌকিক জগৎ।

'তোমার পুত্র জন্মেছে' এই কথাগুলি যদি কোন পিতার কাছে বলা যায় তা' হলে তাঁর বদন মণ্ডলে উল্লাস, আনন্দ এবং হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌বেই। কিন্তু এই হর্ষ, আনন্দ লৌকিক ভাব মাত্র—'রস' নয়। সে জন্যে এ বাক্যটিও কাব্য নয়। এ বাক্যের আবেদন একান্ত লৌকিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—লৌকিকতার দিগন্ত ছিন্ন করে অলৌকিক রসলোকে প্রবেশ ক'তে পারেনি। কোন বাক্য তখনই কাব্য হয়ে উঠ্‌বে যখন তা' অলৌকিক রসময়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে। কেননা কাব্যের আত্মা রস—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। 'কাব্য হচ্ছে বাক্য, রস যার আত্মা' এই রস-রূপ আত্মাটুকু না থাকলে বাক্য কখনই কাব্য হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

॥ ছয় ॥

॥ রস নিষ্পত্তিতে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাব ॥

লৌকিক ভাবাদি অলৌকিক না হলে, বস্তুজগৎ রস জগতে পরিণত না হলে কাব্য হবে না এ এক রকম প্রায় সর্বজন সম্মত। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই কবি কোন প্রতিভাবলে এই অলৌকিক রস জগতের সৃষ্টি করেন, তাঁর সেই বিশেষ অবলম্বনটি কী? আলংকারিকেরা উত্তর দিয়েছেন কবির সেই অবলম্বন তিনটি—বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী। এ তিনটি অবলম্বনের স্বরূপ এবং সংগা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

লৌকিক জগতে যা' রতি ইত্যাদির উদ্‌বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাই বিভাব। আলম্বন (রাধা-কৃষ্ণ) এবং উদ্দীপন (বংশীধ্বনি, বেশ, ভূষা) বিভাব সমূহ সর্বদাই এই লৌকিক ভাবগুলিকে (রতি ইত্যাদি) জাগ্রত করে। রতি ইত্যাদি লৌকিক ভাবগুলি জাগ্রত না হলে রসস্ফুরণ সম্ভব নয়। সুতরাং রস নিষ্পত্তির ভূমিকায় বিভাবের অংশ হলো রতি-আদি ভাবের উদ্বোধন করা।

'মনে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হলে, যে সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা' বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই-সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকে অনুভাব।'

রাধিকার দীর্ঘ-নিশ্বাস, কটাক্ষ ইত্যাদি অনুভাবের অন্তর্গত। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই অনুভাবও বিভাবের মত লৌকিক পর্যায়ের অন্তর্গত! তবে বিভাব-দ্বারা উদ্বোধিত রতি-আদি ভাব অনুভাব দ্বারা গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং রস নিষ্পত্তিতে অনুভাবের প্রধান কাজ মানসিক ভাবগুলিকে গাঢ়ত্ব প্রদান করা।

অভিনবগুপ্ত বিভাব এবং অনুভাবকে বলেছেন—'সকল হৃদয়ে সমবাদী।' বিভাব এবং অনুভাবের মধ্যে এমনই একটি জিনিষ আছে যা কাব্যে অঙ্কিত চরিত্র বা ভাবগুলিকে সকল পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব এবং সম্বন্ধের সৃষ্টি করে দেয় এবং সেই জন্যেই "কাব্য-পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোন ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভাব এবং অনুভাব উভয়ে মিলিত হয়ে লৌকিক ভাবরাশিকে অলৌকিকতার দিকে নিয়ে যায়—কিন্তু সম্পূর্ণ অলৌকিক হয়ে উঠ্‌তে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রমও নজরে পড়ে—কিন্তু তা' বিরল। একটী উদাহরণে কথাটি পরিষ্কার হবে।

'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে'—এই বাক্যটির মধ্যে বিভাব (রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ—উদ্দীপন বিভাব) আছে, স্থায়ী ভাবও (ভালবাসা) আছে তথাপি বাক্যটি রসাত্মক নয়। কেন? এ প্রসঙ্গে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রথম কারণ—বাক্যটিতে স্থায়ী-ভাবের উল্লেখ মাত্র আছে, উহার বহুলরূপে উপলব্ধি বা প্রকাশ হয়নি। দ্বিতীয় কারণ—বাক্যটিতে ব্যভিচারী ভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ হয়নি।'

উদ্দীপন বিভাবাদিসহ স্থায়ী ভাব যদি বিবিধ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ না করে তা' হলে ভাব কখনই অলৌকিক রস-রূপ লাভ করতে পারে না। চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, হর্ষ, আবেগ, কম্পন ইত্যাদি গুলি সঞ্চারী ভাবের অন্তর্গত। বৈষ্ণব কাব্যে আমরা এই সঞ্চারী ভাবরাজীর অদ্ভুত প্রয়োগ দেখি। পূর্বোক্ত বাক্য 'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে'—এ ভালবাসা মুখের কথা। কিন্তু সেই ভালবাসাই অন্তরের হয়ে অপূর্ব রসরূপ লাভ করেছে বৈষ্ণব কাব্যে। একটু বিশ্লেষণ করলেই তা' বোঝা যাবে। 'শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের বাঁশী শুনে বা চিত্র দেখে, অথবা কদম্বতলে তাঁর রূপ নিরীক্ষণ করে তাঁকে ভালবেসেছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে রাধিকার চিত্তে রতিভাবের উদয় হয়েছে। এখন সে কেবলই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে, সে চিন্তায় তন্ময় হয়ে মেঘের পানে চেয়ে থাকে, এক দৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ

অবলোকন করে। কৃষ্ণকে রাধিকা পায় না, চিত্ত বিষাদে ভরে যায়, সে চঞ্চল হয়ে একবার ঘরে আসে আবার বার বাইরে যাতায়াত করে। একদিন রাধা শ্রাবণরজনীতে স্বপ্নের ঘোরে শ্রীকৃষ্ণের সাদর স্পর্শ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং তার চিত্ত হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তারপর রাধিকার অভিসার। লজ্জায় তার পা সরে না, শেষে সখীর স্কন্ধে ভর করে চল্‌তে থাকে, কৃষ্ণ কী ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবেন ভেবে শঙ্কায় তার বক্ষ কম্পমান হয়ে ওঠে। এমন সময় রাধিকা শোনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণ খেলা করে। চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে শ্রীরাধার ঈর্ষা এবং শেষ পর্যন্ত মোহগ্রস্থ হয়ে ভূমিতে পতন। ইত্যাদি।'

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে রাধার অন্তর-সাগরে ভাব-তরঙ্গের কী গভীর উত্থান-পতন। চিন্তা, বিষাদ, হর্ষ, স্বপ্নাবস্থা, লজ্জা, শঙ্কা, ঈর্ষা, মোহ এমনি অসংখ্য সঞ্চারী ভাব শ্রীরাধার অন্তরের মূল ভাব রতির চার পাশে স্বতঃ সঞ্চচারমান। এই সঞ্চারী ভাবগুলির উদয়-বিলয়, উত্থান-আত্মদানের ভিতর দিয়ে নিত্যনতুন রূপে মূলভাব রতিরই পুষ্টি সাধন করেছে। এই 'রতি' সঞ্চারী ভাবের এতগুলি স্তর অতিক্রমনের পর আর লৌকিক 'রতি' নেই—হয়ে উঠেছে অলৌকিক জগতের মধুর 'শৃঙ্গার' রস।

বিভাব অনুভাব লৌকিক ভাবগুলিকে পুষ্টিসাধন করে, সমগ্র ভাব-প্রবাহকে অলৌকিকতার পথে নিয়ে যায় কিন্তু অলৌকিক করে তুল্‌তে পারে না। 'ভাব' অলৌকিক হয়ে ওঠে সঞ্চারী ভাবের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে। "এই সঞ্চারী কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও চল্‌তি হয়েছিল যে সঞ্চারী দিয়ে পরিপুষ্ট না হলে রসের রসত্বই হয় না।"

কবিরাজ বিশ্বনাথের ঘোষণায় সত্য-সার সুন্দর রূপে বিধৃত হয়েছে :

বিভাবেনানুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা
রস তামেতি রত্যাদি :
স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্ ॥

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব, (কাব্যের) বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে, রসে পরিণত হয়।'

॥ সাত ॥

॥ ধ্বনি : ধ্বনিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ॥

কাব্য কী? কাব্যের আত্মা কী? শব্দ না অর্থ? বস্তু না ধ্বনি? কোনগুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়? কাব্যত্ব কোথায়? সেই স্মরণাতীত কাল হতে আজ পর্যন্ত এমনি কত শত জিজ্ঞাসা ক্রম বর্ধমান হয়ে উঠেছে। উত্তর দেওয়ার চেষ্টা যে হয়নি তা' নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উত্তরও এসেছে।

আত্মা যাই হোক কাব্যের শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদসমূহ। সুতরাং কাব্য দর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী তাঁদের কণ্ঠ হতে শোনা গেল বাক্যই কাব্য। শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের কোন স্বতন্ত্র আত্মা নেই। "বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজ সজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজ-সজ্জার নাম অলংকার।" শব্দকে অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকারে সাজিয়ে যেমন সুন্দর করা যায় অর্থকেও তেমনি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি নানা অলংকারে সাজিয়ে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে সে এই অলংকারের জন্যে। শব্দ ও অর্থের আস্বাদনই কাব্যের আস্বাদন। সে জন্যই আলংকরিকেরা ঘোষণা করলেন : 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।'

কিন্তু বিশ্বে নিন্দুক ও ছিদ্রান্বেষীদের অভাব নেই। অলংকারবাদীদের বিরূপ সমালোচনায় অন্য আলংকরিকেরা বল্‌লেন, অলংকৃত বাক্য মাত্রই কাব্য নয়। তাঁরা 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' এই সংজ্ঞার অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দু' রকম দোষই দেখালেন্। কোন কোন বাক্যে অলংকার, উপমা ইত্যাদি সকল থাকা সত্ত্বেও তা' কাব্য হয়ে ওঠে না আবার এমন অনেক কাব্য আছে যা'তে অলংকার নেই অথচ তা' শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে বিবেচিত।

বিপক্ষদল অলংকারবাদীদের মতামত উড়িয়ে দিয়ে একটু ব্যাপক ভাবে কাব্যের সজ্ঞা নির্দেশ করলেন। তাঁদের মতে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি—Style। এই রীতি হলো কাব্য রচনার বিশিষ্ট ভংগী। এই রীতি বা ষ্টাইলের গুণেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কাব্য এই রীতিরগুণেই মানব-মনে স্থায়ী রেখাঙ্কণ করতে সমর্থ হয়েছে। অলংকার হ'লো এই রীতির আনুষঙ্গিক একটি বস্তু মাত্র। অলংকার যদি রীতির দ্বারা যথাস্থানে প্রযুক্ত না হয় তা' হলে অলংকার অর্থ হীন। বাস্তব জগৎ হ'তে উপমা নেওয়া যেতে পারে। অলংকার পরলে রমণীদেহ সৌন্দর্য-সুষম হয়ে ওঠে কিন্তু

পায়ের মলকে গলায় ধারণ করলে কদর্যই বাড়বে—সৌন্দর্য নয়। কেননা এখানে অলংকার যথাস্থানে প্রযুক্ত হয়নি। কাব্যের রীতি অনন্ত অলঙ্কার সমূহকে কাব্য-ষোড়শীর অঙ্গ-প্রতঙ্গের যথাস্থানে বিন্যাস করে তাকে লাবণ্য-সুঠাম করে তোলে। সুতরাং কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি। রীতিরাত্মা কাব্যস্য।

কিন্তু আবার নিন্দুকের দল এগিয়ে আসেন। রীতিবাদের বহুল ত্রুটি দেখিয়ে তাঁরা বলেন নির্দোষ ভাবে অঙ্গে অলংকার পরিয়ে দিলেই কাব্যে সৌন্দর্য আসে না—শরীরেও নয়, কাব্যেতো নয়ই। তবে কাব্যের সৌন্দর্য আসে কোথা হতে?

আলংকারিকেরা 'ধ্বন্যালোক' থেকে সেই বহুখ্যাত লাইন দু'টি তুলে বলেন, "রমণী দেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিষ তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা' শব্দ, অর্থ, রচনাভংগী, এ সবের অতিরিক্ত আরও কিছু।" এখানে যে অতিরিক্ত বস্তুর কথা বলা হয়েছে—এই আতরিক্ত বস্তুই কাব্যের আত্মা।

এই অতিরিক্ত বস্তুটি কী?

এর উত্তরে আলংকারিকদের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছে। একদল বস্তুবাদী, অপরদল ধ্বনিবাদী।

বস্তুবাদী: আলংকারিকদের মধ্যে যাঁরা বস্তুবাদী তাঁরা বলেন কাব্যের মধ্যে যে অতিরিক্ত বস্তুটির কথা বলা হয়েছে এই বস্তুটি হলো কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য—বস্তু বা ভাব। পরপর শব্দের সংযোজনায় কাব্যের সৃষ্টি—এবং এই শব্দ দ্বারা গঠিত কাব্য প্রকাশ করে কোন বস্তু বা ভাবকে। অনেক বস্তু আছে যা আমাদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে—চন্দ্র, কোকিল, ফুল ইত্যাদি—আবার অনেক ভাব আছে যে গুলি আমাদের চিত্ত-মূলে সহজেই আন্দোলনের সৃষ্টি করে—প্রেম, বীয, মহত্ব ইত্যাদি। কবিদের কাজ আপন বাণী-বন্দনায় এই বস্তু এবং ভাব সমূহকে যথাযথ প্রকাশ করা। সুতরাং বস্তুবাদীদের মতে "ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে আর ধর্মান্তর নেই।"

ধ্বনিবাদ: ধ্বনিবাদীগণ ভিন্ন মত পোষণ করলেও ভাব, বস্তু, রীতি এবং অলংকারকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁদের মতেও পৃথিবীর বহুখ্যাত কবিগণের কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি এবং অলংকারের সুসংহত লাবণ্য-দীপ্ত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ সব স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা

আর একটি গভীর কথা বলেছেন। এবং যে মন্তব্য থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধ্বনিবাদের। তাঁরা বলেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে বাচ্যাতীতকে প্রকাশ করা। শব্দ এবং তার আভিধানিক অর্থ দিয়ে যেটুকু প্রকাশিত হয় তা'-ই একান্ত ভাবে সীমিত। তা'-ই কাব্যের আসল বস্তু নয়। তা' কাব্যের দেহ হতে পারে—প্রাণ নয়। প্রাণ হলো বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যে অর্থ সংগীত-রেশের মত অনুরণিত হয়ে ওঠে সেই অর্থ—সেই বাচ্যাতীত অনুরণন।

দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জ বনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেই ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায় ছিন্নদল।
॥ শা-জাহান : বলাকা ॥

এই কবিতার মধ্যে মন্ত্র-গুঞ্জরণ, কুঞ্জবন, মালঞ্চ, চঞ্চল-অঞ্চল, বিদায়-গোধূলি ইত্যাদি শব্দগুলি যদি কেবল লৌকিক জগতের বস্তুরাশির মধ্যে সীমিত থাক্‌তো, এদের অভিধানিক অর্থই যদি প্রধান হয়ে উঠ্‌তো তা হলে বাক্য-সমষ্টি হয়তো পাগলের প্রলাপে পরিণত হতো! কিন্তু এ মন্ত্র-গুঞ্জরণ তো কেবল মন্ত্র-পাঠের শব্দ নয়, এ কুঞ্জবন তো কেবল বকুল-কবরীর ক্ষেত্র নয়—প্রেমের গুঞ্জনে এ মন্ত্র-গুঞ্জন আত্মলীন হয়েছে, প্রেমের সুরভিতেই এ কুঞ্জবনের সকল কলিই আত্মহারা। 'বিদায় গোধূলি' শব্দটির মধ্যেও সায়াহ্নে-কোমল প্রেমের এক মহান অভিব্যক্তি বিকশিত হয়ে উঠেছে। চির-সৌন্দর্য পূজারী শাজাহান, বিশ্ব-লাবণ্যের প্রাণ-কেন্দ্র মোঘল-তন্বী মমতাজ বেগম—রূপ ধরে এ কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের নিখিল চিত্ত-ভূমি অধিকার করে। সুতরাং এ কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবরাশি বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে দূর দিগন্তে সম্প্রসারিত। বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে এই যে নতুন অর্থ—আলংকারিকেরা এর নাম দিয়েছেন ধ্বনি। "কাব্যের বাচ্যার্থ একটি মাত্র, তাহা যখন বাধিত না হইয়া নিজ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া পাঠকের চিত্তে একই সময়ে আর একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি।...আঘাতের পর মুখ্য ঘণ্টানাদ থামিলেও যেমন একটি অনুরণন চলিতে থাকে ঠিক তেমনি চিত্তে বাচ্যার্থ

প্রবেশ করিবার পর, তাহারই প্রসঙ্গক্রমে নূতন অর্থের সূক্ষ্ম স্পন্দন উঠিতে থাকে।” অনুরূপ সিদ্ধান্ত পাই প্রখ্যাত মণীষী ব্র্যাডলের কথায় "The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all"। যে ব্যাপার দ্বারা এই ধ্বনি প্রতীয়মান হয় তাকে বলে দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন ব্যাপার। আর যে শক্তির বলে এই ধ্বনি আসে তাকে বলে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনাশক্তি—Power of suggestion।

আনন্দবর্ধন এই ধ্বনিবাদকে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধ্বনিবাদকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে শব্দ এবং তার অর্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি হতে আলোচনা করতে হয়। শব্দের দু'টি শক্তি আছে—একটি অভিধা শক্তি এবং অপরটি লক্ষণা শক্তি। শব্দের দ্বিবিধ শক্তির জন্যে লব্ধ অর্থও দ্বিবিধ। অভিধা শক্তির দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় সে অর্থকে বলে অভিধেয় অর্থ বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ এবং লক্ষণা শক্তি দ্বারা লব্ধ অর্থকে বলা হয় লক্ষ্যণার্থ, লাক্ষণিক অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থ। পুরুষ বল্‌তে পুরুষলোক এবং সিংহ বল্‌তে সিংহকে বোঝায়—এ হলো শব্দের মুখ্যার্থ! কিন্তু যখন বলা হয় পুরুষসিংহ তখন পুরুষ তার পৌরুষত্ব হারিয়ে, সিংহ তার সিংহত্ব হারিয়ে নতুন বীর্যবান অর্থে প্রকাশিত হয়—এই অর্থই প্রতীয়মান অর্থ। এখন প্রশ্ন—শব্দের এই দু'টি অর্থের মধ্যে কোনটি কাব্যে অধিকতর উপযুক্ত। ধ্বনিবাদীগণ নিঃসন্দেহে বলিবেন প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনার্থই হলো কাব্যের পক্ষে পরম উপযোগী। কেননা কাব্যের উদ্দেশ্য সুন্দরকে প্রকাশ করা, ইংগিত-ব্যঞ্জনায় অজানা-লাবণ্যকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা। ব্যঙ্গার্থ দিয়েই কাব্যের এই কাজটি বিশেষরূপে সুসম্পন্ন হয়। এখন আবার প্রশ্ন হতে পারে বাচ্যার্থ দিয়ে কি এই সুন্দরের প্রকাশ সম্ভব নয়? উত্তরে বলা চলে বাচ্যের যখন অর্থ-বাহনের শক্তি রয়েছে তখন সুন্দরের প্রকাশ বাচ্যার্থকে দিয়েও সম্ভব—কিন্তু সে প্রকাশ একান্তভাবে সীমিত। কেননা বাচ্য-বাচক শক্তিদ্বারা আমরা লৌকিক সুখ দুঃখ যাকে প্রত্যক্ষ করি তাকেই প্রকাশ করি—কিন্তু তা' একটি সংকীর্ণ অর্থকে প্রকাশিত করে মাত্র। কিন্তু ব্যঞ্জনা বাচ্যের অতীত। তাকে বিশেষ কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এই জাতীয় শক্তির দ্বারাই লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের প্রবেশ ঘটতে পারে। বাচ্যের শক্তি সীমাবদ্ধ। একটি পরিচিত, সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই তার আনাগোনা। কিন্তু ব্যঞ্জনা শুধু একটি দীপ্তি, সে শুধু প্রকাশ করে এবং এই বন্ধনমুক্ত প্রকাশের শক্তি অসীম—ব্যঞ্জনা এখানেই দিগন্ত-হারা

অসীমের প্রতীক। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশই তার লক্ষ্য। এই ব্যঞ্জনাই ধ্বনি—ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ।

তবে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই বাচ্যার্থ হতেই এই ব্যঙ্গার্থের বা ব্যঞ্জনার্থের উৎ-পত্তি। রমণীর লাবণ্য তার অঙ্গসৌষ্ঠবের অতিরিক্ত—তবুও লাবণ্য অঙ্গ-সৌষ্ঠব দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সেইরূপ যে অর্থ ব্যঞ্জনার সাহায্যে ধ্বনিত হয় তার জন্ম ব্যাচার্থের গর্ভেই। আনন্দবর্ধন এই ব্যঞ্জনাকেই বলেছেন 'বাচ্যার্থপূর্বিকা'। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, আলোকপ্রার্থী যেমন দীপশিখায় যত্নবান হন তেমনি ব্যঙ্গার্থ লাভ করতে হলে একান্তভাবে প্রয়োজন বাচ্যার্থের। কেননা ব্যঙ্গার্থ লাভের উপায় বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থ হতে ব্যঞ্জনার বিকাশ। শব্দ, অর্থ নিজেদের গৌণ করে যেখানে অর্থান্তরকে প্রকাশিত করে ব্যঞ্জনার সূতিকাগর সেখানেই। বিভাব, অনুভাব, অলংকার দ্বারা বিভাসিত হয়ে এই ব্যঞ্জনা অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে। বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থকে অন্তরে গোপন রেখে অব্যক্ত মহিমায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি বাচ্যার্থের আশ্রয়ে অভিনব সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ যেন:

ধূপ আপনারে মিলাইতে চায় গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনাকে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ছুটিয়া ফিরে যেতে চায় সুরে।

ধ্বনিবাদীরা এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—বস্তুধ্বনি, অলংকার ধ্বনি এবং রস ধ্বনি। তবে এই তিনটি বিভাগ খুব স্পষ্ট নয়—দুরতিক্রমী তো নয়ই। বস্তু ধ্বনিতে যখন ধ্বনি থাকে তখন কেবল বস্তু প্রকাশিত হয় না—বস্তুকে অতিক্রম করে আরো কিছু প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ বস্তুধ্বনি কিংবা অলংকার ধ্বনি দিয়ে কেবলমাত্র বস্তু কিংবা অলংকারকে প্রকাশ করে না—প্রকাশ করে রসের। আর রসধ্বনিতে তো রস আছেই। সুতরাং কাব্যের সকল ধ্বনিই শেষ পর্যন্ত কমবেশী রস-বাহী।

'অজানাকে নিয়েই আমাদের সাহিত্য। এ কেবল ইংগিতে ও ব্যঞ্জনায়ই কতকটা সম্ভবপর। সংগীতে হোক, কথায় হোক, নৃত্যে হোক বা চিত্রে হোক প্রকাশ কিন্তু মুখ্যতঃ সংকেতে ও ইংগিতে। কথার মধ্যে সংগীতের সুর বা চিত্রের রূপ কতকটা ফুটে ওঠে বলেই কথার বা সাহিত্যের শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু সে শক্তি তো ইংগিত বা ব্যঞ্জনারই শক্তি। আমাদের লেখা মাত্রই

ইংগিত, কথা মাত্রই ইংগিত। ইংগিতই তো ধ্বনি, সৃষ্টিই তাই ধ্বনিময়। মহাকবিদের কাব্য এই ধ্বনির বাঙ্ময় প্রকাশ।

॥ আট ॥

॥ দ্রুতি কাব্য এবং দীপ্ত কাব্য ॥

নিখিল বিশ্বের অসংখ্য বস্তুপুঞ্জের সাথে আমাদের অন্তকরণের দু'টি সম্পর্ক আছে। একটি জ্ঞানময়, অপটি ভাবময়। প্রথমটি বোধময়, দ্বিতীয়টি আবেগময়। ইংরাজীতে এই সম্পর্ক দুটিকে বলা হয়েছে Knowing এবং Feeling। Knowing বা জানা ক্রিয়াতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবলভাবে কাজ করে। কার্য করণের সম্বন্ধ নির্ণয় সেখানে প্রধান কথা। Feeling বা ভাবাস্বাদন ক্রিয়াতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে হৃদয়—হৃদয়-বৃত্তি সেখানে অত্যন্ত সজাগ। বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে কার্যকরণ সম্বন্ধ নির্ণয় এখানে প্রধান নয়—অন্ধ আবেগে সকল কিছু অনুভব এবং বিশ্বাস করাই ভাবময় সত্তার প্রধান কাজ।

কাব্যস্বাদের সময়ও আমাদের চিত্তের এই দুইটি বৃত্তির যে কোন একটি প্রধান হয়ে ওঠে। অবশ্য কাব্যাস্বাদের মূল যে আনন্দ উভয় বৃত্তিতে তা' লভ্য। শব্দার্থের মিলন দ্বারা অন্তর্জগতে এক বিশেষ অলোড়নের ফলে সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মায়। এই আলোড়ন দুই রকমে সম্ভব। কাব্যের বস্তুপুঞ্জ দুই রূপে অমাদের চিত্তপুরে প্রবিষ্ট হয়—অর্থ রূপে এবং ভাব রূপে। আমাদের চিত্তবৃত্তিরও দুই রূপ—একটি হৃদয় ধর্মী অপরটি বুদ্ধি ধর্মী। বাইরের বস্তুপুঞ্জ অর্থ রূপে প্রবেশ করে চিত্তের বুদ্ধি অংশে আর ভাব রূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় হৃদয়লোকে। সুতরাং বুদ্ধি বা বোধ-বৃত্তি হ'তে জন্মায় অর্থ এবং ভাব বা হৃদয়-বৃত্তি হ'তে জন্মায় ভাব। অর্থ বুদ্ধি-স্থিত এবং ভাব হৃদয়-স্থিত। অর্থবোধের আনন্দ ঘটায় চিত্তের জ্ঞানময় উপলব্ধি আর ভাব-সঞ্জাত রসাস্বাদনের আনন্দ চিত্তকে বিগলিত করে। সুতরাং ঃ

১ ॥ দীপ্তিকাব্য তাকেই বলব, যে কাব্য বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত, হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্য অপেক্ষা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে বেশী পরিমানে বর্তমান। 'দীপ্'+ করণ বাচ্যে 'ক্তি' = দীপ্তি।

২ ॥ আর দ্রুতি কাব্য সেই ধরণের কাব্য যেখানে ভাব-সঞ্চার এবং রস-নিষ্পত্তির জন্য হৃদয় বিগলিত অথবা বিদ্রুত হয়ে যায়। 'দ্রব'+ করণ বাচ্যে 'ক্তি' = দ্রুতি।

এখন একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে উভয় কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে।

দীপ্তিকাব্য ॥ চিত্তে বুদ্ধির স্ফুরণ অর্থোপলব্ধির ভিতর দিয়াই ঘটে। কাব্য যখন বোধ বৃত্তিকে উদ্দীপ্ত কর্‌তে চায় তখন তার অর্থ ধর্মই আমাদের নিকট প্রধান আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। কবি যে কথাটি প্রকাশ করতে চান, সে কথাটি তিনি বিভাব অনুভাব দ্বারা আচ্ছাদিত করেই আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। আমাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় করেই তিনি কাব্যের আনন্দ বিতরণ করতে চান। আর বস্তুপুঞ্জের ভিতর হতে ধ্বনিত অর্থ উপলব্ধি করে পাঠক চিত্তে সৃষ্টি হয় রম্যবোধের। এই রম্যবোধ হতেই জন্মায় আনন্দ। আনন্দ-প্রবাহের উন্মাদ ধারায় পাঠক-চিত্ত-বেলা উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই অর্থ জটিল দার্শনিক তত্ত্ব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কাব্যের এমন কতকগুলি গুণ থাকে যা দার্শনিক তত্ত্বের নীরস মরুভূমিতে প্রবাহিত করে রসের ফল্গু প্রবাহ। দার্শনিক তত্ত্ব শুষ্ক কিন্তু সেই শুষ্ক তত্ত্বই কাব্যে রূপায়িত হলে সরস এবং সজীব হয়ে ওঠে। মানব-জীবনের বেগ নিয়ে বার্গসঁ যাই লিখুন না কেন তাঁর রচনা অনেকটা শুষ্ক বুদ্ধির মনন-ধর্মী-প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু সেই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ যখন নির্জ্জন ঝিলম নদীর তীরে সন্ধ্যার মায়াঘন রহস্য-নিবিড় পরিবেশ হতে উপলব্ধি করে বলাকার সারি-বদ্ধ বেগমান প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন তখন তা' হয়ে উঠ্‌লো রূপাল্পনা-সুষম কাব্য। সেই তত্ত্ব তখন আর কেবল নীরস দার্শনিকতার গণ্ডীতে পাণ্ডুর-ম্লান হয়ে রইলো না—রূপরস ভরা কাব্যের জগতে এসে হয়ে উঠ্‌লো সজীব ও প্রাণবন্ত। দাশনিক তত্ত্বে পুরোপুরি আত্মোপলব্ধি ঘটে না—কিন্তু কবি আপন প্রতিভাবলে আত্মোপলব্ধির পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর করে চিত্তকে ভগ্নাবরণ করতে পারেন। রহস্যময় জীবনের জটিল তত্ত্বগুলি দার্শনিকের জিজ্ঞাসা—কবিরও তাই। কিন্তু এই জিজ্ঞাসাই দার্শনিকের একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু কবির উদ্দেশ্য আনন্দ সৃষ্টি করা। দার্শনিক এই সমস্যা সম্পর্কে আপন ধ্যান-লব্ধ চরম কথা বলে দেন কিন্তু কবি কখনো চরম কথা বল্‌তে পারেন না। কবি সৃষ্টি করেন রমণীর অর্থ বা রম্যার্থ। এই রম্যার্থ হ'তে জাগে রম্যবোধ এবং রম্যবোধ থেকে আনন্দ। রস থেকেও আনন্দ জাগে কিন্তু রম্যবোধ আর রস এক নয়। বুদ্ধিস্থিত অর্থ থেকে জাগে রম্যবোধ কিন্তু হৃদয়-স্থিত ভাব থেকে জাগে রস। রম্যবোধ দীপ্তি কাযের সামগ্রী আর রস দ্রুতি কাব্যে প্রাণময় সত্তা।

দীপ্তি কাব্য আবার দ্বিবিধ—১॥ গৌরব কাব্য বা গৌরবোক্তি ২॥ বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি। যে কাব্যের মধ্যে অর্থগৌরব প্রধান তা' গৌরবোক্তি কাব্যের

অন্তর্গত আর যে কাব্যের মধ্যে বক্রতা বা বাক্-বৈদগ্ধ-পূর্ণ ভংগীই প্রধান তা বক্রকাব্য। অর্থ এবং অলংকার-ভেদ অনুযায়ী বক্রোক্তি আবার দু' প্রকারের হ'তে পারে—অর্থ-বক্রোক্তি এবং অলংকার-বক্রোক্তি। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে দীপ্তি-কাব্যের যে সমস্ত ভাগ করা হলো এ সমস্তই বুদ্ধি প্রধান। বুদ্ধি-দীপ্ত অর্থ ও অলংকার এ সকল কাব্যের প্রধান অবলম্বন।

দ্রুতিকাব্য॥ বস্তুজগৎ হ'তে ভাব (অর্থ নয়) চিত্তের হৃদয়াংশে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। এবং এই আলোড়নের 'ভাব' বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী দ্বারা পুষ্ট হয়ে অতিশয়তা প্রাপ্ত হলে রসে পরিণত হয়। রস'-এর আলোচনায় 'ভাব' বিভাবাদি দ্বারা কেমন করে 'রসে' পরিণত হয় সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। লৌকিক জগতের প্রেমাদি ভাবই কাব্যজগতে রতিয়াদি ভাবরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাব প্রকাশিত হলেই চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয় না। এই লৌকিক ভাব যখন কবির রচণায় অলৌকিকতা প্রাপ্ত হয় তখন তা' পরিণত হয় রসে এবং এই রস-প্রবাহই চিত্তকে বিগলিত ক'রে সৃষ্টি করে আনন্দের।

এখন স্বাভাবিক ভাবে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—কিসের গুণে দীপ্তিকাব্য মনকে বিগলিত করে আর কোনগুণেই বা দ্রুতিকাব্য চিত্তকে বিগলিত করে দেয়। উত্তরে বলা চলে দীপ্তি-কাব্য বুদ্ধি বা মনন প্রধান। বুদ্ধির দীপ্তি বেশী থাকায় একাব্য চিত্তকে বিগলিত না করে বুদ্ধির বা মনের দ্বারে আঘাত হানে। আর দ্রুতিকাব্য ভাব প্রধান—রস তার প্রাণ। রসের অফুরন্ত প্রবাহের জন্যেই তা' চিরসিক্ত, চিরসুন্দর—এবং এই জন্যেই সে চিত্তকে বিগলিত করে।

দ্রুতি কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—১॥ ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি ২॥ রসকাব্য বা রসোক্তি ৩॥ স্বভাবকাব্য বা স্বভাবোক্তি।

১॥ ভাবকাব্য: যেখানে শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধান আসন গ্রহণ করে, কিন্তু কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না—এমন কাব্যকে বলা হয় ভাবকাব্য।
২॥ রসকাব্য: শব্দার্থের অবলম্বনে যে কাব্যে ভাব রসে পরিণত হয় তা' রসকাব্য। বলাবাহুল্য এ কাব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩॥ স্বভাবকাব্য: যে কাব্যে বস্তু নিজ স্বভাবধর্মে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, বস্তুর ভাব ধর্মই যেখানে প্রধান এমন কাব্যকে বলা হয় স্বভাবকাব্য।

॥ নয় ॥

॥ দ্রুতি ও দীপ্তি কাব্য কী পরস্পর বিরোধী ॥

আমাদের পুর্বোক্ত আলোচনা হতে আমরা দ্রুতি এবং দীপ্তি কাব্যের যে পরিচয় পেয়েছি তা'তে উভয় শ্রেণীর কাব্যকে পরস্পর বিরোধী বলেই মনে হয়। একটি অর্থ-প্রধান, অপরটি ভাব-প্রধান। একটি বুদ্ধি-দীপ্ত, অপরটি হৃদয়ধর্মী। একটি রম্যবোধে উদ্দীপ্ত অপরটি রসবোধে সিক্ত। সবটাই সত্য কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অর্থ এবং ভাব পরস্পরের সাথে সম্পর্ক-ছিন্ন, বুদ্ধি এবং হৃদয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, রম্যবোধ এবং রস পরস্পর বিরোধী। উভয় প্রকার কাব্যের উৎসমূল এক, বিশ্বের বাস্তুপুঞ্জ হ'তে উভয়ের উৎপত্তি। আবার উভয়ের পরিণতিও আনন্দে। সুতরাং উৎস এবং পরিণতি যে কাব্য-দ্বয়ের এক তারা পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে কী করে? বস্তুতঃ ভাব এবং অর্থ সম্পর্ক যুক্ত, রস এবং রম্যবোধ চিত্তকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। আদিম জৈব-ধর্মের সাথে উন্নত বুদ্ধি-বৃত্তির সহয়তায় মনুষ্যত্বের সৃষ্টি। এই জন্য হৃদয়বেগ মানুষের চিত্তে কখনো আদিম-রূপে থাকতে পারেনা, অসংখ্য জটিল বৃত্তির সাথে যুক্ত হয়ে তা' একপ্রকার দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে। স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তির সংমিশ্রণটাই বেশী। তা ছাড়াও দ্রুত কাব্যের প্রধান উপকরণ যে অন্ধ আবেগ—তা' অন্ধ নয়, অন্ততঃ অন্ধরূপে কাব্যে প্রকাশ পায় না। এই আবেগকে কাব্যে প্রকাশ করতে গেলেই কবিকে ভার-সংহতি এবং অর্থ-সংহতি সম্পর্ক সচেতন হতে হয়—এবং সেখানে অন্ধ আবেগ নয় বুদ্ধি ধর্ম প্রধান হয়ে ওঠে। দ্রুতিকাব্যেও সে জন্য আসে দীপ্তিকাব্যের অলংকার এবং বক্রোক্তি ইত্যাদি। এখানে দ্রুতিকাব্য অনেকখানি দীপ্তি কাব্যের সমধর্মী। আবার রম্যবোধও অনেক ক্ষেত্রে রসকে আশ্রয় করেই বেড়ে ওঠে। আমরা পূর্বেই বলেছি দীপ্তি কাব্য জীবন-রহস্যের জটিলতম সত্তার বুদ্ধি-দীপ্ত প্রকাশ। জীবনের গভীর রহস্য যে কাব্যের মূল উৎস সেখানে বিস্ময়রস আসতে বাধ্য। 'বলাকা' কাব্য পড়ে এই জন্যেই আমরা বিস্ময়-বিমণ্ডিত হয়ে উঠি, বিস্ময়-রস আমাদের সমগ্র মনপ্রাণকে দুলিয়ে দেয়। এখানে দীপ্তিকাব্য বিস্ময় রস-সিক্ত হয়ে দ্রুতিকাব্যের সীমা-স্পর্শী হয়ে উঠেছে। দীপ্তিকাব্যে এই বিস্ময়-রস গৌণ হ'তে পারে কিন্তু তবুও তা' বর্তমান এবং সেখানে সে বুদ্ধিবৃত্তির কাজ না করে হৃদয় বৃত্তির কাজই করে।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্রুতিকাব্য রসপ্রধান এবং তা' হৃদয়কে বিগলিত করে—একথাই আমরা বলেছি। কিন্তু

এমন কতকগুলি রস আছে যেগুলি চিত্তকে বিগলিত না করে বুদ্ধি-প্রধান কাব্যের মত তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। করুণ এবং শৃঙ্গারাদি রস চিত্তকে বিগলিত করে সত্য কিন্তু বীর রস চিত্তকে বিগলিত করা অপেক্ষা উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে তোলে বেশী। সোজা কথায় দ্রুতিকাব্যের মধ্যেও দীপ্তিকাব্যের গুণ বর্তমান এবং দীপ্তিকাব্যের গুণও দ্রুতিকাব্যের মধ্যে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। রম্যবোধ-প্রধান কাব্য হলেও হৃদয় তাতে কিছু সাড়া না দিলে তা' শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্বের মত চিরদিন রস-বোদ্ধা পাঠক কর্তৃক উপেক্ষিত হ'তো। এ দৃষ্টিতে দেখলে দ্রুতি এবং দীপ্তি কাব্যের সু-উচ্চ ব্যবধান সীমারেখা অনেকখানি নিম্ন হয়ে পড়ে, হয়তো বা অবলুপ্তই হয়।

॥ দশ ॥

শব্দ ও অর্থ : কুন্তক ॥

কাব্য কী? কাব্যত্ব কোথায়—এই প্রশ্ন সাম্‌নে রেখে প্রাচীন ভরতের আচার্যগণ নানাভাবে এর সমাধানের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ভরতমুনি হ'তে রসগঙ্গাধর পর্যন্ত একদল পণ্ডিত রস ও ধ্বনির উপর বৈশিষ্ট্য আরোপ করে কাব্যের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। আবার অনেকে কাব্যের উপাদান অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের ব্যপক আলোচনায় কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হয়েছেন। শেষোক্ত সমালোচকদের বলা হয় আলংকারিক।

যা' হোক প্রাচীন আলংকারিকেরা শব্দ ও অর্থের আলোচনায় জোর দিয়েছেন শব্দার্থের বাহ্যিক সম্বন্ধের ওপর। ভামহ হ'তে আরম্ভ করে একাদশ শতাব্দীতে কুন্তকের সমসাময়িক ভোজরাজ পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধের যে সূত্রটুকু আবিষ্কৃত হয়েছিল তা' ছিল একান্তভাবেই ব্যাকরণগত। শব্দ বাচক এবং অর্থ বাচ্য। এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের ব্যাকরণগত গণ্ডী অতিক্রম করে এদের অন্তর্নিহিত ভাবময় সূক্ষ্ম এবং সুকুমার কাব্যসম্বন্ধটি তাঁদের বিশ্লেষণে প্রকাশ পায়নি।

'শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম্'—ভামহের এই বহুখ্যাত উক্তিটি মম্মট, রুদ্রট, বিদ্যাধর ইত্যাদি পণ্ডিতগণের মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল—কিন্তু তাঁরা কেউই উক্তিটির বহিরঙ্গ ছাড়া অন্তরঙ্গে আলোকপাত করতে সমর্থ হননি। অন্তরঙ্গের দিকে সর্বপ্রথম আলোকপাত করার আভাস ফুটে উঠেছে সুপণ্ডিত ভোজরাজের আলোচনাতে। প্রাচীনধারার অনুসরণে শব্দ ও অর্থের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ ছাড়াও অলংকারগত সম্বন্ধকে মেনে নিয়েছেন। শব্দ ও

অর্থের পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন হলে মাধুর্য বজায় থাকে তা তিনি কয়টী সম্বন্ধের মধ্যেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁর দৃষ্টি শব্দ অর্থের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অপেক্ষা বহিরঙ্গ সম্পর্কের দিকে নিবদ্ধ ছিল বেশী।

ভোজরাজের সমসাময়িক কুন্তকই সর্বপ্রথম নতুন দৃষ্টি ভংগিতে শব্দ ও অর্থের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেন। ইতিপূর্বে শব্দ ও অর্থের বহিরঙ্গগত এবং অলংকারগত যে সূত্র নির্ণীত হয়েছে তা' নির্ভুল—কিন্তু এই নির্ভুল সূত্র ছাড়াও শব্দ ও অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক-নির্ণয়ে যে অন্তরঙ্গ সন্ধানটির বড় অভাব ছিল তা' পূরণ করলেন কুন্তক। কাব্যের প্রধান কথা আনন্দ-সৃষ্টি করা। শব্দ ও অর্থের কোন রহস্যময় সম্মিলনের ফলে রসিক-চিত্ত আনন্দে প্লাবিত হয়ে যায় 'বক্রোক্তি-জীবিত' নামক কাব্য-গ্রন্থে সেটাই কুন্তক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কুন্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এখানে যে তিনি তাঁর আলোচনার পুরোভাগে আনন্দ সঞ্চারকে রেখে শব্দার্থের মিলনজাত কাব্যজগৎ বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

কুন্তকের প্রধান সূত্রগুলি এবং তার অর্থ প্রথমে উদ্ধৃত করে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হবো।

১॥ শব্দার্থৌ সাহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনী।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥

'সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞ-গণের আহ্লাদ-জনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনা-বন্ধে বিন্যস্ত হলে কাব্য হয়ে থাকে।'

২॥ সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্।

'সাহিত্য হচ্ছে সহিত দুটির ভাব।'

৩॥ সাহিত্যম্ অনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ॥

'সাহিত্য হলো শব্দার্থ-যুগলের এক অলৌকিক বিন্যাস-ভংগী, যা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারী হয় এবং শোভাশালিতা প্রাপ্ত হয়।'

শব্দ এবং অর্থের মিলন হবে অতিরিক্ততা বর্জিত এবং তা' হলেই বাক্য মনোহারী এবং শোভাশালিতা প্রাপ্ত হবে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ মিলন ব্যাকরণ বা অলংকার শাস্ত্রের নির্ধারিত মিলন নয়। এ মিলন হলো নিয়ম-নীতির গণ্ডীর অতীত। তবে নির্দিষ্ট করে বল্‌তে গেলে এইটুকু বলা চলে এ মিলন হলো বাহুল্য-শূন্য মিলন। শব্দ এবং অর্থ সমানভাবে মিলিত হবে—কোনটিও কোনটিকে ছাড়িয়ে যাবে না। কবিওয়ালাগণের

রচনায় অনুপ্রাসের এবং যমকের অতিঘটা অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় তা' কবিতা হয়নি। বাহুল্য বর্জ্জিত হয়ে ঠিক যেমনটি ভাবে মিলিত হলে বাক্য মনোহারী এবং শোভাশালী হয়ে ওঠে ঠিক তেমনটি মিলনের কথা কুন্তক বলেছেন।

ভোজরাজ বারটি সম্বন্ধের উল্লেখে শব্দার্থের মিলন সম্বন্ধকে যতটা না সীমাবদ্ধ করতে পেরেছেন কুন্তক বাহুল্যহীনতার কথা বলে তার চেয়ে প্রকাশ করেছেন অনেক বেশী। বাইরের দিক থেকে অভিধা, বিবক্ষা প্রত্যেকটি গুণের বিচার না করে শব্দ ও অর্থের নিজস্ব ধর্ম্মের ভিতরে যে বিশেষ গুণগুলি অন্তর্লীন হয়ে আছে "পরস্পর স্পর্দ্ধিত রমণীয়" ইত্যাদি কথার দ্বারা তাদের সম্বন্ধের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনাও সুন্দররূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এজন্য কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীনভারতে কুন্তকের দান অনেক উপরে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-আলেচনায় কুন্তক আর একটি গভীর কথা বলেছেন। তাঁর মতে শব্দ-অর্থের মাঝেই নিহিত থাকে আহ্লাদ—আনন্দের বীজ।

শব্দার্থযুগলের নিবিড়-গভীর-মিলন-স্পন্দনে কাব্যত্বের গভীরতা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। শব্দার্থের সম্বন্ধের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি দুই সুহৃদের উপমা দিয়েছেন। দুই সুহৃদ যেমন পরপস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত অথচ কেউ কারো তুলনায় নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নয়, তেমনি শব্দ ও অর্থজাত গুণ ও অলঙ্কারের সমান শোভাবৃদ্ধিতে শব্দার্থের কাব্য-সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে ওঠে। সুহৃদযুগলের মত শব্দার্থ শত্রুভাবাপন্ন নয়—মিত্রতার সুগভীর মমতায় আবদ্ধ।

কুন্তক কিন্তু এখানেই থামেননি! তিনি অধিকতর অগ্রসর হয়ে বলেছেন শব্দ ও অর্থের কেবল কাব্যবিকাশ হলেই চলবেনা—লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাব্যপ্রবাহের অখণ্ড সুরের তাল ভঙ্গ না হয়। অর্থের মৃতকল্পত্ব ঘুঁচিয়ে প্রাণ দিতে পারে সমুচিত শব্দ আবার শব্দের ব্যধি বিতাড়ন করে বাক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে সমুচিত অর্থ—ভাল কথা কিন্তু যদি মূল সুরের তাল ভঙ্গ হয়ে যায় তা'হলে এই মিলনের কোন অর্থ হয় না। সঙ্গীত যেমন একটি সুরলোকের মাধ্যমে মায়ার জগৎ সৃষ্টি করে, শব্দ ও অর্থও তেমনি কবি প্রতিভার বলে কাব্যের ঘনসংবদ্ধ অবিছিন্ন জগৎকে রস-পুষ্ট করে তোলে। সুতরাং ভাবের বিচ্যুতি এবং রস পুষ্টিতে ব্যাঘাত না ঘটতে পারে এমন ভাবে শব্দার্থ চয়ণ করাই কবির কাজ।

এখানেও কুন্তকের ব্যাখ্যা শেষ হয়নি। এর উপরে তিনি এক উদার যুক্তির ক্ষেত্রে কাব্যের সকল উপাদানকে একত্রিত করেছেন। কেবল শব্দ-অর্থ নয়, কাব্যের মধ্যে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন অর্থাৎ বৈদর্ভী প্রভৃতি মার্গ, মাধুর্যাদি গুণ, অলংকার-বিন্যাস, বক্রতা-বিন্যাস, বিচিত্র-বৃত্তি ও ঔচিত্য, বিবিধ রস প্রত্যেকেরই শুধু শব্দ এবং অর্থের সঙ্গে নয়—পরস্পরের সঙ্গে সার্থক সংযোগের প্রয়োজন। এই ভাবে সকলের সাথে সকলের ঐকান্তিক মিলন সুসম্পন্ন হলে, লেন-দেন সমাপ্ত হলে, অঙ্গে সুষমা এবং চিত্তে সুসামঞ্জস্য স্থাপিত হলে কাব্যের মধ্যে 'অদ্ভুতামোদচমৎকার' পরিবেশ আপনি সৃষ্ট হয়।

কুন্তকের মতের ত্রুটি ॥ যে উদার পটভূমিতে কুন্তক আপন মত ব্যক্ত করেছেন তার বিরুদ্ধে যে কোন কথা বলা যায় এমনটি আমরা সাধারণে কল্পনাও করিনে। কুন্তকের আলোচনা প্রাচীনযুগে তো অভিনব বটেই—বর্তমানযুগেও এঁর আলোচনার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু তাহলে কী হবে—নিন্দুক পিছুনেই। দুদিক থেকে আলোচনা করে কুন্তকের ব্যাখ্যার ত্রুটি ধরা পড়লো। প্রথমতঃ শব্দের সঙ্গীত ধর্মের কথা যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, তেমন অর্থের চিত্রধর্মের কথা উল্লেখ করেননি। শব্দ ও অর্থের বাহুল্য বর্জ্জিত মিলনের কথা তিনি বার বার বলেছেন তথাপি তাঁর আলোচনায় মনে হয় অর্থকে গৌণ করে শব্দকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ শব্দ ও অর্থের মিলন-সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যে তিনি যে সুহৃদযুগলের উপমা দিয়েছেন তা' ভুল না হলেও ত্রুটীপূর্ণ। এখানে কালিদাসের পার্বতী-পরমেশ্বর বা প্রেমিক-প্রেমিকার উপমাটি দিলে সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত এবং মনোহর হয়ে উঠ্‌তো। শব্দ ও অর্থের মিলন যেখানে অপূর্ব সেখানেও শব্দ ও অর্থ একাত্মা বা একদেহী নয়—সেখানেও উভয়ের মাঝে জাতিভেদ আছে। শব্দ শ্রবণের পর তবে অর্থের উদয় হয়—শব্দ-অর্থ একাত্মা হয় না কখনোই। উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। দুই সুহৃদের উপমার মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে যেখানে 'জাতিভেদ' আছে সেখানে—দুই সুহৃদের 'জাতিভেদহীন' উপমা সঙ্গত নয়। সুহৃদযুগলের উপমা অর্থের সাথে অর্থের, বাক্যের সাথে বাক্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে পার্বতী-পরমেশ্বরের উপমা সর্বাপেক্ষা সুসংগত। কেননা শব্দ ও অর্থের মত পার্বতী ও পরমেশ্বরের মধ্যে জাতিভেদ আছে—অথচ উভয়ে বিচ্ছিন্ন নন, একে অপরের শক্তিদাতা, পরিপূরক।

॥ এগার ॥

॥ বক্রোক্তি বাদ : কুন্তক ॥

প্রাচীন ভারতে আচার্যগণ-আলোচিত কাব্যলক্ষণ নিরূপণের দু'টি ধারার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। ভরতমুনি হতে শুরু করে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, বিশ্বনাথ ইত্যাদি ধ্বনিবাদী এবং রসবাদীগণ সকলেই রসস্ফুরণ হতেই আনন্দ উপলব্ধির কথা বলেছেন। রসবাদের পাশাপাশি ধ্বনিবাদও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, অন্ততঃ নবম শতাব্দীর আনন্দবর্ধন অবধি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসবাদের করালগ্রাসে ধ্বনিবাদকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয় আর একদল পণ্ডিত কাব্য-স্বরূপের বিচার করেছেন রসনিষ্পত্তির দিক থেকে নয়— শব্দ ও অর্থের সম্মিলনের দিক থেকে। কুন্তক এই দলের মধ্যে পুরোধা। আনন্দবর্দ্ধনের পর দু'টি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে—এলেন অভিনব গুপ্ত। কুন্তক অভিনব-গুপ্তের সমসাময়িক। অভিনবগুপ্তের হাতে রসবাদের ঘটে চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। রসবাদের এই প্রবল তরঙ্গের মধ্যে কুন্তকের আবির্ভাব একান্ত দুঃসাহসিক বললেও অনুচিত হয় না। যে সময় আলংকারিদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে সকলেই মনে করেছিলেন সে সময় কুন্তকের আবির্ভাবে সকলেই বিস্মিত হলেন। তিনি এক নতুন দৃষ্টি ভংগীতে কাব্যের আঙ্গিক-সম্বন্ধীয় আলোচনার সূত্রপাত করলেন।

কাব্যের প্রকরণ বিচারে কুন্তকের ঘোষণা: "বক্রোক্তিঃ কাব্য জীবিতম্"— বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। এই বক্রোক্তি কী?

শব্দার্থচয়ন এবং বিন্যাসের ভংগীকেই তিনি বলেছেন বক্রতা আর বৈদগ্ধপূর্ণ ভংগী সহকারে ভনিতি অর্থাৎ উক্তির নামই বক্রোক্তি—"বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধভংগী ভনিতিরুচ্যতে।" এই সংজ্ঞা হ'তে আমরা বক্র উক্তির দুটি লক্ষণ প্রাপ্ত হই— একটি বৈদগ্ধময়ত্ব এবং অপরটি ভংগীময়ত্ব। একটি হল কবি-কর্মকৌশল বা সুনিপুন কবি-কর্ম, যা' দ্বারা বুঝা যায় কবি-প্রতিভার পরিকল্পনা-শক্তি। দ্বিতীয়টি হলো লক্ষণ-ভংগী যা' দ্বারা উক্তির বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করা যায়। নিপূণ কবি-কর্মের সাথে যুক্ত হবে উক্তির মনোহারিত্ব, চারুত্ব-সৌন্দর্য। বৈদগ্ধের উপরেই কুন্তকের পক্ষপাতিত্ব বিশেষ রকমের। রস অথবা ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আলোচনা করেননি। যেখানে করেছেন বক্রোক্তির সাথে এক করে রস ও ধ্বনির আলোচনা করেছেন। বলেছেন বক্রতার সাথে একাত্ম বা সম্পর্কযুক্ত না হলে অলংকার, রস বা ধ্বনি কোনটিরও চরমোৎকর্ষ লাভ সম্ভব

নয়। কাব্যের কোন বিষয় বস্তুই সরলভাবে সোজাসুজি বলা যায় না। কবির মনোজগৎ থেকে যখন কাব্যজগতের উৎপত্তি তখন বস্তুর স্বাভাবিকত্ব বলে কিছু নেই। প্রতি বস্তুই কবির স্বভাবে সমাচ্ছন্ন। এখানে কুন্তক স্পষ্টরূপেই স্বভাবোক্তিকে অস্বীকার করেছেন। ধ্বনিকে বলেছেন বক্রোক্তির একটি রূপমাত্র। বস্তুতঃ কুন্তকের বক্রোক্তিবাদে কাব্যের আংগিক আলোচনার সকল বিষয়ই কিছু না কিছু বিধৃত হয়েছে—সকল কিছুরই এ এক বিশাল রূপ। সে জন্যে বক্রোক্তিবাদ কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে এক বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদার অধিকরী।

॥ চর্যাপদ ॥

॥ এক ॥

॥ চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ রত্ন-গর্ভা অজন্তা। অজন্তার আবিষ্কারে যেমন শিল্প সুষমামণ্ডিত সমৃদ্ধশালী বিশাল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সাথে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটেছে তেমনি এই চর্যাপদের আবিষ্কার আমাদের বিস্মৃত দৃষ্টির সম্মুখে বাংলা সাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টি ধারার গোপন উৎস-মূল খুলে দিয়েছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক নিদর্শন। প্রকৃত এবং অপভ্রংশের ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল আলোড়ন বিবর্ত্তনের স্তর অতিক্রম করে সবে মাত্র যখন বাংলা ভাষা মাতৃগর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছে জীবনের সেই উষালগ্ন হতেই আপন শক্তির অকৃপণ সহায়তায় সে অসংখ্য কবিকুলের গোপন মনের ধ্যান-ধারণাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে, তাদের অন্তরে দিয়েছে সৃষ্টির বেগ। চর্যাপদ সেই সৃষ্টি বেগের প্রথম ফসল। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যূষকালে আলো-আঁধারীর মিলন-লীলায় সে অসংখ্য কবিকণ্ঠে ভোরের শান্ত আকাশ কাকলীমুখর হয়ে উঠেছিল তাঁদের চব্বিশ জনের কণ্ঠমাধুর্য আমরা চর্যাপদের মাধ্যমে উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের প্রাথমিক আত্ম স্ফুরণে ধর্মচেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের হয়েছে প্রারম্ভিক আত্মবিকাশ, বাংলা সাহিত্যেও এই সাধারণ ধর্মের ব্যতিক্রম নয়। চর্যাপদের মুখ্য রাগিনী তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে বেজে উঠেছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং মতকে চর্যাপদের ছন্দ-বন্ধনে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই নীরস ধর্মতত্ত্বের মধ্যে চর্যার সাহিত্যিক মূল্য নিহিত নেই, সাহিত্যের বিশেষ রসমূল্য সেখানে—যেখানে চর্যার সকল তাত্ত্বিক-তার্কিকতা কবির ব্যক্তিগত হৃদয়োপলব্ধির আনন্দের অন্তরালে আত্মগোপন করে ছন্দোবদ্ধ সুর মূর্চ্ছনায় 'গান' হয়ে উঠেছে। চর্যাকারগণ আপন ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে কেবলমাত্র লিপিবদ্ধ করতে চাননি তাঁরা চেয়েছিলেন আপন ধর্ম-মহিমাকে গণচিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে। ধর্ম পালনের মধ্যদিয়ে তাঁরা আপন হৃদয়ে যে আনন্দোপলব্ধি করেছিলেন সেই সীমাতিক্রমী আনন্দ বেগকে আপন হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখা আর তাঁদের

পক্ষে সম্ভব হয়নি—তার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেই হৃদয়োপলব্ধি-জাত সত্যকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে চর্যাকারগণ সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছেন। 'ধর্মের নীরস তত্ত্ব কথাকে—হোক সে হৃদয়োপলব্ধিজাত সত্য—এই সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলার মধ্যেই রয়েছে এক ঐন্দ্রজলিক-স্পর্শ। এই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শেই চর্যাকারগণের রুক্ষ ধর্ম-তত্ত্ব ও অন্তর গূঢ় সাধন পদ্ধতি সকল রুক্ষতা ও কর্কশতার সীমা অতিক্রম করে 'সুন্দর' হয়ে উঠেছে। এই 'সুন্দর' হয়ে উঠার পিছনে আমরা যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের কথা বল্‌লাম তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই চর্যার-সাহিত্যিক মূল্য আমাদের নিকট আপন মহিমায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌বে।' বস্তুতঃ এই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শই হলো সাহিত্যের স্পর্শ, কবিতার প্রাণ-স্পন্দনী হ্লাদিনী শক্তি।

কবিতার এই প্রাণ-সঞ্চারিণী হ্লাদিনী শক্তি আত্মগোপন করে থাকে কবিতার ছন্দ-অলংকার, উপমা-রূপক, ভাব-রস ইত্যাদির মধ্যে।' সুতরাং চর্যার এই হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ-উদ্ঘাটনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে চর্যার ছন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ক ॥ চর্যার ছন্দ :— যে সময় (৯৫০-১২৫০ খৃঃ) চর্যাগুলি রচিত হয়েছিল সে সময় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। 'কিন্তু চর্যাপদ-গুলি আশ্চর্যভাবে সংস্কৃতের প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে ভিন্নপথে পদচারণা করেছে। সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে চর্যাকারগণ সর্বপ্রথম সংস্কৃতের সর্বগ্রাসী কবল হতে মুক্ত হয়ে ছন্দের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন। সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে চর্যাকারগণ মাত্রাবৃত্ত রীতির ধ্বনি প্রধান ছন্দে পদ রচনা করেছেন—যে ছন্দের আর এক নাম পাদকুলক।' এই পাদকুলক ছন্দ হতেই পরবর্ত্তীকালে বাংলার সুবিখ্যাত পয়ার ছন্দের জন্ম। 'সংস্কৃতে সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাসের প্রচলন নেই—চর্যাপদের প্রায় সকল পদই এই অন্ত্যানুপ্রাসের অসীম আনন্দে নৃত্যচপল হয়ে উঠেছে।) ১নং চর্যা থেকেই উদাহরণ নেওয়া যাক:

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পাইঠা কাল ॥

'বাংলা কাব্য সাহিত্যে পয়ার এবং ত্রিপদীর প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। সুদূর অতীত কাল হতে আধুনিক পূর্বযুগ পর্যন্ত এই দুই ছন্দই বাংলা কবিতার প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই চর্যাপদই হল এই বহুখ্যাত ছন্দের সূতিকাগার। চর্যার বুকেই এদের জন্ম। চর্যার ছন্দ-রীতিকে

অনুসরণ করে পরবর্তী কালে বাংলায় এই দুই ছন্দ গড়ে ওঠে। ত্রিপদীর ক্রম-বর্দ্ধমান ধ্বনির স্পন্দনে চর্যার অনেকগুলি পদ সুন্দর হয়ে উঠেছে :

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌-গুরু-পাঅ পসাত্রঁ জাইব
পুণু জিণউরা॥

পয়ারের একটি উদাহরণ :

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। ১৩
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ ১২

অবশ্য চর্যার ছন্দে যে দুর্বলতা নেই তা নয়—বরং অনেক ক্ষেত্রে বহু ত্রুটী, বহু দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। উপরে যে পয়ারের উদাহরণটি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে অক্ষর সমতা নেই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন চর্যাগুলি গীত হতো প্রতিটি চর্যার শীর্ষদেশে রাগ রাগিণীর উল্লেখে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ফলে সুরের টানে এবং বিবিধ রাগ-রাগিণীর বিচিত্র তালে এই অক্ষর অসমঞ্জস্য কখনো প্রধান হয়ে উঠ্‌তো না—সুর-মূর্চ্ছনার অন্তরালে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যেতো। সেই সুদূর অতীতকালে যখন বাংলা কাব্য-রীতির কোন আদর্শই গড়ে ওঠেনি সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে চর্যাকারগণ যে প্রায় দুর্বলতা হীন এমন সংগীতধর্মী বলিষ্ঠ পদ ও ছন্দ রচনা করতে পেরেছেন এতো একান্তভাবে তাঁদের শিল্প-সুষম মনোভংগীরই পরিচায়ক।

অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা বাংলায় বিবিধ ছন্দের নামকরণ করা হয়ে থাকে—চর্যা হতেই এই রীতির সূত্রপাত। ৪৯ নং চর্যায় 'আজি ভুসু বাঙ্গালী ভইলী'তে 'দশাক্ষরা বৃত্তি' ছন্দের পরিচয় সুস্পষ্ট। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রচলন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস প্রচলিত এবং দৃঢ় হয়েছে—কিন্তু সুদূর অতীতকালে বাংলা ভাষার গঠমান যুগের চর্যাপদে আমরা এই রীতির প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাই। ১০ম এবং ৫০শ সংখ্যক চর্যা দুটি আমাদের মন্তব্যের পরি-পোষক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রকাশ ভংগীকে বাংলা ছন্দের আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় গীতগোবিন্দের বহু ছন্দ তদপেক্ষা পূর্বে রচিত চর্যাপদেরই অনুরূপ। একটি উদাহরণে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে :

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
ধীর-সমীরে। যমুনা-তীরে। বসতি বনে বন-। মালী।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
পীন পয়োধর। পরিসর-মর্দন। চঞ্চল-করযুগ-। শালী॥

॥ গীতগোবিন্দ ॥

তুলনীয়ঃ

২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ২
উঁচা উঁচা। পাবত তহিঁ। বসঙ্গ সবরী। বালী।

২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ৩ ২ ২ ২
সোরঙ্গি পীচ্ছ। পরহিণ সবরী। গিবত গুঞ্জরী। মালী॥

॥ চর্যা—২৮নং ॥

সুতরাং গীতগোবিন্দে নয় চর্যাতেই বাংলা ছন্দের আদিমতম রূপের সন্ধান করা উচিত। কেননা চর্যা একদিকে যেমন প্রাচীনতম অন্যদিকে তেমনি বাংলার সমপ্রকৃতি ছন্দও সেখানে বিরল নয়।

খ ॥ অলংকার ঃ

কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ—এই যদি হয় কাব্যের সংজ্ঞা তা হলে চর্যাপদকে কাব্যের দিগন্ত হতে বহিষ্কারের কোন স্পর্ধা আমাদের নেই। চর্যার নিরাভরণ দেহ অলংকারের অভীনব দীপ্তিতে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। অলংকার দু'প্রকার—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। বলাবাহুল্য এই উভয়বিধ অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে রুক্ষ তত্ত্বাশ্রয়ী চর্যার প্রতি অঙ্গ সৌন্দর্য-সুষম হয়ে উঠেছে।

শব্দালংকারের মধ্যে যমক ও অনুপ্রাস সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুপ্রাসের জন্যেই আমরা মূল চর্যার অর্থ বুঝি বা না বুঝি শব্দের বিরামহীন ঝংকার আমাদের চিত্তে অপূর্ব শিহরণ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং শ্রবণ পথের তৃপ্তি ঘটায়। নিম্নের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই আমরা চর্যাকারগণের অনুপ্রাস প্রয়োগের নিপুণতা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবো ঃ

সঅল সঁমাহিঅ কাহি করিঅই।··· ॥ চর্যা—১নং ॥

সঅ-সম্বেঅণ সরুঅ-বিআরেঁ
অলক্খলক্খণ ণ জাই।··· ॥ চর্যা—১৫নং ॥

নিরন্তর গঅনন্ত তুসে ঘোলাই··· ॥ চর্যা—১৩নং ॥

ছাআ মাআ কাআ সমাণা ॥··· ॥ চর্যা—৪৬নং ॥ ইত্যাদি।

অর্থালংকারের মধ্যে উপমা এবং রূপকের রূপময় প্রয়োগ চর্যার অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে সুন্দর এবং ব্যঞ্জনাম্বিত করে তুলেছে। চর্যা-সাধকগণ জন-চিত্তের কাছে আবেদনশীল করার জন্যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তাই

তাঁরা সংস্কৃত-অলংকার শাস্ত্রানুমোদিত অলংকরণকে উপেক্ষা করে প্রাত্যহিক চলমান জীবনের অতিপরিচিত পরিবেশ হতেই অলংকার সংগ্রহ করে গণচিত্তের সম্মুখে আপন ধর্মের দুরূহ ও গূঢ় নীরস সাধন-তত্ত্বগুলিকে স্পষ্টালোকে মেলে ধরেছেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ কেবল তত্ত্বমাত্র, তার কোন বাস্তব রূপ নেই, কিন্তু সহজিয়ারা এর নামকরণ এবং রূপপ্রদান করেছেন এমন কী বাসস্থান নির্দেশ করতে ভোলেন নি। মোট কথা সহজিয়াগণ নির্বাণের একটী বাস্তবরূপ কল্পনা করে বাস্তব উপমা ও রূপকের মাধ্যমে তার সহজতম রূপটি গণচিত্তের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই নির্বাণকে তাঁরা বলেছেন নৈরাত্মদেবী—নামান্তরে ডোম্বী, শবরী বা চণ্ডালী। এই নির্বাণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়—সুতরাং এঁর বাসস্থান দেহনগরীর বাইরে দূরে পর্বতের উঁচু টিলায়। বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় প্রকার জীবকে নিয়ে ক্রীড়া করেন বলে ইনি নষ্ট চরিত্রা যুবতী বলেও কল্পিত হয়েছেন। নষ্ট চরিত্রা এক যুবতী দূর পর্বতের উঁচু টিলায় নির্জনে একাকী বাস করে—এর অন্তর্নিহিত মর্ম যাই হোক সাধারণকে আকর্ষণ করার জন্যে এই টুকুই যথেষ্ট। সুতরাং এই প্রকার বাস্তব-উপমা যেন চর্যাকারগণের হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত লক্ষ্যভেদী বাণ—এর নিক্ষেপ অব্যর্থ। এ ছাড়াও ডোম্ ডোমনীর যুগল প্রেম-সংগঠন, নৌকা বাওয়া, সাঁকো তৈরী, চ্যাঙাড়ী-বোনা, তুলোধনা ইত্যাদি যে চিত্রগুলি ধর্মের গূঢ় সংকেতকে আভাসিত করেছে—সেগুলিও চর্যাকারগণ বাস্তব পটভূমি হতেই গ্রহণ করেছেন। অসংখ্য রূপকের প্রয়োগ চর্যার গূঢ় মর্মকে রসরূপের মাধ্যমে সদাজাগ্রত রেখেছে। প্রথম চর্যায় কায়াকে তরুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় চর্যায় নৈরাত্ম সাধকের বধূরূপে কল্পিত, তৃতীয় চর্যায় মদের দোকানে তাঁকে শুড়ি বধূর সাথে তুলনা করা হয়েছে, পঞ্চম চর্যায় পার্থিব জীবন চলমান নদীর সাথে কল্পিত, ষষ্ঠ চর্যায় চর্যা-সাধক-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে হরিণ শীকারের উপমায়। সুতরাং চর্যার সর্বত্র উপমা-রূপকের বহুল প্রয়োগ তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কথাকে সুন্দর সহজতম রসরূপ দান করেছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশে সাধারণ জীবন পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে সেই অনুভূতিকে সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছে। সাহিত্যে একেই বলে সাধারণী কারণ।

"চর্যাগুলি সন্ধ্যাভাষায় রচিত। সন্ধ্যাভাষা আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার।" এ ভাষায় সন্ধ্যার ম্লান গোধূলি লগ্নের মত এক গভীর রহস্য আছে—কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট, কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। সুতরাং এ ভাষায় যা প্রকাশ হয় তদপেক্ষা

বেশী অস্পষ্টই রয়ে যায়। প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে অপ্রকাশের দিগন্ত বহুদূর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই সন্ধ্যা ভাষাই শ্লেষ অলংকারের উপযুক্ত ক্ষেত্র—কেননা শ্লেষ অলংকারও সন্ধ্যা ভাষার মত লীলাময়ী। একই শব্দ যখন দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয় তাই শ্লেষ অলংকার হয়ে ওঠে।
চর্যার বহুপদে শ্লেষ অলংকার প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে :

সোনে ভরতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥…॥ চর্যা—৮নং ॥

এখানে রূপা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্লেষ অলংকার হয়ে উঠেছে। সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগ চর্যার বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। দুর্জ্ঞেয় নিরাত্মাকে শবরী রূপে কল্পনায়, চঞ্চল চিত্তকে মূষিক রূপে বর্ণনায় সমাসোক্তি অলংকারের সমাবেশ হয়েছে। চর্যার কোন কোন পদে বিরোধ অলংকারও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। "বলদ বিআইল গবিআঁ বাঁঝে" (বলদ বিয়াইল গাভী হয় বন্ধ্যা) এবং "যো সো চৌর সোই সাধী" (যে চোর সেই সাধু) ইত্যাদি পদগুলি বিরোধ অলংকারের সার্থক প্রমাণ। অলংকার প্রায়াগে চর্যাকারগণের সুনিপুণ দক্ষতা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভুদেব চৌধুরী বলেছেন: "ভারত চন্দ্রের অলংকরণ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে সর্বজন প্রশংসিত। কিন্তু প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় চর্যাকারগণের এই অলংকরণ প্রচেষ্টাও কম প্রশংসণীয় নয়,—বরং অধিকতর বিস্ময়কর, দুরূহ ভাষা এবং কঠিন প্রকাশ ভংগীর গণ্ডী অতিক্রম করে চর্যা সাহিত্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে এ সত্য উপলব্ধি হতে পারবে, ভারত চন্দ্র যেখানে কেবল বিদগ্ধ বাগ্‌জালই বিস্তার করেছেন। সেখানে চর্যাকারগণ অলংকার-সাহায্যে বস্তু-নিষ্ঠ জীবন এবং ব্যাক্তিগত জীবনানুভূতিকে সার্থক রূপ-মূর্ত্তি দান করেছেন।"

গ ॥ চর্যায় ধ্বনি : কাব্যের সংগা নির্ণয়ে কেউ কেউ বলেছেন "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য" বা বক্রোক্তি জীবিত।" বলাবাহুল্য উভয়বিধ লক্ষণই চর্যায় প্রভূত পরিমানে বিদ্যমান। ধ্বনিবাদীদের মতে যে ছন্দোবান্ধ কবিতায় বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যাতীতই প্রধান হয়ে উঠে, বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থেরই প্রাধান্য সূচিত হয়— সেই রচনাই আদর্শ কবিতা। চর্যার বহু স্থানেই এই লক্ষণের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে, আমরা পূর্বেই বলেছি নীরস তত্ত্বকথাকে গণচিত্তের কাছে আবেদনশীল করার জন্যে চর্যাকারগণ বহুবিধ রূপকের ব্যবহার করেছেন। এই রূপকের বাহ্যার্থই তাঁদের কাছে প্রধান নয় রূপকের অন্তরালে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব-

গুলিকে প্রচার করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। সুতরাং চর্যার প্রায় সর্বত্রই রূপক অপেক্ষা রূপকাতীত, বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যাতীতের প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে।)

ঘ ॥ চর্যায় রস : রসবাদীরা কাব্যের সংগা দিয়েছেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বলাবাহুল্য এই মানদণ্ডে বিচার করেও চর্যাপদকে কোন প্রকারে কাব্যের দিগন্ত হতে বহিষ্কার করে দেওয়া যায় না। (রসের মধ্যে আদি রসই শ্রেষ্ঠ, চর্যার বহু স্থানেই আদিরসের প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।) একটি উদাহরণ :

দিবসই বহুড়ী কাডই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাস ॥ ॥ চর্যা—২নং ॥

অনুবাদ :

দিবসে বধূটি কাঁদে ভয়ে হয়ে ভীঅ।
রাত্রিতে চলিয়া যায় কামে হয়ে প্রীত ॥

এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মনীন্দ্রমোহন বসুর মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণ যোগ্য : "উক্তিটি সরস বটে, কিন্তু তত্ত্বন্বেষীগণ এই বধূটির খোঁজ করিতে গলদঘর্ম হইবেন। তত্ত্বের মরুভূমিতে কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত রসের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।"

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী"…(চর্যা-২৮নং)

ইত্যাদি কবিতাটির মধ্যেও আদি রসের প্রাবাল্য অনুভব করা যায়। ' কানে কুন্তল, গলায় গুঞ্জার মালা, পরণে বহুবিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ ইত্যাদি সাজে সজ্জিতা হয়ে শবরী বালা একাকী পর্বতের শিখরে ভ্রমণ করে, শবর তাকে চিন্‌তে না পেরে পরকীয়া প্রেমের প্রাণোন্মাদিনী তীব্রতা অনুভব করে। পরে বিস্ময় দূর হলে চিরপুরাতন প্রেয়সীর সাথে চির নতুন মিলনে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এখানে রসের প্রবল স্ফুরণের দোলায়িত তরঙ্গাঘাতে সকল তত্ত্বকথা কোথায় ভেসে গেছে। প্রেম ব্যাকুল শবরের উন্মত্ত প্রেমাবেগ সঞ্চারী ভাবে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে কাব্য রসে সমস্ত দেহমন আপ্লুত করে দিয়েছে।

সুতরাং অলংকার বাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ যে দিক হতেই বিচার করা যাক না কেন চর্যাপদকে সার্থক কাব্য বলতে আমরা বাধ্য।)

ঙ ॥ চর্যায় প্রবচন : এ ছাড়াও চর্যার কয়েকটি পদ প্রবচনের আকার ধারণ করেছে। ভাষা ব্যবহারে অপূর্ব দক্ষতা না থাকলে কখনো ভাব প্রবচনের সৃষ্টি করতে পারেনা। বলাবাহুল্য সে দক্ষতা চর্যাকারগণের ছিল।

তাই "অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী" (আপনার মাংসের হরিণ নিজেই নিজের শত্রু), "হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ" (হাতের কঙ্কন দেখার জন্যে দর্পণের প্রয়োজন নেই), "সুণ গোহলী কিমো দুঠ বলন্দেঁ" (দুষ্ট গরু হতে শূন্য গোয়াল ভাল) ইত্যাদি পদগুলি সেই প্রাচীন কাল হতেই আপন প্রবাহ ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে অতি আধুনিক কালের দ্বার-প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

চ ॥ চর্যায় ধাঁধা: বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধার সন্ধানও আমরা চর্যাপদের মধ্যে পাই। "বলদ বিআইল গবিআঁ বাঁঝে", "নিতি নিতি শিআলা সিহে সম যুঝএ। ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝএ" ইত্যাদি ছত্রগুলির মধ্যে বাংলা ধাঁধার আদি রূপটি অনুভব করা যায়।

চর্যার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের জন্য আমরা ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, রস, ধ্বনি, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা করেছি—কিন্তু এ সবের অতিরিক্ত আছে কবি হৃদয়ের ব্যাক্তিগত অনুভূতির নিবিড়তা। এই নিবিড় অনুভূতির তীব্র বেগই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে চর্যার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। এই তীব্র বেগই সকল তার্কিক-তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে চর্যাকে সাহিত্যের দিগন্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে দিয়েছে। এই অন্তরাবেগই ধর্ম্মের নিরস মরুভূমি হতে চর্যাকে নিয়ে এসেছে সুন্দরের রসলোকে।)

॥ দুই ॥

॥ চর্যাপদে সামাজিক চিত্র ॥

চর্যাপদকে আমরা অজন্তা-ইলোরার সমগোত্রীয় করেছি। অজন্তার আবিষ্কারে যেমন সম্পদশালী ভারতের আদিম সভ্যতার সাথে সমাজ জীবনের বিচিত্র ধারার সন্ধান আমরা পেয়েছি তেমনি চর্যাপদের আবিষ্কারেও বাংলা সাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টিধারার সাথে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সমকালীন সমাজ-জীবনের মর্মালেখ্য।) চর্যাপদ প্রাচীন বাংলার সমাজ-চিত্রের এক বহু-বিচিত্র এ্যালবাম। 'সমাজের অতি খুঁটিনাটি দিকও এ গ্রন্থে সুঅঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য এই সুঅঙ্কনের অন্তরালে উপযুক্ত কারণ বিরাজমান। সাহিত্য সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। যিনি লেখক তিনি সামাজিক জীব—সুতরাং তাঁর সৃষ্ট কর্মে যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সব সাধারণ কারণ ছাড়াও চর্যাপদে সমাজ-চিত্র-অঙ্কনের আর এক গভীরতর কারণ

রয়েছে। চর্যাকারগণ আপন ধর্মতত্ত্বকে জন সাধারণের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন এবং সাধারণ সমাজে আপন ধর্মবোধকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের রাজসিক উপমা রূপকের শান বাঁধান পথ পরিত্যাগ করে নেমে এসেছিলেন ধূলি মাটির পথ বেয়ে লৌকিক জীবনের কেন্দ্র ভূমিতে। 'অন্তর হতে আহরি বচন' নয় এই স্থূল লৌকিক জীবন হতে তাঁরা উপমা রূপক আহরণ করে এক অভিনব বাণী-মূর্তি নির্মান করেছেন। এ বাণী-মূর্ত্তির অন্তরালে তাই ধরা পড়েছে লৌকিক সমাজ জীবনের অভিনব রূপ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে গুপ্ত সম্রাজ্যের সময়ে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাংলা দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। বাংলা দেশ তখন অনার্য জাতিরই প্রায় একচেটিয়া আবাস-ভূমি হয়ে উঠেছিল। অনার্য জাতির মধ্যে কোল, শবর, রাজবংশী, দুলে বাগদী, বাউড়ী ইত্যাদি ছিল প্রধান—এবং প্রাচীন সমাজে এদের ছিল গুরুত্ব পূর্ণ স্থান। চর্যাপদের মধ্যে নানা ভাবে বার বার এই আদিমজাতি সমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এদের সমাজ জীবনের কথা, এদের ধর্ম পালনের কথা, এদের বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা—চর্যায় সুন্দর রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর্য জাতির কথা বাদ দিয়ে অনার্য জাতির কথা এই ভাবে বার বার উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় তখনো বাংলা দেশে সর্বভারতীয় আর্য সংস্কৃতি প্রধান্য লাভ করতে পারেনি। গ্রামীন জীবনে তখনো আদিম জাতি সমূহের প্রতিপত্তিই প্রধান হয়ে ছিল।

বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম সৃষ্টি চর্যায় যে সমাজ চিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করি—যদি ধৃষ্টতা না হয় তা হলে বলা চলে—লৌকিক জীবনের তেমন নিখুঁত চিত্র সমগ্র মধ্য যুগীয় সাহিত্যের কোথাও নেই। মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা পেয়েছি দেবদেবীর চিত্র, ধনিক সম্প্রদায়ের কেলি বিলাস এবং মধ্যে মাঝে লৌকিক জীবনের রূপায়ণ কিন্তু চর্যাপদে যে চিত্র পাই তা কোন দেব দেবীর নয়, কোন রাজা উজিরেরও নয়, একেবারে নিখুঁত লোক জীবনের। আদিম জাতির প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার আচার অনুষ্ঠাণে প্রতিটি চিত্রই উজ্জ্বল। লৌকিক সমাজের যে দৈনন্দিন পারিবারিক চিত্র চর্যায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা হতে জানা যায় সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল শ্রমশীল এবং মেহনতী। কিন্তু মেহনতী জনগণের ভাগ্যে যে অভিশাপ আজও বিদ্যমান সেই দারিদ্র্য, দুঃখ সেদিনও ছিল তাদের একমাত্র প্রাপ্য। শবর পাদের "উঁচা উঁচা পাবত" (২৮) চর্যাটিতে তৎকালীন আদিবাসীদের পারিবারিক জীবনের

একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের উপরে উঁচু টিলায় শবর শবরী বাস করে, শবরী বালা গলায় পরিধান করে গুঞ্জারের মালা, এবং কানে পরে কুণ্ডল। একখানি পর্ণকুটীর তাদের সম্বল। নিকটেই কাগ্নীর খেত, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাগ্নী ধান পেকে উঠলে উৎসবের আনন্দ কোলাহলে সমগ্র পল্লী মুখর হয়ে ওঠে। চাটিল পাদের একটি চর্যায় (৫) গাছ কেটে পাট জুড়ে সাঁকো নির্মানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।

অদয় দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥

বিরুবা পাদের (৩) চর্যায় মদ তৈরীর উল্লেখ আছে। কাহ্নুপাদের "নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া" (১০) চর্যাটি তৎকালীন সামাজ-জীবনের একটি সুন্দর আলেখ্য। চর্যাকারগণ যে পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন—অন্ততঃ বিদ্বেষী না হোক্ নিন্দা করতেন—তা' এই পদটি হতে জানা যায়। বেদ পুরাণ দার্শনিকতা এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মচারণের নিন্দায় চর্যাকারগণ পঞ্চমুখ। এই পদটির "বাহ্মণ নাড়িআ" অর্থাৎ নেড়ে ব্রাহ্মাণ সিদ্ধাচার্যগণের আক্রোশজাত বক্রোক্তির সুস্পষ্ট প্রমান। এই পরধর্ম বিদ্বেষ বা নিন্দা ছাড়াও ডোম জাতির বৃত্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাঁত নির্মান, চাঙাড়ী বোনা এবং নৌকা বাওয়া ছিল তাদের অন্যতম বৃত্তি। কাপালিকেরা হাড়ের মালা পরতো এবং নগ্ন থাকৃতো—এ ছাড়া তাদের অন্যমত বৃত্তি নট-ব্যবসায়ের উল্লেখও এ চর্যায় আছেঃ

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া ॥

ডোমেরা ছিল সাধারণ নাগরিকের কাছে ঘৃণার পাত্র—তাই নগরের মধ্যে তাদের বাস নিষিদ্ধ ছিল। তারা বসবাস করতো নগরের উপকণ্ঠে—নাগরিক পরিবেশ হতে দূরে। কাহ্নুপাদের "ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা" (১৯নং) চর্যাটির মধ্যে পাই ডোম বিবাহের পুর্ণাঙ্গ চিত্র। বিবাহের সময় প্রয়োজন হয় দুন্দুভি, ঢাক ঢোলের বাজনা। বাদ্য-যন্ত্রের তুমুল বাদ্যে পথ উতরোল করতে করতে বিবাহ করতে যায় ডোম এবং বিবাহান্তে নববধূর সাথে রাত্রি যাপন করে। ডোমের বিবাহেও যে যৌতুকের প্রয়োজন হতো এ চর্যাটি তারই প্রমাণ বাহী।

ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।

জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥

চর্যায় একদল যাযাবর শ্রেণীর কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এই যাযাবর

শ্রেণীর লোকেরা কখনো নৌকাযোগে, কখনো পদব্রজে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। নাচগান দেখিয়ে এবং ঔষধ বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এই যাযাবর শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ হলো বর্ত্তমানের বেদের দল।
স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার অবাধ অধিকার ছিল। 'বাপুড়ী'র সাথে ডোম্বীর সম্মিলিত নৃত্যের তালে যে ছবি ফুটেছে তাতে রক্ষনশীলতার কোন পরিচয় নেই—আছে সমকালীন সমাজ-জীবনের উলঙ্গ বাস্তবালেখ্য।
বাংলা দেশ নদীমাতৃক। বাংলা সাহিত্যে নদীর হয়েছে তাই অবাধ সঞ্চার। মধ্যযুগের সমগ্র সৃষ্টিতে নদীর কথা বার বার বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। চর্যাপদেও এই নদীর চিত্র বহুবার অঙ্কিত হয়েছে। নদীর প্রসঙ্গেই এসেছে নৌকার কথা, দ্রুত দাঁড় ফেলে পাল তুলে নৌকা বাওয়ার কথা। নৌকায় নদী পার হতে পাড়ানী লাগতো এবং কড়ি নেই বল্‌লেও যে যাত্রীদের নিস্তার ছিলনা তার ইংগিত পাওয়া যায় ডোম্বীপাদের "গঙ্গা জউনা মাঝাঁরে বহই নাঈ" চর্যাটিতে। শান্তিপাদের "তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু" চর্যাটিতে (২৬নং) তুলা ধোনার কথা বর্ণিত হয়েছে। ধামপাদের চর্যায় (৪৭নং) পাই ঘরে আগুন লাগার কথা। বীণাপাদের চর্যাটিতে (১৭নং) বীণার তানে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করা এবং তালে তালে নৃত্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। শ্বশুর (সসুরা), শ্বাশুড়ী-ননদ (সাসু-ননদ), বউ (বউড়ী) এবং প্রতিবেশীদের (পড়িবেষী) নিয়ে গৃহস্থেরা শান্তিতে একত্রে বসবাস করতো। কিন্তু এই শান্তি যে বারমাস তাদের ভাগ্যে হতো না তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে "হাড়িতে ভাত নাহি" চর্যাটিতে। এর থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। কিন্তু এর পাশেই আবার শবরপাদের ৫০নং চর্যায় অঙ্কিত হয়েছে ধনীর গৃহ সজ্জার চিত্র। একটি চর্যায় বিছানাপাতা খাটে শয়ন করে বিলাসীর পান (তাঁবোল) কর্পূর (কাপুর) দিয়ে খাওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। পথে প্রান্তরে এবং জলযাত্রায় ছিল দস্যুর ভয়। ভুসুকুপাদের একটি চর্যায় (৪৯নং) নৌ সৈন্য অথবা জলদস্যু কর্তৃক বাংলাদেশ লুণ্ঠনের ইংগিত রয়েছে। চোর ধরার জন্যে দারোগা (দুষাধী) ছিল এমন কী থানা বা কাছারীরও (উথারী) উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে আপন জীবিকা অর্জন করতো। ডোম এবং যাযাবর শ্রেণীর কথা আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কৈবর্ত্তরা মাছ ধরতো। ধুনুরীরা ধুনতো তুলা। ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজের কথাও কিছু উল্লিখিত হয়েছে চর্যায়। ধার্মিক লোকেরা আগম-পুঁথি পড়তো, কোশা-কুশি নিয়ে পূজা করতো—মালা জপ করাও ছিল তাঁদের আর একটি উল্লেখযোগ্য

কাজ। বিদ্বান ব্যক্তিদের যে বিশেষ কদর ছিল চর্যায় তারও ইংগিত রয়েছে এমনি করে চর্যার সর্বত্র সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন-চিত্র সুন্দর হয়ে ফুটেছে অবশ্য ধনী-সমাজের চিত্র যে একেবারেই নেই তা নয়—তবে বিত্তশালী লোক-জীবনের যে চিত্র পাই তা সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্রনের তুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র। ধনীর গৃহে নিত্য উপাসনা হতো, দেববিগ্রহের নামেও উল্লেখ আছে। চোর ডাকাতদের দ্বারা আকস্মিক গৃহ লুণ্ঠিত হলে নিঃস্ব হৃদয়ের বেদনা যে তীব্র হতো তার ইংগিত পাওয়া যায় একটি চর্যায়।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি চর্যাকারগণ আপন ধর্মের মাহাত্ম্যকে জনচিত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। এই চর্যা-সাধকেরা একদিকে যেমন ছিলেন উচ্চস্তরের ধর্ম-সাধক তেমনি অন্যদিকে ছিলেন তৎকালীন সামাজিক্ জীবন-যাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলেই নীরস ধর্মতত্ত্বের মাঝেও সামাজিক জীবন-চিত্র বার বার বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রস-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের সাথে চর্যাকারগণের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষন শক্তি ছিল বলেই চর্যায় অঙ্কিত হাজার বছরের পুরাণো সমাজ-চিত্র আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

॥ তিন ॥

॥ পরবর্তী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে চর্যার প্রভাব ॥

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীন ভাষায় প্রাচীনতম সৃষ্টি হলেও এই গ্রন্থটির মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ ও কাব্য রীতির অনেক উপকরণই বিদ্যমান। বস্তুতঃ চর্যাপদগুলি আধুনিক বাংলা ভাষার অমার্জিত সংস্করণ। অমার্জিত কিন্তু সকল কিছুই বীজাকারে নিহিত।

অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম। অপভ্রংশ হতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়ে বাংলা ভাষা বহুকাল কথ্য ভাষা রূপেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছিল—পরে তা' সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়। বাংলা ভাষা যখন অভিজাত রূপ পরিগ্রহ করে' সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়—সেই আভিজাত্য-গর্বী ভাষা দিয়েই রচিত হয় চর্যাপদ। সুতরাং চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন।

প্রাকৃত অপেক্ষা তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় চর্যায়। যেমন : পঙ্ক,

চঞ্চল, গম্ভীর, মাতঙ্গী ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা ভাষায় যে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয় এই চর্যাপদ হতেই তার সূত্রপাত।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়েও চর্যা আধুনিক বাংলা ভাষাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলায় অনেক সময় 'অ-কার' 'ও-কার'-এর মত উচ্চারিত হয়—যেমন: ভালো, করো প্রভৃতি। চর্যাপদ হতেই এই উচ্চারণ বিশিষ্টতার সূত্রপাত। চর্যাপদে আমরা কৃত স্থলে পাই কিউ, গত স্থলে পাই গউ। 'অ' প্রথমতঃ 'ও' এবং পরে 'উ'তে পরিণত হয়েছে। চর্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বরই অবিচারিত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—যথা: পঞ্চ এবং পাঞ্চ। আধুনিক বাংলাতেও এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণের বিভিন্নতা রক্ষিত হয় না, সে জন্যই আমরা উচ্চারণের দ্বারা বিভিন্নতা প্রতিপাদন না করে (হ্রস্ব) ই, (দীর্ঘ) ঈ প্রভৃতি পাঠ করে থাকি।

ত-বর্গ ও ট-বর্গের অন্তর্গত বর্ণ হতে বাংলায় ড় ও ঢ় এর উদ্ভব হয়েছে—যথা: পততি বা পঠতি হ'তে পড়ে, গঠতি হতে গড়ে। দুই বর্গের মাঝে এই যে নতুন বর্ণের উদ্ভব এ হল বর্ণের অত্যাধুনিক পরিণতি। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের আভাস পাই চর্যার মধ্যে। যথা: কেডুআল হতে কেড়ুআল। বাংলায় বিভিন্ন জ, ন, ব এবং স এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না—এ হল বাংলার নিজস্ব বিশিষ্টতা। আমরা এখন এই বিভিন্নতা স্পষ্ট করার জন্যে (তালব্য) শ, (মূর্দ্ধণ্য) ষ, (দন্ত্য) স ইত্যাদি পাঠ করে থাকি। চর্যার আদর্শ পুথি লিখিত হওয়ায় কালে এই উচ্চারণ বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যথা: মন (চর্যা-২০) কিন্তু মণ (চর্যা-৩০)। ৫০নং একটি চর্যার মধ্যেই লিখিত হয়েছে শবর, ষবরালী এবং সবর।

আধুনিক বাংলা ভাষায় কোন কোন কারকে সাধারণতঃ একবচনে কোনই বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। যথা: রাম খাইতেছে, ভাত দাও ইত্যাদি। এক-হাজার বছর পূর্বে রচিত চর্যা হতেই বোধ হয় এর সূত্রপাত। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল:

কর্তা কারকে: কাআ তরুবর পঞ্চ বিডাল।

কর্ম কারকে: দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।

করণ কারকে: বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী।

বাংলায় যেমন বহুবচন বোঝাবার জন্যে বহুত্ব বোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—যথা: গাছগুলি, পাখীসব ইত্যাদি—সেরূপ দৃষ্টান্ত চর্যাতেও পওয়া যায়; যথা: সঅল সমাহিঅ, মণ্ডল সঅল ইত্যাদি। কখনো কখনো সংখ্যা দ্বারাও

বহুবচন বুঝান হয়েছে। যথা: ছুই ঘরে, পঞ্চ ডাল ইত্যাদি। তবে এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই আধুনিক বাংলায় বহুত্ব বোধক 'রা' বা 'এরা' চর্যাতে নেই। সমান সবর্ণে দীর্ঘ হয়, এই সূত্রানুযায়ী গঠিত সমস্ত পদের দৃষ্টান্ত চর্যাতেও লক্ষ্য করা যায়—যথা: অজরামর, ভাবাভাব ইত্যাদি। আধুনিক বাংলার ন্যায় প্রায় সর্ববিধ সমাসের দৃষ্টান্তও চর্যায় পাওয়া যায়। যথা: কমল রস (তৎপুরুষ), মহাসুহ (কর্মধারয়), ভবজলধি (রূপক), বামদাহিণ (দ্বন্দ্ব), অপরবিভাগা (বহুব্রীহি) ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা এবং সংস্কৃতের ন্যায় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি চর্যায় পরিলক্ষিত হয়—যেমন: নিকটে = নিয়ড়ী (নিয়ড়ী), আয়াতি = আবয়ি (আঅই)।

ভবিষ্যৎকাল বুঝাতে চর্যায় 'ইব' প্রত্যয় হতো—যেমন: করিব নিবাস, তুম্হে জাইবে। এই 'ইব' প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্যাকরণগত উল্লিখিত বিশিষ্ট ছাড়াও চর্যাগীতিতে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ পাওয়া যায় যেগুলি বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। যেমন: থির করি (স্থির করে), শুনিয়া লেহঁ (শুনে নিই), দুহিল দুধু (দোহা দুধ) ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে চর্যার প্রভাবের জন্য পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ের "চর্যার সাহিত্যিক মূল্য" দ্রষ্টব্য।

॥ চার ॥

॥ চর্যার ধর্মমত বা দার্শনিকতা ॥

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক-সম্প্রদায়ের ধর্ম-সাধনার নিগূঢ় সংকেত-বাণী বহন করে আমাদের নিকট চর্যাপদগুলির আত্ম প্রকাশ। চর্যাপদে ইসারা-ইংগিতে আভাসিত হয়েছে সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার গুহ্য তত্ত্ব কথা। কিন্তু এই তত্ত্ব কথার গহন-গভীরে প্রবেশ করার আগে আমরা সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসটি জেনে নিতে চেষ্টা করবো।

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য ভবজন্ম হতে মুক্তিলাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। এই নির্বাণ লাভ বা ভবচক্র হতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায়কে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। জীব মাত্রকেই বার বার চক্রক্রমে ভবচক্রের আবর্তনে ঘুরে অসংখ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। এই বেদনা-ব্যথার, দারিদ্র-দুঃখের দাবদাহ

হতে নিজেকে মুক্ত করার অর্থই হলো ভবচক্র (whirl of existence) হতে নিজেকে ছিন্ন করা। কিন্তু এই ভবচক্র হতে নিজেকে ছিন্ন করার উপায় কী? বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেছেন মানুষের অন্তরে হয় 'অবিদ্যা'র জন্ম—এই অবিদ্যাই তাকে বার বার ভবচক্রের নির্মম গতিশীলতার মাঝে টেনে আনে। সুতরাং ভবচক্র হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পরম লভ্য নির্বাণ পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নির্বাণ-পথের পরম এবং প্রধান শত্রু অবিদ্যাকে দূর করা। অবিদ্যার প্রতি মানুষের আর কোন আকর্ষণ না থাকলে নির্বাণ লাভ সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু এই অবিদ্যা দূর করা যায় কী দিয়ে? বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের মতে এই অবিদ্যা দূর করার জন্যে প্রয়োজন শূন্যতা জ্ঞানের। বৌদ্ধ ধর্মের দুই প্রধান মতবাদী দল হীনযান ও মহাযান উভয়ই এই শূন্যতাবাদকে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম রূপ নিয়ে হীনযান গঠিত এবং পরবর্তীকালে যে মতবাদ গড়ে উঠে তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাযান। ধর্মমতের দিক দিয়ে হীনযানী মতবাদ রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। হীনযানী মতাবলম্বীদের কাছে ব্যক্তিগত মুক্তির আকাঙ্খাই চরম। এই মুক্তি লাভের পথও ছিল দুর্গম—কঠিন নৈতিক আদর্শ ও দুরূহ সাধন-পন্থায় এই মতে নির্বাণ লাভ ছিল প্রায় প্রাণান্ত ব্যাপার। হীনযানীদের সাধন-পন্থায় চারটি স্তর—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ। শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা প্রাণোদিত হয়ে জগৎ ও জীবনের পশ্চাতে কোন সত্য নেই জেনে অবিদ্যার ধ্বংস সাধন করে অর্হত্ব লাভই হল এই মতবাদের চরম লক্ষ্য। এই মতবাদের পিছনে নিয়ম-নীতির প্রচণ্ড শাসন থাকায় এবং সর্বোপরি সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকায় জনসাধারণ এই মতবাদের ওপর হতে আস্থা হারাতে থাকে। ফলে উদ্ভব হয় মহাযান মতবাদের। মহাযানীদের দৃষ্টি ভংগীর উদারতা এবং এক বিশ্বপ্রসারী মনোভাব এই মতবাদের পরিপুষ্টির অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে। কেবল ব্যক্তিগত মুক্তিই তাঁদের কাম্য নয়—ব্যক্তিগত মুক্তির সাথে তাঁরা চেয়েছেন নিখিল বিশ্ব-মানবের দুঃখ-মুক্তি। ফলে শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধনে কেবল মাত্র অর্হত্ব লাভই তাঁদের লক্ষ্য হয়ে উঠেনি—তাঁদের সমগ্র ধ্যান-সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শূন্যতা-জ্ঞানের সাথে করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত লাভের ওপর। এই করুণার স্বরূপ কী? করুণা হলো ভবচক্রে বেদনা-লাঞ্ছিত নিখিল বিশ্বের অসংখ্য মানবের জন্য অপরিসীম বেদনা-বোধ। সুতরাং বোধিচিত্ত হল শূন্যতাজ্ঞানের সাথে বিশ্ব-মানবের জন্য অপরিসীম করুণা বোধে নতুন চেতনায় আলোকোদ্ভাসিত চিত্ত—শূন্যতা ও করুণার সমান্বিত রূপ। সুতরাং মহাযানী মতবাদের প্রভাবে

বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ হতে নৈতিক-নৈষ্টিকতার কড়াকড়ি এবং সংকীর্ণতা দূর হলো আর হীনযানীদের শূন্যতাময় 'নেতিবাচক' (negative conception) নির্বাণ করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্তের মধ্যে একটি 'ইতি বাচক' (posative conception) রূপলাভ করলো। 'উদার নীতির পটভূমিতে প্রতিষ্টিত মহাযান যখন তার 'মহাযান' নিয়ে মানুষের দ্বার প্রান্তে আবির্ভূত হল তখন সর্বদলের সর্ব শ্রেণীর মানুষ মুক্তিলাভের আশায় সেখানে প্রবেশ করলো।' ফলে অল্পদিনের মধ্যে এই মতবাদ বাংলার লোক-সমাজের কাছে ব্যাপক প্রিয় হয়ে উঠ্‌লো। সর্ব শ্রেণীর লোক মহাযানের অন্তর্গত হওয়ায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লৌকিক মতবাদ এবং আচার অনুষ্ঠানও এই মহাযান মতবাদে অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগলো। নিয়ম বন্ধনের শিথিলতার জন্য একদিকে যেমন মহাযান ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল তেমনি বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ক্রম প্রচলনে মহাযানের ধর্মমতের বিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠ্‌লো। এবং অনিবার্যতার ফল স্বরূপ মূল মহাযান ভেঙে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে সহজযান নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে নেই। তিনি বলেন বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতকগুলি মত-বৈশিষ্ট ও সাধন-বৈশিষ্ট নিয়ে এই নামটি পরবর্ত্তীকালে গড়ে উঠে। বজ্রযান মতবাদের পত্তন হয় 'মন্ত্র' 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল' ইত্যাদি নিয়ে তান্ত্রিকাশ্রয়ী রূপে। এ ছাড়াও বজ্রযানে ছিল বিবিধ দেবদেবীর পূজা অর্চনা এবং তান্ত্রিক পদ্ধতির কতকগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা।

সহজযান মূল মহাযান থেকেই উৎপন্ন হোক কিংবা বজ্রযান থেকেই আসুক এখন সহজযানের সাধনপদ্ধতি ও ক্রিয়া কলাপেরদিকে আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। চর্যাপদের প্রতিটি চর্যা এই সহজিয়াদের ধ্যান-ধারণার অনুলিখন।

সহজযানের মতবাদ নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই সহজযান নামের অন্তরালে এই মতবাদের কোন প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে কী না। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে "এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুইদিক্ হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।" প্রথমতঃ ইহাদের 'সাধ্য'-ও ছিল সহজ আবার 'সাধনা'ও ছিল সহজ, প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক বস্তুরই একটি সহজ স্বরূপ আছে—ইহাই তাহার সকল পরিবর্ত্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্ত্তিত স্বরূপ। এই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্যই ইহারা

হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্য কোনও বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ, এই জন্যও তাঁহারা সহজিয়া।
সহজিয়াগণ সর্বদা আপন সাধন পদ্ধতিকে সোজা পথ বলেছেন। সিদ্ধাচার্যের একটি চর্যায় আছে :

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লঙ্ক॥

'এপথ সোজা (ঋজু), সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা ; বোধি নিকটেই আছে (দূর) লঙ্কায় যাওয়ার (প্রয়োজন) নেই।'

সহজিয়াগণ যে বার বার বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে যেতে বলেছেন সেই বাঁকা পথ কী এবং সেটা ছাড়ারই বা প্রয়োজন কেন? উত্তর চর্যাকারগণই দিয়েছেন। তাঁদের মতে 'শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণা সমাধির পথ, বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র আচার পদ্ধতির পথই হলো বাঁধা পথ।' এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে পথ চল্‌লে মুক্তি বা সহজানন্দ পাওয়া সম্ভব নয় বলে তা ত্যাজ্য। পাকা বেলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলি যেমন কেবল তার চার পাশে ঘুরে সারা হয়—ভিতরে প্রবেশ করে সার গ্রহণ করতে পারে না তেমনি পাণ্ডিত্য-গর্বী মানুষেরা 'মহাসুখ' এর চার পাশে পাণ্ডিত্যের অভিমানে মত্ত হয়ে ঘুরে মরেন—মুক্তির স্বাদ পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 'সহজানন্দ' বা মহাসুখ বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়— পুরোপুরি অনুভূতি সাপেক্ষ। সুতরাং বুদ্ধি-শাসিত পাণ্ডিত্যে তাকে পাওয়া অসম্ভব। বাক্য-মনের অগোচর যে সহজানন্দ, যাকে বোঝা যায় না—কেবল আভাস-ইংগিতে একটুখানি অনুভব করা যায় মাত্র, বাহ্যাড়ম্বর-যুক্ত ক্রিয়াকাণ্ড বা বুদ্ধি-দীপ্ত পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাকে কোন মতেই পাওয়া যায় না—তাকে পেতে হলে গুরুর উপদেশ গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। চর্যাকারগণ বার বার তাই গুরুর উপদেশ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। গুরুর নির্দেশিত পথে পদচারণা করলে নির্বাণ তথা সহজানন্দ তথা মহাসুখ-লাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

নির্বাণ, অদ্বয়, সহজানন্দ, মহাসুখ ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে একটি গভীর যোগ-সূত্র আছে—আসলে সবই এক। 'হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে যে রাগের আগুন, যে দ্বেষের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাপিত হলে আসে যথার্থ নির্বাণ।' এবং এই নির্বাণই হলো পরম সুখের বা মহাসুখের। ধম্মপদের বহুস্থানে উল্লিখিত হয়েছে নির্ব্বাণং পরমং সুখং। অদ্বয় হল আমাদের দেহাভ্যন্তরালবর্তী আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত সহজ সত্তা। এই সহজ সত্তার সাথে

মিলনেই হয় সহজানন্দ এবং সহজানন্দেই নির্বাণ এবং নির্বাণেই মহাসুখ। 'এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোন 'জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব' বা 'গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্যত্ব' থাকে না। গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব রহিত যে স্বরূপ তা'ই হলো অদ্বয় স্বরূপ, অদ্বয়ই হলো সহজ, সহজই হলো মহাসুখ।' সুতরাং সহজিয়াগণের নিকট অদ্বয় লাভ, মহাসুখ প্রাপ্তি, সহজে প্রতিষ্ঠা কিংবা বোধিচিত্ত লাভ এ সকল একই কথা। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি সহজিয়াগণের নিকট বোধিচিত্ত লাভই পরম লক্ষ্য, এই বোধিচিত্ত লাভ হয় শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার দ্বারা। এখন এই শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার অর্থ কী? এই উভয়ের মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখলে সহজিয়াগণের দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব সকল কিছুই আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সুতরাং সকল জটিল তত্ত্ব কথা বুঝতে হলে এই শূন্যতা ও করুণার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এখন আমরা শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার মূলে যে বিভিন্ন ব্যখ্যা ও তাৎপর্য নিহিত আছে সেগুলি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করবো। ধর্মমতের পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায় যে শূন্যতার দ্বারা নির্বাণ অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ হতে বিচ্যুত হয়ে কেবল মাত্র একক ভাবে মুক্তির চেষ্টা না করে করুণার সংমিশ্রণে বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য বৃহত্তর পথে পদচারণার সাধনাই হলো বোধিচিত্ত লাভের সাধনা। এই শূন্যতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা বা জ্ঞাত বা গ্রাহক বা Principle of subjectivity এবং করুণাকে বলা হয় উপায় বা জ্ঞেয় বা গ্রাহ্য বা Principle of odjectivity। এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্ব বা জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বের দুই প্রবাহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যে অদ্বয়তত্ত্ব লাভ হয় তাই বোধিচিত্ত, তাই সহজানন্দ, তাই মহানন্দ, তাই নির্বাণ, তাই সব। ধর্মমতের দিক হতে শূন্যতা ও করুণার সম্মিলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হলো এবার আমরা যোগ সাধনার দিক হতে এর মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো।

॥ পাঁচ ।

॥ চর্যার যোগ-সাধন-তত্ত্ব ॥

যোগ সাধমার দিক হতে সহজিয়াগণ আমাদের দেহের মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ীর কথা বলেছেন। একটি বাম নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হয়েছে নাম বামগা দ্বিতীয়টি দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হয়েছে নাম দক্ষিণগা। এই বামগা এবং

দক্ষিণগা নাড়ী দুটি ছাড়া আরো একটি নাড়ী আছে যার নাম মধ্যগা। এখন বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্রে এবং চর্যায় এই নাড়ীগুলির বহুবিধ নাম আছে—সকল সন্দেহ এড়াবার জন্যে আমরা সর্বপ্রথমে এই নাড়ীগুলির পৃথক নামগুলি উল্লেখ করছি—এই নাড়ীগুলির নাম স্মরণ রাখলে সকল জটিল তত্ত্ব কথা সহজ হয়ে আসবে। বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী দুটি দ্বৈতের প্রতীক—দ্বৈতত্ত্ব বোঝাবার জন্যে বামগা নাড়ীকে সাধারণতঃ বলা হয় শ্বাসবাহী নাড়ী, প্রাণবাহী নাড়ী, ভব (অস্তিত্ব), সৃষ্টি, ইতি, প্রজ্ঞা, বিন্দু, নিবৃত্তি, ইড়া, কুলিশ, আলি, গঙ্গা, চন্দ্র, রাত্রি, লালন, চমন, ইত্যাদি এবং দক্ষিণগা নাড়ীকে বলা হয় প্রশ্বাসবাহী নাড়ী, অপানবাহী নাড়ী, নির্বাণ (অনস্তিত্ব), সংহার, নেতি, উপায়, নাদ, প্রবৃত্তি, পিঙ্গলা, কমল, কালি, যমুনা, সূর্য, দিবা, রসনা, ধমন ইত্যাদি। বিপরীতার্থক এই নামগুলি একত্রিত করলে দাঁড়ায় বামগা-দক্ষিণগা, শ্বাসবাহী-প্রশ্বাসবাহী, প্রাণ-অপান, ভব-নির্বাণ, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, সৃষ্টি-সংহার, ইতি-নেতি, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, ইড়া-পিঙ্গলা, কুলিশ-কমল, আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিবা, লালন-রসনা, চমন-ধমন। মধ্যগা নাড়ীটির বিভিন্ন নামের মধ্যে অবধূতি, অবধূতিকা, সুষুম্না ইত্যাদি প্রধান।

সহজিয়াগণের প্রধান এবং চরম লক্ষ্য সহজানন্দ বা মহাসুখ বা বোধিচিত্ত লাভ। তাদের কাছে এ নাড়ীর কি প্রয়োজন? বামগা দক্ষিণগা এই নাড়ীদ্বয়ের প্রবাহ সাধারণতঃ নিম্নাভিমুখী—এই নিম্নাভিমুখী প্রবাহে চলে সংসারের গতি। একটিতে 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটিতে 'নির্বাণ' (অনতিত্ব)। একটি 'সৃষ্টি' অপরটি 'সংহার' একটি 'ইতি' অপরটি 'নেতি'। এই উভয় নাড়ীর নিম্নাভিমুখী ধারা মধ্যগা নাড়ী পথে উর্দ্ধগা করতে পারলেই মধ্যগার শীর্ষদেশে যে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ বা মহাসুখ বিরাজমান তা' লাভ করা সম্ভব এবং এই অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভই সহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য। বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ীর প্রবাহ যে নিম্নমুখী এবং নিম্নমুখী ধারায় যে বহিঃসৃষ্টি সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই নিম্নধারায় সৃষ্টি হয় জন্ম-মৃত্যুর, জরা-ব্যাধির অর্থাৎ চলমান বাস্তব বিশ্ব সংসারের। নিবৃত্তি রূপিণী বামগা নাড়ীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় একটী রস আর প্রবৃত্তি রূপিণী দক্ষিণগা নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয় পৃথক গুণ সম্পন্ন আর একটি রস। বলা বাহুল্য এই উভয় রসের ধারা নিম্নগা। এই উভয় রস যদি মধ্যগায় মিলিত হয় তা হলে 'সমরসে'র সৃষ্টি হয়—এই সমরস যখন শীর্ষ দেশে উপণীত হয় তখন তা পরিশুদ্ধ 'সামরস্য' রূপলাভ করে। সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিত্ত এই সামরস্যের পূর্ণতমরূপ।

সহজিয়াগণের যে সাধনা তা তান্ত্রিক সাধনা কিন্তু পুরাপুরি নয়। তান্ত্রিক সাধনায় অন্তরঙ্গ দিক ছাড়া বহিঃরঙ্গ দিকটাই অধিক। কিন্তু সহজিয়াগণ বহিঃরঙ্গকে একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। চর্যার সাধকগণ তাই বার বার বাইরের সকল তপ-যপকে এড়িয়ে অন্তরের দিকেই মনোনিবেশ করতে বলেছেন। তন্ত্র সাধনার মূল কথা হল দেহসাধনা—অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করে তার ভিতর দিয়েই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। 'তন্ত্র মতে দেহ ভাণ্ডটিই হলো ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যা, কিছু সত্য নিহিত আছে, তার সবই নিহিত আছে এই দেহ ভাণ্ডের মধ্যে।' সহজিয়াগণ তাই দেহকে নিয়েই পড়েছেন। দেহের মধ্যে যে সহজ স্বরূপ তাই বুদ্ধ স্বরূপ। চর্যাকারগণ তাইতো বার বার ডাইনে বামে যেতে নিষেধ করেছেন। লঙ্কায় যেতে তাইতো তাঁদের ঘোর আপত্তি। যে পতি ঘরে বাস করে প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করে তার সংবাদ পাওয়া যায় কেমন করে।'

ঘরে আচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকৃখই পড়িবেশী পুচ্ছই ॥

'ঘরে (দেহঘরে) আছে, বাইরে জিজ্ঞেস করছ, (ঘরে) পতি দেখেছ কিন্তু প্রতিবেশীকে তার (খোঁজ) জিজ্ঞেস করছ।'

অন্যত্র :

আসরির কোই সরীরাই লুক্কো।
জো তাহি জানই সো তাই মুক্কো ॥

'অশরীরী একজন দেহে লুকিয়ে আছে—তাকে যে জানে সে-ই মুক্ত হয়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চর্যাকারগণ বার বার বলেছেন অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভের জন্যে বাইরে যেতে হবে না—দেহের মধ্যেই সব। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা দেহের মধ্যে চারটি চক্র বা চার পদ্ম কল্পনা করেছেন (হিন্দু মতে ষট্‌চক্র)। প্রথম চক্র নাভিতে—নাম 'নির্মান-চক্র,' দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে—'ধর্মচক্র', তৃতীর চক্র কণ্ঠে—'সম্ভোগ চক্র' এবং চতুর্থ বা শেষ চক্র হলো মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ দেশে এবং এ চক্র উষ্ণীষ চক্র বা সহজ চক্র বা 'মহাসুখচক্র' নামে খ্যাত। 'বামগা বা দক্ষিণগা নাড়ীদ্বয়কে প্রথম নিঃস্বভাবীকৃত করতে হবে—তারপর এই নাড়ীদ্বয়ে যে স্বাভাবিক নিম্নগা গতি যোগের সাহায্যে বিশুদ্ধ করে সেই গতিকে রুদ্ধ করতে হবে—এর পরের সাধনা হলো দুই পৃথক রুদ্ধ ধারাকে সমন্বিত করার সাধনা, তারপর যোগবলে সেই সমন্বিত ধারাকে মধ্যগার বা অবধূতিকার ভিতর দিয়ে ঊর্দ্ধগা করতে

হবে—এই ঊর্দ্ধাগা ধারাই হলো পরম আনন্দ-প্রবাহের ধারা। অবশ্য এই ধারা যতই ঊর্দ্ধমুখী হবে আনন্দানুভবের মধ্যে ততই আসবে প্রবলতা। প্রথম স্তরের ঊর্দ্ধমুখী ধারায় আনন্দ-স্পন্দনের নাম আনন্দ, দ্বিতীয়ানুভূতি পরমানন্দ, তৃতীয়ানুভূতি বিরামানন্দ এবং চতুর্থ বা শেষ আনন্দাভূতির নাম সহজানন্দ। এই সহজানন্দ লাভই হলো সহজিয়া সাধকগণের চরম লক্ষ্য। ' বাঁকা-চোরা পথ নয়—সোজা পথেই সহজানন্দ সহজ লভ্য। চর্যাকারগণ তাই বার বার বাম দক্ষিণ কোন পথে না যেয়ে সোজা পথে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন:

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিন মহাসুহ সাঙ্গা॥

সরহপাদের ৩২নং চর্যায় পাই:

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা॥

বাম দক্ষিণ নয় অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বর যুক্ত কোন পূজা-পার্বণ নয়, কোন ক্রিয়া-কাণ্ড নয়—এ সকল পথ পরিত্যাগ করে অন্তরঙ্গের অর্থাৎ অবধূতিকার পথেই একমাত্র নির্বাণ লাভ সম্ভব। অদ্বয় বোধিচিত্ত, কিংবা সহজানন্দ কিংবা মহাসুখ একমাত্র সেখানেই।'

॥ কয়েকটি ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ ॥

॥ এক ॥

॥ রসরচনার উদ্ভব ও বিকাশ ॥

প্রবন্ধ দুই জাতের। এক শ্রেণীর প্রবন্ধ বিষয়মুখীন—তথ্য ও তত্ত্বই সেখানে বড় কথা আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যা আত্মকেন্দ্রিক—কবি-মানসের নিভৃত আলাপ-চারণায় যার কোমল বক্ষ লাবণ্য-শ্রীতে ঝলকিত। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—এ সকল প্রবন্ধের গতি একমুখ নিয়ন্ত্রী। প্রাণ এবং ভংগী কোনটাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেনি—একটি নিরস বিষয়কে তথ্য ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের লক্ষ্য। সুতরাং এই সকল প্রবন্ধের সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক মূল্য অনস্বীকার্য্য। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধাবলীতে প্রধান হয়ে উঠেছে রস-মণ্ডিত সাহিত্যিক আমেজ। এ সকল প্রবন্ধের ঐতিহাসিক, দার্শনিক মূল্য থাক্‌লেও থাকৃতে পারে কিন্তু সে মূল্য নিতান্ত গৌণ, নেপথ্যলোক হতে মূল প্রবন্ধের যাত্রা পথে তা' কিঞ্চিৎ আলোক দান করছে মাত্র, আসলে মূল প্রবন্ধটি গড়ে ওঠে লেখকের ব্যক্তিমানসের খেয়াল-খুশীর নম্র-মধুর আল্পনায়, সকল বিষয় এবং বস্তুকে পিছনে ফেলে, সকল তথ্য ও তত্ত্বকে অতিক্রম করে সাহিত্যের রসলোকে পদসঞ্চারের মধ্যেই তার পরি-সমাপ্তি। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধই রসরচনার (Literary Essy) অন্তর্গত। সাহিত্য-আমেজ এবং রসধ্বনিই এখানে প্রধান।

সুপ্রাচীন কাল হতে বাংলা সাহিত্য ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভিতর দিয়ে আপনার বিকাশধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, গদ্য সম্প্রতিকালের সৃষ্টি, অধিকতর সম্প্রতিকালের সৃষ্টি এই রসরচনা। উনিশ শতকের শেষপাদে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই আমরা সর্বপ্রথম এই ধরণের সৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়েছি। ইতিপূর্বে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তা কৈশোর হতে যৌবনাভিসারী এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ খ্যাত-কীর্তি গদ্য-শিল্পগণও সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত কিন্তু রসরচনার

সাথে তখনো আমাদের কোন পরিচয় ঘটেনি। অবশেষে এই অভাব দূর হলো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই। অবশ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচনাগুলিতে কাজের কথাই বেশী কিন্তু শেষ বয়সের রচনা "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থটি "বাজে কথা"য় রসমণ্ডিত। গ্রন্থখানিতে কল্পনা-মূলক স্বাধীন চিন্তাধারার সাথে সাহিত্যরসের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা যদি জয়লাভ করতো তা'হলে স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের রূপ কেমন হতো, তারই একটি গৌরবোজ্জ্বল চিত্র' সরল সুললিত ভাষায় 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের' পৃষ্ঠায় রেখাঙ্কিত। আচার প্রবন্ধ, বিবধ প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি গ্রন্থাবলীতেও সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মন এবং প্রাণ বিধৃত। পরাজিত বাঙালী ইংরাজ-সাহচর্যে কীভাবে উপকৃত হতে পারে, কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হলে নারী গৃহলক্ষ্মী হতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। এই চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধাবলীতেও সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যয়ের পরিচয় সুপরিস্ফুট। এঁর প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কথোপকথন-রীতির সংযোজনা। এই রীতিতে অধিকাংশ প্রবন্ধ রচিত হওয়ায় লেখক এবং পাঠকের মধ্যে একটি সরল সহজ অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে।

রসরচনার ধারাবাহিকতায় কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও উল্লেযোগ্য। তাঁর রচনারীতি সাধু ও কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত—এই মিশ্র প্রয়োগে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু রসসৃষ্টিতে তা ফলদায়ী। কালীপ্রসন্নের রচনার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গরসের প্রবর্তনা। অবশ্য এই ব্যঙ্গরস একেবারে গ্রাম্য রসিকতার পর্যায়ে নেমে না এলেও রচনায় এই রসের বাড়াবাড়ি পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছে। রসরচনায় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়েরও সামান্য কৃতীত্ব আছে। অসংখ্য ছোট প্রহসন ও নকসা রচনার মধ্যে তাঁর সে কৃতীত্ব বিধৃত।

এরপর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মত রস রচনার ক্ষীণ ধারায় আপন অফুরন্ত প্রাণাবেগ মিশিয়ে তাকে সাবলীল এবং উদ্দাম করে দূর মোহনার পথে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই আমরা সর্বপ্রথম সার্থক এবং সৌন্দর্য-সুষম রস-রচনা পেলাম। 'লোক রহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই দুই অম্লান সৃষ্টিতে তিনি অমর হয়ে আছেন। এই দুই খ্যাত গ্রন্থে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ আছে যেগুলির বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য। তবুও সেই ক্ষীণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে লেখক কল্পনার এমন স্বর্ণজাল

বিস্তার করেছেন যা সমগ্র প্রবন্ধটিকে দুষ্প্রাপ্য-মনোহর করে তুলেছে। এ সকল প্রবন্ধে বিষয়বস্তু একটি ক্ষীণ অবলম্বন মাত্র—আসল উদ্দেশ্য কল্পনার সৌন্দর্য-সৌধে লেখকের মানসাভিসার। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অহীফেন সেবী কমলাকান্ত নেশার ঘোরে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এমন হাল্‌কাভাবে কথাবার্তা শুরু করেছেন যা' একান্ত-ভাবে হাস্যকর—এই হাস্যরস পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ তিনি জীবন-দর্শনের এমন এক গভীর তত্ত্বকথার মধ্যে এসে থেমেছেন যেখানে আমাদের সমুদয় জাগ্রতবুদ্ধি ও বিবেচনা স্তম্ভিত এবং মূক হয়ে যায়। যে কমলাকান্তের প্রতি উপহাস প্রকাশ করে একসময় আমরা হেসে উঠেছিলুম—সেই হাসিই ফিরে এসে আমাদের সর্বাঙ্গে কালিমা লেপন করে। লোকরহস্য এবং কমলা-কান্তের দপ্তরে যে রচনারীতি গ্রহণ করা হয়েছে ইংরাজীতে তাকে familiar Essy বলা চলে। এ সমস্ত রচনায় পাঠক এবং লেখকের মাঝখানের দূরত্ব অবলুপ্ত হয়—গভীর আন্তরিকতায় উভয়ে এক হয়ে মেশে। পাঠকের হৃদয়ের কোমল ভাবটা এ সকল রচনায় প্রতিবিম্বিত। হাস্যরস পরিবেশনে এবং লেখক পাঠকের মাঝে এই অদ্বৈত সম্পর্ক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অপূর্ব—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও এই ধরণের রচনা বিরল-দৃষ্ট।

রসরচনার ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যানহীন ভ্রমন-কাহিনীও যে কাব্য-উপন্যাসের মত অনবদ্য হতে পারে "পালামৌ" তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পালামৌ-এ কোন গভীর রস-সিক্ত আখ্যানভাগ না থাকলেও পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যে সরস মন্তব্য করেছেন তা' এই গ্রন্থখানিকে রসরচনার অপূর্ব গৌরব দান করেছে। গভীর হৃদয়োল্লাস এবং রসানুভূতিই যে সঞ্জীবাবুর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন "সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে নির্মল ও গভীর রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং আপাততুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আনুবিক্ষণিক লক্ষ্য। সঞ্জীব চন্দ্রের মত গভীর রসবোধ ও সহানুভূতি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের লেখায় পাই নাই।" নিরস পাষাণের বুক হতে রস শোষণ করে অশ্বত্থ বৃক্ষ বেঁচে আছে বলে সঞ্জীববাবু যে মন্তব্য করেছেন তা' তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তিনিও পাঠকের নিরস প্রাণে রসের অফুরন্ত ধারা সঞ্চারিত করে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী সময়ে অসংখ্য প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব

হয়েছে কিন্তু রস-রচনাকার হিসেবে তেমন কেউ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি—বিশেষ করে বঙ্কিমের রচনারীতি এবং প্রতিভার পাশে তাঁদের বৈশিষ্ট্য যেন ম্লান তবুও রস রচনায় ধারা যাঁরা অক্ষুন্ন রেখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং জগদীশ বসুর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-রীতি আবেগ-বহুল কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধু এবং চলতি ভাষার মধ্যে যে বিরোধ চল্‌ছিল স্বামীজির রচনায় তা অনেক খানি মীমাংসার পথে অগ্রসর। হৃদয়ের অনাবিল উচ্ছ্বাসের সাথে রচনার ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনি মিশ্রিত হয়ে যে আবেগ-কম্পিত ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে হৃদয়ে রেখাপাত করে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী এই আবেগ-আলোড়নের স্তর অতিক্রম করেই রসরচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় কাজের কথাই বেশী—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জটিল তত্ত্বগুলিই তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। সুতরাং বিষয়-বিবেচনায় এঁর প্রবন্ধে বস্তু, তথ্য, তত্ত্ব উচ্চ হয়েছে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কোন কোন ক্ষেত্রে যে তা' হয়নি তাও বলা চলে না, তথাপি আন্তরিকতার গুণে রচনায় যে হৃদয়স্পর্শ লেগেছে তাতেই তাঁর প্রবন্ধ রসরচনার এলাকায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রশ্নোত্তরের ছলে জটিল বিষয়ের অবতারণা, কথোপকথনের ভংগীতে গম্ভীর কথাকে সরল করা, হাস্যরসের পরিবেশনে সকল জটিল তর্কজালকে ছিন্ন করার পদ্ধতি রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় অভিনব দীপ্তি দান করেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশ গুপ্ত এঁদের রচনায় যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তা' গভীর আন্তরিকতা—নইলে এঁদের রচনা গুরু-গম্ভীর, রসরচনার নম্রকোমল পথ অপেক্ষা মননশীল প্রবন্ধের দৃঢ়-কঠিন পথে এ সব রচনার যাতায়াত বেশী।

এরপর বাংলা সাহিত্যে রস রচনার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ—রসরচনাকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই জাতের যে প্রতিভা কেবল শিখর-শীর্ষ-বিন্দু স্পর্শ করে না—শিখরের আড়ালে অন্যান্য প্রতিভাকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। রসরচনাকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ শিল্পী হওয়া তো দূরের কথা তাঁর প্রতিভার প্রান্তভূমি স্পর্শ করার মত যোগ্যতা আজ পর্যন্ত কেউ-ই অর্জন করেননি। তাঁর রচনার বিষয় এবং প্রকাশ, প্রাণ এবং ভংগী রাধা-কৃষ্ণের মত অদ্বৈত সম্পর্কযুক্ত। বিষয়বস্তুর গরিমা এবং লিপিচাতুর্যের অপূর্ব দীপ্তি• এই উভয়বিধ মণিকাঞ্চণযোগে তাঁর রচনা

সুপ্রাপ্য-মনোহর। এ ছাড়াও অমূর্ত ভাব কল্পনা এবং বিষয়কে তিনি যে অপরূপ উপমা-অলংকার সহযোগে প্রকাশ করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে কেবল বিরল-দৃষ্ট নয়—অনুপস্থিত। রসরচনাকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কৃতিত্ব এখানেই। এই উপমা-অলংকারের জন্যেই তাঁর রচনাগুলি অতি সহজেই আমাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম স্থানটি দখল করে নেয়। জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত স্নিগ্ধ হাস্যরসিকতা তাঁর রচনায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিদ্রূপ বা শ্লেষপ্রয়োগে হাস্যরস সৃষ্টির হীন প্রচেষ্টা রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে নেই বল্‌লেই চলে—বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং হৃদয়ের সুগভীর প্রশান্তিতে এ হাস্যরস মনোরম এবং প্রাণ-স্পর্শী। বস্তুতঃ পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রসরচনাগুলি লিরিক কবিতার সমধর্মী। 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে তিনি স্বয়ং কবিতার পর্যায়ে ফেলেছেন। "বিবিধ" প্রবন্ধে 'বাজে কথা'র মধ্যদিয়ে কবি যে কথাগুলি বল্‌তে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রবন্ধগুলি সেই পর্যায়ের অন্তর্গত। বর্ণনা ভংগী এবং লিপিচাতুর্যে তাঁর প্রায় রচনা কোহিনূরের অপূর্ব বর্ণ-সম্ভারে ঝলকিত। রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন—কিন্তু প্রত্যেক রচনাতেই বিষয় বস্তুকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছে সাহিত্যরসের ফল্গু-প্রবাহ। কালান্তর, শিক্ষা, মানুষের ধর্ম, বিশ্বরহস্য ইত্যাদি প্রবন্ধ পুস্তকগুলি আমাদের মন্তব্যের সার্থক প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বাংলা রসরচনার ধারায় অপূর্ব সংযোজনা।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবন্ধলেখকের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় একটি রূপমুগ্ধ স্বপ্নতন্ময় মনের পরিচয় বর্ত্তমান। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যালোচনা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধাবলীতে বলেন্দ্রনাথের যে সুনিপুণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও রাজকীয় গদ্যরচনার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে তা' রবীন্দ্র-রচনা-রীতি অনুসারী। রাজকীয় চিত্রধর্মী গদ্যরচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছেন। আন্তরিকতার গুণে এ সকল রচনায় পাঠকের সাথে লেখকের অভিনব যোগ সাধিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের রচনাবলীতে আমরা আর এক শ্রেণীর রচনার সন্ধান পাই—যে গুলিকে ব্যক্তিগত রচনা বলা যেতে পারে। এই সকল রচনায় বলেন্দ্রনাথ অধিকতর ব্যক্তিগত। লেখকের ভাল লাগা, মন্দলাগা সকল কিছুই পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত। এ সমস্ত রচনার মধ্যে লিরিকের সুকোমল পদধ্বনি শোনা যায়।

রসরচনার আর একজন শক্তিমান লেখক প্রথম চৌধুরী। তাঁর রচনা

বুদ্ধিধর্মী এবং মননশীলতার এলাকা ভুক্ত। বক্তব্য অপেক্ষা বলার রীতিই প্রথম চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একান্ত নির্ভেজাল কথ্য ভাষার ওপর তাঁর এই মননধর্মী রচনারীতি গড়ে উঠেছে। 'বীরবলের হালখাতা'য় আপাত বিরোধী বর্ণনা, শ্লেষ, হাস্যরস এবং বুদ্ধির চাকচিক্য বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে হিউমার বা করুণ-হাস্যরস পেয়েছি প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে তা' অনুপস্থিত—কিন্তু Wit বা বাকচাতুর্যের মোহজাল বিস্তার করে তিনি যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা' অনবদ্য। এঁর রচনা ভংগী অত্যন্ত কলাকৌশলময়, তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে তিনি যা উপস্থিত করেছেন তা' বুদ্ধির পথ বেয়েই হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং তখনই পাঠকের সাথে লেখকের একটি অদ্বৈত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে লিরিকধর্মী রচনার পরিচয় পেয়েছি প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিতে তা' নেই বর্তমান কালের প্রাবন্ধিকগণের মধ্যেও এই ধরণের রচনার অভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে—একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম। সে যাই হোক 'সবুজপত্র প্রকাশেব পর থেকে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষার রসরচনা প্রমথ চৌধুরীর প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। আধুনিক যুগের প্রধান রচনাকারদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশিষ্য।'

॥ দুই ॥

॥ গীতিকবিতার ক্রমবিকাশের ধারা ॥

গীতি-কবিতা কবির মর্ম-নির্যাস। কবির নিভৃত মনের বাসনা-কামনার, ব্যথা-বেদনার আলোড়ন-স্পন্দনই গীতিকবিতার প্রাণ-সম্পদ। কোন উপাখ্যান রচনা নয়, কোন সুবিপুল ভাব-কল্পনা নয়,—একটি মাত্র ভাব গীতিকবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে মুক্তা-নিটোল হয়ে লিরিকের সুকোমল সুরে প্রকাশ পায়। মানুষের গহনতম হৃদয়ের সুনিবিড় রসানুভূতিগুলি ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলকিত হ'য়ে ওঠে, সুতরাং গীতিকবিতা মানুষের মনের কথা, অন্তরের বাণী। মহাকাব্যের সাথে গীতিকবিতার একটি প্রধান পার্থক্য এই মহাকাব্যের কবি আপন কাব্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যে আকাশ-পাতাল, স্বর্গমর্ত্ত, বিশ্বনিখিল মোথিত করে বেড়ান—

এ কাব্যের প্রেরণা আসে বহির্বিশ্ব থেকে, সুতরাং এ কাব্য বস্তুমুখীন—Objective। আর গীতি কাব্যের কবি আপন কাব্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যে কল্পনার বর্হিমুখী বেগকে দমন করে ছুটিয়ে দেন হৃদয়লোকে—অন্তরের অসীম রহস্যানুভূতি হ'তেই আসে এ কাব্যের প্রেরণা, সুতরাং এ কাব্য ব্যক্তি হৃদয়ের আত্মলীন অভিব্যক্তি—Subjective।

গীতি কবিতার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত্ত। শব্দের পিঠে শব্দ যোজনা করে কষ্ট কল্পনায় যে কবিতা রচিত হয় তাতে গীতিকবিতার সৌকুমার্য ও সম্ভ্রম ক্ষুন্ন হ'তে বাধ্য। ভাবের আবেগে জ্যোস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত এ কাব্য আপনি উৎসারিত। কোন বন্ধন নয়, কোন দর্শন নয়, কোন ধর্মতত্ত্ব নয়—গীতিকবিতা এ সকলের উর্ধে বন্ধনহীন এক অনবদ্য শৈল্পিক প্রকাশ। মনের লীলাখেলাই এখানে বড় কথা—রসের মায়ালোকেই এ সব কবিতার যাতায়াত।

উপরে গীতিকবিতার যে সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে আমরা পরিচিত হলাম সে মানদণ্ডে বিচার করলে দেখ্‌তে পাব উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গীতিকবিতা রচিত হয়নি—যদিও বিভিন্ন কবির কাব্যে সমধর্মী অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের জন্ম-লগ্নে যে কাব্য রচিত হয়েছে সেই ধর্মোপদেশের রক্ত-চক্ষু শাসিত চর্যপেদেও মাঝে মাঝে গীতিকবিতার ঝংকার শোনা গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ৪নং পদের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে:

জোইনি তঁই বিণু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি॥

[যোগিনী তোমায় ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত থাক্‌তে পারবো না, তোমার মুখ চুম্বন করে কমলরস পান করবো।]

এ ছাড়াও আরো কয়েকটি পদের বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করে চর্যাপদ যে গীতিধর্মী তা' বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐ বলাই যায়—এ মন্তব্য ধোপে টেঁকে না। চর্যাপদের গীতি কবিতা এক মুখ নিয়ন্ত্রী, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সুকঠোর নিয়ন্ত্রনে গীতিকবিতার সুর খান খান হ'য়ে ভেঙে গেছে। তা ছাড়া এখানে গুহ্য সাধন-সংকেত প্রকাশের জন্যে গীতিকবিতা প্রযুক্ত হওয়ায় তার সকল বৈচিত্র্য ম্লান হয়ে গেছে। এর থেকে বরং অপভ্রংশে রচিত কবিতাবলীতে গীতি-স্পন্দন ঢের বেশী সুস্পষ্ট। প্রাকৃত পৈঙ্গল থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

নব মঞ্জরি সজ্জিঅ চুঅঅ গাছে।
পরিফুল্লিঅ কেসু নআ বনে আছে ॥
জই এথি দিগন্তর জাহিই কন্তা।
কিঅ বম্মহ ণখি কি ণখি বসন্তা ॥

[আমের গাছে নূতন বোল ধরেছে, বনে নূতন-ফোটা পলাশ ফুল আছে। এমন সময় যদি প্রিয়জন বিদেশে যায় তবে কি ভাব্‌ব ভালোবাসার দেবতা নেই, না বসন্ত নেই ?]

এখানে গীতিকবিতাসুলভ ভাবাবেগ সুন্দর রূপে বাক্‌বদ্ধ হ'য়েছে কিন্তু এমন কবিতা নিতান্ত দুর্লভ।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিভিন্ন আখ্যান কাব্যের মাঝে মাঝেও গীতিকবিতার সুকোমল অভিব্যক্তি দেখা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে ফুল্লরাকর্তৃক দেবীর নিকট আপন দারিদ্র-বর্ণনায় কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাই প্রকাশিত হ'য়েছে। "ময়নামতীর গান"-এ গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্ভাবনায় বিচলিত বধূগণের হৃদয়ার্তিতে যে বেদনা ফুটে উঠেছে তা' একান্তভাবে গীতিকাব্যের সামগ্রী। এ ছাড়া বাংলার বিভিন্ন লোকগাথা-গুলির মধ্যে গ্রাম্য ভাষায় বিভিন্ন আখ্যানে নায়ক-নায়িকার যে সুতীব্র হৃদয়ভেদী হাহাকার এবং সুনিবিড় প্রেম-মিলন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আদর্শ গীতিকবিতা হিসেবে তাদের মূল্য অপরিসীম। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত "মৈমনসিংহ গীতিকা"র 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কমলা' ইত্যাদি পালাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতার সকল উপাদান বর্তমান।

এরপর বৈষ্ণবপদাবলীর কথা—গীতিকাব্য হিসেবে যাদের অবদান প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীকে গীতিকাব্যের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করা বিপদের কথা। আমরা পূর্বেই বলেছি গীতিকবিতা একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ব্যক্তিহৃদয়ের আশা আকাঙ্খার প্রকাশে সমুজ্জ্বল কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে ব্যক্তি-হৃদয় অপেক্ষা গোষ্টিচেতনা এবং ধর্মীয় অনুশাসনই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এ কাব্যের যাত্রাপথ বাধা, চারণ-ভূমি সীমিত। সীমার বাইরে গেলেই কুলত্যাগী হতে হয়। রাধাকৃষ্ণই এ কাব্যের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং এই বন্ধন-পীড়িত সীমিত পথে পদচারণায় গীতিকাব্য হিসেবে বৈষ্ণবপদাবলীর মান বার বার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু এই সকল বন্ধন ও নিয়ম-নীতির মাঝখানে থেকেও যে বৈষ্ণবকাব্যে গীতিকবিতার সুরঝংকার এসেছে সে কথা কোন ক্রমেই

উপেক্ষা করা যায় না। বিশ্বকবির জিজ্ঞাসায় সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে দিলে পদাবলীকে প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য বলতে আমাদের কোনই বাধা থাকে না। বৈষ্ণবকাব্যকে গীতিকাব্য বলার সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হ'ল এই যে এ কাব্য কবির ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনা প্রকাশের কাব্য নয়—রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের কাব্য, প্রাত্যহিক মানব-জীবনের সাথে তার বড় একটা যোগ নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?···
···সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?···

বস্তুতঃ বৈষ্ণবকাব্য পরোক্ষভাবে মানব-জীবনেরই কাব্য। মানুষের মিলন-বিরহ, কামনা-বাসনা রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমানের অন্তরালেই সুপ্ত হয়ে আছে। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে কবি যে কথা বলেছেন বস্তুতঃ পক্ষে তা' কবির নিজেরই কথা, আপন আত্মার উপলব্ধি। এবার নিম্নে কয়েকজন বৈষ্ণবকবির গীতিমুখর পদের উল্লেখ করা হলো। প্রথমেই চণ্ডীদাসের পদ—বিরহ-বিধুর-রাধার ম্লান-মূর্তি বর্ণনা :

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেমতি যোগিনী পারা ॥

এরপর জ্ঞানদাসের পদ :

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

অন্যত্র :

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া দিব ॥

বস্তুতঃ এ সব কবিতায় গীতিধ্বনি সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় আরোপ করা চলে না। কবির হৃদয়বেদনা মূক অক্ষরের বুকে বুকে করুণ হ'য়ে ছড়িয়ে

পড়েছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের কাব্য হ'তে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু স্বল্পেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ।

বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"ও মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার সুর ঝংকার শোনা গিয়েছে। এখানে দু'টি পদের উল্লেখ করা হলো :

কে না বাঁশী বাত্র বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাত্র বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।...

অন্যত্র :

বড়ায়ি গো—কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদের রচনায় গীতিকবিতার আর এক অভিনব অভিব্যক্তি দেখা যায়। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কাব্য রচিত হলেও অপরিসীম আন্তরিকতার গুণে তাঁর কবিতা গীতিকাব্যের রসলোকে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেয়েছে। আগমনী-বিজয়ার সংগীতগুলি যেন কবির অশ্রুজলে সিক্ত। ভক্ত-হৃদয়ের আকূতি মাতাপুত্রের মান-অভিমানের ভিতর দিয়ে যে রূপে প্রকাশিত হ'য়েছে তার সবটুকুই কবি-হৃদয়ে সঞ্চিত বাৎসল্যরসেরই প্রকাশ। 'মা হওয়া কী মুখের কথা—যে না জানে সন্তানের ব্যথা' কিংবা 'আমায় দেমা তবিলদারী আমি নিমকহারাম নই মা শঙ্করী' ইত্যাদি সংগীতগুলিতে কবি হৃদয়ের অনন্ত কামনা-বাসনা যেন শত ধারায় ভেঙে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে আধুনিক কালের কোন কোন যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীকার এবং কবিওয়ালার রচনায়—বিরল-দর্শন হলেও—কিছু কিছু গীতিকাব্যের আমেজ পাওয়া যায়। রাম বসুর একটী পদ :

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হ'ল না ॥...

শ্রীধর কথকের আর একটি পদ :

ভালবাসি ব'লে ভালবাসিনে।
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে ॥...

এ সকল পদে যে হৃদয়ার্তি এবং আন্তরিকতা মিশে আছে তা' এগুলিকে দুর্লভ সৌন্দর্য দান করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ মহাকাব্য রচনার

যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু আবার এই যুগেই বাংলায় যথার্থ গীতিকাব্য-রচনার সূত্রপাত। মহাকবি মধুসূদনের কথাই ধরা যাক। 'মেঘনাদ বধে' তাঁর অসুর বলধারী নায়ক সর্বদাই বীর বিক্রমে গদা ঘুরিয়ে ফিরেছেন, আপন সুখ-দুখের অন্তরালে মন লুকিয়ে একবারও কেঁদে ওঠেনি এমন কথা জোর করে বল্‌বে কে? বীরবাহুর মৃত্যুতে প্রথম সর্গ এবং মেঘনাদের পতনে নবম সর্গ রাবণের অতলান্ত বিরহ-ক্রন্দন এবং সীতার পঞ্চবটী প্রবাসের সকরুণ বর্ণনা—চতুর্থ সর্গ—যে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের অনন্ত অসীম হাহাকারেরই রূপায়ণ। গীতিকাব্য হিসেবে এঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'রও একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যে শ্রীরাধার সুতীব্র ব্যাকুলতা হৃদয়-স্পর্শী হ'য়ে প্রকাশ লাভ করেছে। বলাবাহুল্য মধুসূদনের রাধা অপ্রাকৃত নয়—প্রাকৃত, সুতরাং তাঁর হৃদয়াকুলতা ও তীব্র মিলনাকাঙ্খা যৌবন-বিহ্বল সাধারণ যুবতীরই মত। কিন্তু কবি মধুসূদনের ব্যক্তিহৃদয়ের ব্যথা-বেদনাগুলি শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি লাভ করেছে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র সনেটগুচ্ছের মধ্যে। আত্মবিলাপ সম্পর্কিত কবিতাগুলি এই জাতীয় কবিতার মধ্যমণি। আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় (আত্মবিলাপ), যেওনা রজনী আজি লয়ে তারা দলে (বিজয়া দশমী), হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন (বঙ্গ ভাষা) ইত্যাদি কবিতাগুলিতে ব্যক্তি মধুসূদনের স্বরূপ একেবারে উন্মুক্ত হ'য়ে উঠেছে। মহাকাব্যের বিরাট বিপুল উর্মিমুখর মহাসাগরের কূল ত্যাগ করে কবি এ কাব্যে চলে এসেছেন আপন হৃদয়লোকে, কথা কয়েছেন মনে মনে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রের পরিচয় মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবে—কিন্তু আমাদের মনে হয় মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র যথার্থ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তাঁর সিদ্ধির ক্ষেত্র রচিত হয়েছে গীতিকবিতায়। তাঁর কবিতাবলীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—প্রকৃতি বিষয়ক, জাতীয় ভাবোদ্দীপক, তত্ত্বমূলক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা তিনি লিখেছেন কিন্তু সকল কবিতার উপর কবি হৃদয়ের একটি গীতিমুখর আবেগ বিশেষরূপে লক্ষণীয়। 'অশোক তরু' কবিতাটি নৈরাশ্য ও বেদনার সুরে ঝংকৃত। 'পদ্মের মৃণাল' কবিতায় পদ্ম-মৃণাল গৌণ আসলে ঐ বস্তুটিকে কেন্দ্র করে কবি আপন ধ্যান-চিন্তায় মেতে উঠেছেন। 'হতাশার আক্ষেপ' কবিতাটি হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার একটি।

নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যগুলিও একান্তরূপে গীতিকাব্যমুখীন। সর্বত্রই একটি হৃদয়াবেগ, একটি অসীম আকূতি ক্রমবর্ধমান হয়ে মহাকাব্যের বিষয়মুখীন

গতিপথকে খণ্ডিত করেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মধ্যেও কোথাও কোথাও গীতিকবিতার আমেজ মিশে আছে। তাঁর 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি কবিতাবলীতে যে অভিনব হৃদয়-স্পর্শ মিশেছে তা' এই কবিতাগুলিকে একান্তভাবেই গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক গীতিকাব্যের রচয়িতা হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। এঁর কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির কল্পনা-রঙিন ঐশ্বর্য-দীপ্ত প্রকাশ দেখেছি। তাঁর কাব্যেই যেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি হৃদয়ের বাসনা-কামনাগুলি নম্র-মনোহর হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'সূর্যাস্তবালের স্বুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলিতে' সর্বপ্রথম আমরা এক অপরূপ রূপের সন্ধান পেয়েছি। ইতিপূর্বে আমরা যে সকল কবির কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের কল্পনা প্রধানতঃ বহির্বিশ্বাভিসারী, সময় সময় তাঁরা ফিরে এসেছেন আপনার অন্তরে কিন্তু এই সর্বপ্রথম আমরা এমন একজন কবির সাক্ষাৎ পেলাম যিনি আমরণ আপন অন্তর দেউলের ছায়ালোকে পূজারতি দিয়েছেন, সংগীত রচনা করেছেন নির্জনে—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা লিরিকেব সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে। রূপমুগ্ধ কবি রহস্যময় প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেছেন :

কহে সে রূপের কথা,
বসন্তের তরুলতা ;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন-ফুল ;
শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলঢুল্।

অন্যত্র :

পূর্ণিমা প্রমোদ আলো
নয়নে লেগেছে ভালো ;
মাঝে উথলে নদী দুপারে দুজন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দুপারে দুজন।'

এসব কবিতায় রোম্যান্টিক কবির স্বপ্ন-তন্ময়তাই প্রধান হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন কবি অক্ষয় কুমার বড়াল এবং কামিনী রায়ের নামও এ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয় কুমারের কবিতাতেও গীতিকাব্যের সুন্দর আমেজ আছে। তাঁর 'সন্ধ্যা' নামক কবিতাটির কিছু অংশ :

দূরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুল তনুখানি।
তরল গুণ্ঠণ আড়ে
মুখশশী উঁকি মারে,
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেমবাণী॥

কবিহৃদয়ের একটি মুক্তা-নিটোল আকৃতি এখানে সুন্দররূপে বাক্-বন্ধ হয়েছে। কামিনী রায়ের কবিতাতেও একটি সুকোমল রোম্যান্টিক সুর লক্ষণীয়। তাঁর একটি কবিতার অংশ :

দু'খানি সুগোল বাহু দু'খানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি সৈথায় বেঁধেছে ঘর ;
রূপ আদি কাছে টানে, গুণে বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে যেন হাতছানি দিয়া।

এ কবিতার ছন্দ সাধারণ, ভাষা মোলায়েম কিন্তু এই অনাড়ম্বর ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া কবির সমগ্র হৃদয়টি যেন উন্মুক্ত হ'য়ে উঠেছে।

এরপর রবীন্দ্রনাথ—কল্পস্বপ্নের প্রথম রাজপুত্র, গীতিকাব্যের যাদুকর। এঁর হাতেই বাংলা গীতিকাব্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে। ইতিপূর্বে আমরা গীতি-কবিতার রচয়িতা হিসাবে যে সকল কবির নাম করেছি তাঁদের প্রত্যেকের রচনায় কিছু কিছু দোষ-দুর্বলতা বর্তমান। মধুসূদনের মধ্যে সংস্কৃতানুগ শব্দা-ড়ম্বার এবং মহাকাব্যসুলভ উপমা-উৎপ্রেক্ষার উৎকট প্রয়োগ থাকায় গীতিকবিতা হিসাবে তার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বিহারীলালের মধ্যে গীতি কবিতার আবেগ উচ্ছ্বাস এবং সকল উপাদান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ ভংগীর দুর্বলতা হেতু গীতি কবিতার সম্ভ্রম ও সৌকুমার্য লুপ্ত-প্রায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভোরের স্বপ্নঘেরা সুনীল আকাশের শুভ্র শুকতারা, সকল কালিমা সকল ম্লানতা হ'তে মুক্ত—সৌন্দর্য-সৌধের লীলানিকেতন। রবীন্দ্রনাথের আগমনে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যেন যুগান্তর এলো—শোনা গেল দূরাগত অসীম সমুদ্রের উদাত্ত জল-কল্লোল। ঘর বার একাকার হয়ে গেল, অসীম সসীমের সকল ব্যবধান লুপ্ত হলো, সুদূর আকাশ গৃহের আঙিনায় ধরা দিল। যা' কিছু বিস্ময়কর, যা কিছু রহস্যময় রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য কৌতূহলে তুলির আল্পনায় তুলে ধরেছেন আমাদের বিস্ময়-নির্বাক দৃষ্টির সম্মুখে। "প্রভাত সংগীত" হ'তে যেন নবীন বাংলা গীতিকবিতার সুপ্রভাত হলো। ভোরের ছায়ালোকে সেই যে কোন শুভ মুহূর্তে বৃক্ষান্তরাল হ'তে সূর্য ওঠার দৃশ্যে কবির হৃদয় খুলে গেল—সেই হতে তিনি হৃদয়েরই গান গেয়েছেন। অন্তরের অন্তরালে মন লুকিয়ে সুখে দুখে কেঁদেছেন—সেই অশ্রুই তাঁর কাব্যে স্বর্ণ-শতদলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রভাত সংগীতের পর 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', ইত্যাদি যত কাব্যই লিখেছেন তার প্রত্যেকটি গীতিকাব্যের দুষ্প্রাপ্য সৌন্দর্যে

অম্লান। কেবল ভাবে নয়—ভাষায়, শব্দ ঝংকারে, ছন্দ-সুষমায় এ সকল কাব্যে মহিমা-দীপ্ত বৈচিত্র্য সম্পাদিত হ'য়েছে বাংলা কাব্যে তা' বিরল-দৃষ্ট। রবীন্দ্র-কাব্য হ'তে গীতিকবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া গোষ্পদে অসীম আকাশের প্রতি-বিম্বন দেখান সমান কথা, ধৃষ্টতা মাত্র—রবীন্দ্রনাথের সারাটা জীবন যেন গীতি-কবিতার সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে। তাঁর গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোথাও আপন হৃদয়ের স্পর্শ হারাননি, যে সকল কবিতায় তিনি এ লোকের কথা ছেড়ে নিছক সে লোকের কথা বলেছেন সেখানেও তাঁর কবিতাগুলি হৃদয়-স্পর্শে অনন্যসুন্দর।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাত-কীর্তি হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার জনপ্রিয়তায় নজরুল ইসলাম তুলনারহিত। সংগীত রচয়িতা হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতকার হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। ঝংকার মুখর শব্দযোজনায় এবং ছন্দের দোদুল দোলায় এঁরা কাব্যের মধ্যে যেন আপন খেয়াল খুশীর মালা গেঁথেছেন। গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে বাংলা কাব্য অত্যাশ্চর্য শক্তি সম্পন্ন। পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের গীতিকাব্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার দুর্জয় শক্তি তার আছে।

॥ তিন ॥

॥ উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

ক ॥ প্রাথমিক অবস্থা : উপন্যাসের সূত্রপাত ॥

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়—বিশ্বের সকল সাহিত্যেই, উপন্যাস আধুনিক কালে সামগ্রী। ইংরেজী সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্যাস মাত্র আড়াই শো বছর পূর্বে রচিত। পূর্বে যে সামাজিক পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশে উপন্যাসের জন্ম সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ উপন্যাস গণতন্ত্রেরই দান। প্রাচীন সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনের সর্বত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য সূচিত হলো, সামাজের সকল প্রকার বন্ধন ছেদন করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি দুর্বার গতি চলমান জীবন প্রবাহের সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নয়—সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও দেখা দিল আত্মমর্যাদা-বোধ এবং ব্যক্তিত্ব-জাগরণের তীব্র স্পৃহা। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এই সুতীব্র স্পৃহা এবং আকুলতা হ'তেই উপন্যাসের জন্ম। মানুষের আত্ম-বিকাশের এই আন্দোলনই উপন্যাসের সূতিকাগার।

প্রাচীন যুগে সে সামাজিক পরিবেশ ছিল সেখানে মানুষ হিসেবে আপন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কোন পথ ছিল না। সে যুগ ছিল ধর্ম-শাসিত যুগ। ধর্মই সেখানে উচ্চ-শির হ'য়ে মানুষের আত্ম-বিকাশের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। তাই প্রাচীন যুগে যে কাব্য রচিত হ'য়েছে তাতে দেখি দেব-দেবীর কথা, অপ্রকৃত নায়ক-নায়িকার আকাশ-বিহারী চিত্র অথবা অতিমানবের উদ্ভট লীলা-খেলা। কিন্তু কালের ক্রমাগ্রগতির সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশ-পরিবর্তনের জন্যে এই অতিমানবদের অতি লীলাখেলার পথ সংকীর্ণ হ'য়ে এল। এতদিন কর্ম-ক্লান্ত যে মানুষ ছিল যবনিকার অন্তরালে এবার তারা বেরিয়ে এল প্রেক্ষাগৃহের আলোকোজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সম্মুখে—জীবন-নাট্যের নায়ক হ'ল তারাই। শুরু হ'ল আত্মবিকাশোন্মুখ সংগ্রামশীল মানুষের জীবন-কথা রচনার—উপন্যাসের।

বাংলায় উপন্যাস-সৃষ্টির মূলে ব্যক্তিত্ব-জাগরণের এই স্পৃহা ছাড়াও প্রধান প্রেরণা এসেছে ইংরাজী উপন্যাস হ'তে। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সাথে আমাদেয় সাহিত্যে যে নতুন সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল উপন্যাস তাদের অন্যতম। সুতরাং বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস-রচনায় পাশ্চাত্ত্য নভেলের প্রভাব যে বিশেষ রূপে ক্রিয়াশীল তা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কিন্তু নভেলের প্রেরণায় এবং আদর্শে আমাদের ভাষায় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচিত হওয়ার পূর্বেও উপন্যাস-রচনার এক বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃত গ্রন্থের সাথে বাঙালীর পরিচয় বহু-পূর্বের। সংস্কৃতের কয়েকটি আখ্যায়িকা গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের বীজ সুস্পষ্ট। কথাসরিৎসাগর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, কাদম্বরী ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্যে উপন্যাসের মৌলিক উপাদান গুলির কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। অল্পরস পিপাসু পাঠক-সম্প্রদায়ের চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রথম দিকে এই সংস্কৃত আখ্যায়িকা কাব্যের অনুবাদ শুরু হয়। তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত বানভট্টের 'কাদম্বরী' এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মধ্যযুগে বাংলায় যে সব আখ্যায়িকা কাব্য রচিত হ'য়েছিল তাদের কোন কোনটার মধ্যে উপন্যাসের বীজ বর্তমান। মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'-তে আমরা যে চরিত্রগুলির সাথে সাক্ষাৎ লাভ করি তাদের মধ্যে আত্মবিকাশের একটি প্রবল স্পৃহা বর্তমান। এই গ্রন্থের 'স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ-চরিত্রাঙ্কণে, কুশল-ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ

সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পেয়ে থাকি।' বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই বস্তুতান্ত্রিক কথা সাহিত্যের অগ্রদূত।

এ ছাড়াও আমাদের দেশে প্রচলিত লৌকিক গল্প এবং রূপকথার মধ্যেও সংগ্রামশীল মানুষের পরিচয় এবং উপন্যাসের আমেজ আছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে আমরা যে গীতিকাগুলির সাথে পরিচয় লাভ করি সেগুলি উপন্যাসের কেন্দ্র-ভূমি হ'তে জন্মলাভ করেছে। কি চরিত্র-চিত্রণে, কি ঘটনা-সন্নিবেশে, কি নাটকীয়তা সৃষ্টিতে, কি সংগ্রামশীল মানুষের বেদনা-চিত্রণে সর্বত্রই উপন্যাসের মৌলিক লক্ষণগুলি আপন স্বরূপে বিকাশমান। বস্তুতঃ এ আখ্যায়িকাগুলির বুকেই শোনা গিয়েছে উপন্যাসের আগমনী।

সংস্কৃত আখ্যায়িকার অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল ইংরাজী নভেল-অনুবাদের মাধ্যমে তা' আরো দ্রুততর এবং গতিসম্পন্ন হলো। এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত জনসনের 'রাসেলাস'।

অনুবাদের কথা ছেড়ে দিলে বাংলায় কে সর্বপ্রথম উপন্যাস রচনা করেন সে বিষয়ে তর্কের অবধি নেই। এ বিষয়ের আলোচনায় এগিয়ে এসে অনেকেই অনেক কথা এবং মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সাধারণের বিশ্বাস প্যারীচাঁদ মিত্র-ই বাংলায় উপন্যাস রচনার আদি পুরুষ। কোন কোন সমালোচক এই দুর্লভ সম্মান দিতে চেয়েছেন "নব-বাবু-বিলাস"-এর লেখক প্রমথনাথ শর্ম্মাকে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮২৩ খৃঃ। এর পূর্বেও প্রকাশিত হয় "বাবু"—১৮২১ খৃষ্টাব্দে সমাচার দর্পন পত্রিকায়। বাবু এবং নব-বাবু-বিলাস এক জাতীয় গ্রন্থ। বস্তুতপক্ষে 'নব-বাবু-বিলাস' 'বাবু'-রই পল্লবিত সংস্করণ। এই উভয় গ্রন্থেই 'বাবুজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্যকালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।' কিন্তু তবুও এই উভয় গ্রন্থের কোনটিকেই উপন্যাস বলা যায় না। কেননা উভয় গ্রন্থের কাহিনী অংশ নিতান্ত দুর্বল। তা' ছাড়া চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়েও কোন উন্নত শিল্প-বোধের পরিচয় নেই। উভয় গ্রন্থে বাবু চরিত্রের যে চিত্রণ দেখি—বহু বছর পূর্বে রচিত মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা দাসী, ফুল্লরা এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী ইত্যাদির চরিত্র চিত্রণে তদপেক্ষা বলিষ্ঠ শিল্প বোধের পরিচয় রয়েছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়—কথোপকথনের ভাষা। নব-

বাবু-বিলাসের মত ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থের মধ্যেও গদ্য এবং পদ্য ব্যবহৃত হওয়া উপন্যাস হিসেবে এর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সংলাপের জন্যে যে ভাষার প্রয়োজন উইলিয়াম কেরী সর্বপ্রথম তার নমুনা প্রকাশ করেন 'কথোপকথন' গ্রন্থে। কিন্তু 'কথোপকথনে'র সংলাপ উপন্যাসোচিত হলেও গ্রন্থটি উপন্যাস হয়নি— কেননা এতে কোন গল্পাংশ নেই।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাচীন ধরণের আখ্যায়িকা প্রচুর পরিমাণে লিখিত হয়েছিল। গোপীমোহন ঘোষের "বিজয় বল্লভ" (১৮৬৩ খৃঃ) এই জাতীয় গ্রন্থগুলির অন্যতম। "বিজয় বল্লভ" রচনায় লেখক ইংরাজী নভেলের আদর্শ গ্রহণ করলেও গ্রন্থটি উপন্যাস হয়নি—উপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। এ ছাড়াও গ্রন্থটির মস্তবড় দুর্বলতা এর ভাষা। বিদ্যাসাগরীয় সংস্কৃতানুগ ভাষা গ্রন্থখানির উপন্যাস হ'য়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপর প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৭ খৃঃ) এবং কালী প্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" (১৮৬২ খৃঃ) গ্রন্থ দু'খানির নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" যদিও "আলালের ঘরের দুলালে"র পরে রচিত তথাপি গ্রন্থখানি "আলালের ঘরের দুলাল" অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের। হুতোম প্যাঁচার নক্সা সম্পর্কে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেনঃ "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" ঠিক উপন্যাস নহে—নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রের ও সরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্যের নূতন জোয়ারে নাগরিক জীবন-যাত্রায় যে সমস্ত উদ্ভট অসঙ্গতি ও রুচি বিচারের দৃষ্টান্ত, স্ফূর্তি-ইয়ার্কির নূতন নূতন প্রকরণ উপভোগের যে মত্ত আতিশয্য ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তীব্র-শ্লেষপূর্ণ কশাঘাত করিয়া নিজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগচঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই— সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।"

বস্তুতপক্ষে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" থেকেই বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত। অবশ্য এই শ্রেণীর রচনার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা এবং চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিয়ে এঁর রচনাকে উপন্যাস-আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। এদিক দিয়ে "আলালের ঘরের দুলাল" অনেকখানি ত্রুটিশূন্য।

কোন গ্রন্থ উপন্যাস হ'ল কি না তার জন্যে আমাদের চারটি বিষয়ের ওপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখতে হবে। উপন্যাসের প্রধান চারটি অঙ্গ এই :
ক ॥ গল্পাংশ খ ॥ চরিত্র-চিত্রণ গ ॥ পরিবেশ বর্ণনা এবং ঘ ॥ সংলাপ। এই মানদণ্ডে আমারা "আলালের ঘরের দুলাল"কে বিচার করে দেখব গ্রন্থখানিকে আদর্শ উপন্যাস বলা যায় কিনা।

প্রথমতঃ গল্পাংশ। অধিকাংশ সমালোচক "আলালের ঘরের দুলাল"কে বাংলার প্রথম উপন্যাসের দুর্লভ মর্যাদা দান করলেও একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে গ্রন্থখানির গল্পাংশ নিতান্ত দুর্বল। কাহিনীর ধারাবাহিকতা সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ এবং খণ্ডিত হয়েছে। এমনকি এতে যে কোন মূল কাহিনী আছে তা' গ্রন্থ পাঠের পরও কল্পনা করতে বাধে। প্রতিটি উপন্যাসে থাকে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী—যে কাহিনীকে অবলম্বন করে পল্লবিত হয়ে ওঠে সমগ্র উপন্যাস, বিকশিত হয়ে ওঠে চরিত্রাবলী। কিন্তু দুঃখের বিষয় "আলালের ঘরের দুলাল"এ তেমন কোন ভাব-সংহত কেন্দ্রিয় কাহিনী নেই—আছে কতকগুলি বাস্তব ঘটনার শিথিল সমাবেশ। কিন্তু বাস্তব চিত্রাঙ্কনে উপন্যাস হয় না—আদর্শ উপন্যাসের জন্যে এই বাস্তব-চিত্রাবলীকে এমন ভাবে ঘটনা পরম্পরায় সজ্জিত করতে হবে যাদের ঘনসন্নিবিষ্ট সমাবেশে জীবনের এক একটি মহত্তর ও জটিলতর দিক আপন মহিমায় পাঠকের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। প্যারীচাঁদ মিত্র সে গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। তিনি বিচিত্র বর্ণ-দীপ্ত পুষ্প চয়ন করেছেন কিন্তু সেগুলিকে অলংকার সুষম ভংগিমায় গেঁথে দিতে পারেন নি। উত্তম মালাকারের যোগ্যতা হতে তিনি ছিলেন বঞ্চিত।

এরপর চরিত্র-চিত্রণ। কিন্তু এখানেও প্যারীচাঁদ মিত্রের দুর্বলতা এবং কৃতিত্ব যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। Type চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক যুগে তা' নিতান্ত দুর্লভ। 'ঠকচাচা এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি ; উহার মধ্যে কূটকৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামাণ্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হয়েছে যে, পরবর্তী উন্নতশ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এরূপ সজীব চরিত্র মেলে না : বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম, প্রভৃতি চরিত্রও—কেহবা আনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সংগীত-প্রিয়তায়, কেহবা কোন বিশেষ বাক্য-ভংগীর পুনরাবৃত্তিতে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।' এমনি কতকগুলি পার্শ্ব Type চরিত্র সৃষ্টিতে কৃতীত্ব অর্জন করলেও মূল চরিত্রাঙ্কণে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিশেষত্ব মোটেই প্রকাশিত হয়নি। সেখানে তাঁর চরিত্রাঙ্কণ-প্রতিভার দৈন্য বিশেষরূপে স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। নারী চরিত্রগুলি তো নিতান্ত দুর্বল। স্ত্রী চরিত্রগুলি যে রক্ত মাংসের একথা মনেই হয় না। তারা নির্জীব পুতুল মাত্র—কেবল সংলাপগুলি তাদের মুখ দিয়ে স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হ'য়েছে। চরিত্র-চিত্রণের ভিতর দিয়ে উপন্যাসের অন্তর-বিপ্লব পাঠকের গহন-মনে গভীর রেখাপাত করে কিন্তু "আলালের ঘরের দুলাল"-এ চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে তেমন কোন অন্তর্বিপ্লবের প্রকাশ ঘটেনি। এ উপন্যাসে যা' কিছু সংঘাত এসেছে তা একান্তভাবে বাইরের জিনিষ—অন্তর্জগতের নয়। মতিলালের অনুতাপ, অনুশোচনা এবং সংশোধন একান্ত ভাবে বাইরের ঘটনার চাপে সম্ভব হ'য়েছে—এই সংশোধন অন্তরের প্রেরণায় বা পরিবর্তনে হয়নি। অন্তরের অনুশোচনা-দাহনে জ্বলে-পুড়ে নিখাদ করে চরিত্র গঠনের জন্যে যে উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার প্রয়োজন তা' প্যারীচাঁদ মিত্রের ছিল না।

পরিশেষে পরিবেশ-বর্ণনা এবং সংলাপ। উপন্যাসের এই দুই অঙ্গ-চিত্রণে প্যারীচাঁদ মিত্র আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। 'আলাল'-এর পরিবেশ-চিত্রণের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নববাবু-বিলাস' এবং 'হুতোমে'র সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটি গ্রন্থে কেবল হাল্‌কা স্ফূর্তির উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেশ্যালয় বর্ণিত হইয়াছে। 'আলালে'র পরিবেশ আরও পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানা-মুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহলপূর্ণ কার্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-শাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনের গতিচ্ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র।" 'আলালে'ই বোধ হয় আমরা সর্বপ্রথম যুগপৎ কলকাতীয় পরিবেশ এবং গ্রামীন-জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র পেলাম। পরিবেশ-বর্ণনা কুশলতায় উভয় চিত্রই অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার যে সংস্কৃতানুগ আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন প্যারীচাঁদ মিত্র নিপুনকুশলতায় সে ভাষা ত্যাগ করে আটপৌরে কথ্য ভাষাকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। এবং এই সংলাপ চরিত্র-বিকাশের বিশেষ উপযোগী হ'য়েছে। 'আলালে' যে ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছে তা' কেবল উপন্যাসের সংলাপেই নতুনত্ব এনেছে তা' নয়—কথ্য-ভাষার সাহিত্যে

ক্রমপ্রবেশাধিকারের ইতিহাসেও তার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভাষার বিবর্তন-ধারায় "আলালের ঘরের দুলাল" তাই গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা হ'তে আমরা বুঝতে পারছি 'আলাল'কে যে অধিকাংশ সমালোচক বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস বলেছেন সে মত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। গ্রন্থের গল্পাংশ দুর্বল এবং শিথিল-গ্রথিত, চরিত্র-চিত্রণ অস্পষ্ট এবং মৌলিকতাহীন, সর্বোপরি উপন্যাসের প্রাণ যে প্রণয়-রস তা' এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। কতকগুলি বাস্তবানুগ ঘটনা ও চিত্রের সমাবেশে গ্রন্থখানি সরব হ'য়ে উঠেছে মাত্র। সুতরাং গ্রন্থখানিকে উপন্যাস বলা চলেনা, সার্থক উপন্যাস তো নয়-ই। সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করে 'আলাল'কে চিত্রোপন্যাস বলাই সঙ্গত।

এ গ্রন্থে উপন্যাস-সুলভ যে ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বর শোনা গিয়েছে তা সুশ্রাব্য নয়, কিছু পরিমানে অস্পষ্টও—এই স্বরই তান-লয়ের বিচিত্র সমাবেশে অপূর্ব সংগীত-মূর্চ্ছনায় বেজে উঠেছে বাংলা উপন্যাসের সার্থক শ্রষ্টা ও শিল্পী বংকিমচন্দ্রের কণ্ঠে। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিম হ'তেই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রস্তাবনা।

"আলালের ঘরের দুলাল" ছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্র 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকতা' নামে আরো কয়েকখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন—কিন্তু সেগুলিও ঠিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের পর বাংলা উপন্যাস রচনায় দু'টি ধারার সাক্ষাৎ পাই। একটি ধারায় রচিত হয়েছে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস অন্য ধারায় রচিত হ'য়েছে বাস্তবতা প্রধান সামাজিক উপন্যাস। নিম্নে বিভিন্ন সামাজিক উপ-ন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায় আমরা যোগ দেব পরবর্তী অধ্যায়ে।

খ ॥ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং সামাজিক উপন্যাস ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা উপন্যাসের যে ক্ষীণধারা উপলবন্ধুর পথ পেরিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে আসছিল সেই ক্ষীণধারাই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-সাগরের মধ্যে পড়ে যৌবনের বিপুল জলোচ্ছাসে গর্জন-মুখর হয়ে উঠেছে। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই হ'য়েছে বাংলা উপন্যাসের নব যৌবন-সঞ্চার। শক্তি এবং সৌন্দর্যে, লাবণ্য এবং সুষমায় বাংলা উপন্যাস নম্র-মনোহর হ'য়ে উঠেছে। যে সকল গুণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের এই অভিনব সৌন্দর্য-সম্ভার-প্রাপ্তি ঘটেছে ভাষা, গঠন-রীতি,

নাটকীয়তা, বর্ণনা-শক্তি, চরিত্র-সৃষ্টি, প্রণয়-রস ইত্যাদি তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভাষা ॥ গদ্যরীতির উন্নতি না হ'লে উপন্যাসের অগ্রগতি সম্ভব নয়। প্রাক্-বঙ্কিম যুগের ভাষা বাংলা উপন্যাসের কিংবা ছোট গল্পের উপযোগী ছিল না। "বিজয় বল্লভ" এবং "অঙ্গুরীয়বিনিময়" এই কারণেই ব্যর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীও ভাষার দিক দিয়ে নিতান্ত দুর্বল। দুর্গেশনন্দিনীতে যে ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছে সেই ভাষাই যদি বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে প্রযুক্ত হ'তো তা' হ'লে উপন্যাস-সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হতেন। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে "দুর্গেশনন্দিনীর" ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। স্বল্পকালের মধ্যেই বঙ্কিম মহৎ উপন্যাসের উপযোগী ভাষা গড়ে তুলতেন। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি লঘু এবং গুরু উভয় প্রকার ভাষাই ব্যবহার করেছেন। স্থানে স্থানে তাঁর সংলাপ শব্দালংকারে পরিণত হ'য়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার কারণ সাহিত্য সম্পর্কে ভ্রান্ত আদর্শ।

গঠন-রীতি ॥ উপন্যাসের প্রধান অংশগুলির মধ্যে একটি হ'লো তার বলিষ্ঠ কাঠামো। এ ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র যে সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা' বিস্ময়কর এবং অভিনব। বর্তমানকাল পর্যন্ত গঠন-রীতিতে বঙ্কিমের সমকক্ষ শিল্পী বাংলা ভাষায় নিতান্ত দুর্লভ। একটি কাহিনী বা ঘটনাকে তিনি এমন ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন—পাঠক-চিত্ত সহজেই তা'তে আকৃষ্ট হয়। বঙ্কিমের যে কোন উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। এমন কি তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"তে আর যত প্রকারের দুর্বলতাই থাকনা কেন—ঘটনা বিন্যাসে তা' ত্রুটিশূন্য। বঙ্কিমের কঠোর সমালোচক সে যুগের পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থের গল্পরসের মনোহারিত্বের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

নাটকীয়তা ॥ বলিষ্ট কাহিনী বলিষ্ঠতর হ'য়ে উঠেছে ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে। নাটকীয় বিন্যাস ভংগীতে কাহিনী যেন বিদ্যুৎ-ইসারায় দুর্নিবার গতি সম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে। বঙ্কিমের প্রতিটি উপন্যাস নাটকীয়তার বিসর্পিল গতিতে সমুজ্জ্বল। ঘটনার শিথিল বিন্যাস নয়, কাহিনীর এলায়িত শ্লোথ গতি নয়—নাটকীয় উত্থান-পতনেই বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রাণ। বঙ্কিমের হাতেই সর্বপ্রথম এলো উপন্যাসের কাহিনীতে নাটকীয় আবেগ।

বর্ণনাশক্তি ॥ বর্ণনা শক্তি সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির আর একটি প্রধান গুণ। বঙ্কিমের বর্ণনা এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় বিভিন্ন উপন্যাসের বহু অংশে ছড়িয়ে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে দুর্গেশনন্দিনীতে

যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা, বীরেন্দ্রসিংহের বিচার, কতলু-খাঁর হত্যা ইত্যাদি। কেবল গুরু গম্ভীর নয় সরল জীবন্ত এবং বাস্তব-বর্ণনাতেও বঙ্কিম সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা, গঙ্গাতীরের এবং ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা বিশেষ রূপে উপভোগ্য। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কবি। কবিত্বশক্তির সঞ্জীবন-স্পর্শে তার বর্ণনাগুলি একান্তভাবে সজীব এবং আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে—দুর্বোধ্যতা বা বিরক্তি উৎপাদনের কোন চিহ্নই তাঁর উপন্যাসে নেই। সর্বত্র একটি সরল এবং সাবলীল গতিভংগী লক্ষণীয়। সময় সময় মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাগুলি একটি অখণ্ড লিরিক কবিতার সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে।

চরিত্র সৃষ্টি ॥ উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র সৃষ্টি। চরিত্রাবলীকে জীবন্ত করে তুল্‌তে পারলে উপন্যাসের অন্যান্য উপাদানেরও সার্থকতা। এই চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধকাম শিল্পী। তাঁর তুলির আল্পনায় অধিকাংশ চরিত্র গহনমনের আবেগ-স্পন্দনে কম্পমান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা এমন কতকগুলি জীবন্ত চরিত্র পেয়েছি বাংলা সাহিত্যে যেগুলি চিরকাল অমর হ'য়ে থাক্‌বে। কপালকুণ্ডলা, রোহিণী, মনোরমা, শৈবালিনী, সূর্যমুখী, আয়েশা, ইত্যাদি চরিত্রাবলীতে আমরা যে উন্নত-শীর্ষ শিল্পী-মানসের পরিচয় পেয়েছি তা' পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাঙ্কণ-শিল্প-প্রতিভার সাথে প্রতিযোগিতা করার স্পর্ধা রাখে। নারী চরিত্র-সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ মনোভংগী বিশেষরূপে লক্ষণীয়। 'নারী চরিত্রে ভোগ ও ত্যাগ, প্রেম ও বৈরাগ্যের যে দ্বন্দ্ব চরিত্রকে রহস্যময় করে তোলে—সেই রহস্য উত্তরোত্তর বঙ্কিমের কবি মানসে ঘনিয়ে উঠেছে। নারী যেন বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের মন্ত্র-দেবতা।'

প্রণয়রস ॥ উপন্যাসের একমাত্র প্রধান আকর্ষণ যে প্রণয়রস একথা সকল মনিষী-সমালোচক এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। বাংলা উপন্যাসে সেই প্রণয়রস সৃষ্টির আদি পুরুষ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই এই প্রণয় রসের জন্ম এবং নবযৌবন-সঞ্চার ঘটেছে। এই প্রণয় রসে তাঁর পুরুষ এবং বিশেষ করে নারীচরিত্রাবলী অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। লালসা, ভোগাকাঙ্খা এবং সার্থক প্রেমের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকা এবং উপনায়ক বা উপনয়িকা ত্রয়কে দিয়ে যে ত্রিভংগীম প্রেম-ত্রিভুজ রচনা করেছেন তা'তে এই প্রণয়রসের অভিনব বিকাশ ঘটেছে। প্রেমের বিসর্পিল পথে পদচারণা করেছিলেন বলেই সৃষ্টিচরিত্রতে বঙ্কিমচন্দ্র এমন সার্থক হ'তে পেরেছেন।

পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে আশ্চর্য সফলতা

লাভ করেছেন তার মূলে উপন্যাসের উল্লিখিত আঙ্গিকগুলি বর্তমান। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা এবং রজনী এই চারখানি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম দু'খানা যে কোন আধুনিক ঔপন্যাসিকের যে কোন উপন্যাসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য আধুনিক কালের বাস্তব সমস্যা প্রধান উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেননি। আধুনিক উপন্যাসে যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের উপন্যাসে তা' নেই—কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কাহিনী যতই কল্পনা-প্রধান হোক না কেন তা'তে স্নেহ-প্রেম, ঘৃণা-প্রতিহিংসা মানব হৃদয়ের প্রবল বৃত্তিগুলি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তা' ছাড়া বিবাহ-সংস্কার গণ্ডীর বাইরে নরনারীর মধ্যে যে প্রেম তা' বিষবৃক্ষের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম স্বকৃতি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্মরণীয়—কৃষ্ণকান্তের উইলের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র অঙ্কণ করেছেন সেটাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রাণ-প্রবাহ। বস্তুতপক্ষে বাস্তব সমস্যা-প্রধান কাহিনী না হলেও অন্যান্য সকল দিক দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক উপন্যাসের জনক।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস সামগ্রিক এবং সার্থকভাবে সামাজিক উপন্যাস নয়। তবুও গোরা, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে ইত্যাদির নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা ঠিক বাস্তবের নন—তবুও তাঁদের মধ্যে প্রণয়রসের আবেগ-স্পন্দিত স্ফূর্তি বিশেষরূপে লক্ষণীয়। মনোবিশ্লেষণের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ সার্থকতর। উভয় ঔপন্যাসিকের মধ্যে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের পাত্র-পাত্রী (রাজা-বাদশা, আমীর-ওমরাহ) অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রী (উচ্চশিক্ষিত ধনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী) অধিকতর বাস্তবের। শরৎচন্দ্রের পাত্র-পাত্রী অধিকতর সাধারণ স্তরের এবং সংগ্রামশীল বাস্তবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ডক্টর শশীভূষণ দাস-গুপ্তের ভাষায় বাংল সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের ক্রমপরিবর্তনের স্বরূপটি সুন্দররূপে ধরা পড়েছে: "দেব-দেবী ছাড়িয়া রাজা বাদশাহদিগের উপর ভর করিয়াছিলাম,—আর একটু নামিয়া ধরিয়াছিলাম উজীর-ওমরাহের দল,—তারপর ধরিয়াছিলাম জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ভূঞাশ্রেণীর মানুষ,—তারপরে অবলম্বন করিলাম রাজধানীর অন্তর্গত তিনতলা বাড়ীতে বাস এমন সব জাঁদরেল জাঁদরেল জীব; কিন্তু আজ দেখিতে পাইতেছি, তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর ত্রিকোণাবর্ত প্রেমের বিলাস হইতে, তাহাদের সৌখিন

সুখ-দুঃখের ইতিহাস হইতে ঘুটেওয়ালীদের লিমিটেড্ কোম্পানিটির ইতিহাসটিই বা ছোট কিসে? 'বাদশাহজাদী প্রেম জানে না'—কি জানে, সে কথা অনিশ্চিত, কিন্তু যে কাবুলিওয়ালাটির ময়লা ঢিলা জামার নীচে বুকের কাছে ছিল তাহার সুদূর পার্বত্যগৃহনিবাসিনী কন্যাটির হাতের ছাপ সে নিশ্চই প্রেম জানে; 'মহেশে'র বিরহে 'আমিনা'র হাত ধরিয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া অজানা পথে নিরুদ্দিষ্ট হইল যে দীনদুঃখী গফুর মিঞা সে নিশ্চই প্রেম জানে।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব-সংসারের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলি ভীড় জমিয়েছে। তা' ছাড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলি যে ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে বাংলা উপন্যাসের অন্যত্র তা দুর্লভ। সামাজিক সমস্যাগুলির দিকেই শরৎচন্দ্র দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। তিনি গভীরভাবে এই সমস্যা ও কুসংস্কারগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে হেনেছেন বজ্রকুঠার। পণ্ডিতমশায়, মেজদিদি, বামুনের মেয়ে, দত্তা, চরিত্রহীন, দেবদাস, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে যে সমস্যা, যে সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টির যে অপূর্ব শিল্প-কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে তা' বাঙালী পাঠক মাত্রকেই বিস্ময়ে নির্বাক করে দেয়। উপন্যাসের সংলাপ এবং ভাষা সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র অত্যাশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা যে সরল, সহজ, মসৃণ সুষমা-মহান ভাষা প্রত্যক্ষ করি আজ পর্যন্ত তা' অন্য কোথাও দেখা যায় নি। এ ভাষা, এ সংলাপ শরৎচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব—তাঁর শিল্প-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি।

বাংলা উপন্যসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্ন্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা উপন্যাস ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

গ ॥ বাংলার ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ও ক্রমবিকাশ ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব-লগ্নটি সংশয়-মণ্ডিত। অনেকে মনে করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত "অঙ্গুরীয় বিনিময়" (আনুঃ ১৮৫৭খৃঃ) গ্রন্থটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। এ সম্পর্কে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংশয়-মুক্ত হ'তে পারেননি। যা' হোক বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে সামাজিক উপন্যাস অপেক্ষা

ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশী পরিমানে রচিত হয়েছিল। অবশ্য তাদের মধ্যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস ছিল না বল্‌লেই চলে। উপন্যাসগুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে 'সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমন কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটী অদ্ভুত সংমিশ্রণে' কিম্ভুতকিমাকার হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনার পূর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস বল্‌তে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। "প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যারের আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র ও বর্ণ-সম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে; অন্যদিকে আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।" বলাবাহুল্য প্রথমযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঔপন্যাসিক মনোভংগী কোনটির পরিচয় মেলেনি। এর জন্যে প্রধান অন্তরায় ছিল ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব। সুলিখিত ঐতিহাসিক উপাদান সম্বলিত কোন পুস্তক তখন ছিল না বল্‌লেই চলে। ফলে লেখকগণ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে গিয়ে ইতিহাসের অমর্যাদা করেছেন, কল্পনায় অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কতকগুলি উপন্যাসের বিষয় বস্তু ইতিহাসের উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যে ওয়াল্টার স্কট যে শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপান্যাস লিখেছেন—উপকরণের অনটনের জন্যে আমাদের সাহিত্যে তা' সম্ভব হয়নি। প্রথম যুগের কয়েকটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক কয়েকটি স্থানের (কাশ্মীর, বিক্রমপুর ইত্যাদি) নামেরই উল্লেখ আছে মাত্র—আসলে ইতিহাসের সাথে মূল কাহিনীর কোন সংযোগ-সূত্র নেই। বিনোদ বিহারী গোস্বামীর 'পূর্ণশশী'—১৮৭৫খৃঃ, ললিত মোহন ঘোষের 'অচলবাসিনী'—১৮৭৫ খৃঃ, হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী'—১৮৭৬ খৃঃ, কেদার-নাথ চক্রবর্ত্তীর 'চন্দ্রকেতু'—১৮৭৭ খৃঃ, রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী'—১৮৭৯ খৃঃ, আনন্দচরণ মিত্রের 'রাজকুমারী'—১৮৮০ খৃঃ, ইত্যাদি উপন্যাসগুলি প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অন্যতম। এবং এদের কোনটিই সার্থক উপন্যাস নয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস, দ্বিতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমের উপন্যাস এবং তৃতীয় শ্রেণীতে প্রাথমিক যুগে রচিত সমুদয় উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করতে চাই কেননা একমাত্র 'রাজসিংহ' ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসের—কাহিনী-ঐতিহাসিকতা বিশুদ্ধ নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সর্বাপেক্ষা বড় বাধা উপকরণের অনটন। বঙ্কিমচন্দ্র উপকরণের এই অভাব পূরণ করেছেন আপনার কল্পনার দ্বারা। আর কল্পনায় ভর করলেই ঘটনার ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। এই কল্পনা প্রবণতার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। অধিকাংশ সময় তিনি ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাকে উপেক্ষা করে প্রেম-বিহ্বল নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষে এই ব্যস্ততা নিতান্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন: "মৃণালিনীতে ঐতিহাসিক অংশ অতিশয় ক্ষীণ ও আনুমানিক বলিয়া মনে হয়।...দেবীচৌধুরাণীতে দার্শনিক তত্ত্ব-প্রিয়তা ইতিহাসকে অভিভূত করিয়াছে। ইহা মূলতঃ পারিবারিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক নহে। সীতারামও মূলতঃ চরিত্র-বিশ্লেষণের উপন্যাস; সীতারামের নৈতিক পদস্খলনের চিত্রটি ফুটাইয়া তোলাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য, ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ মাত্র।...সেইরূপ চন্দ্রশেখরেও যে ঐতিহাসিক অংশটুকু আছে তাহাও আখ্যায়িকার মূল বস্তু নহে।" দুর্গেশনন্দিনীতেও ঐতিহাসিক অংশ অল্প, কেবল নায়ক ঐতিহাসিক পুরুষ। তবে দুর্গেশনন্দিনীতে লক্ষণীয় বিষয় হলো কল্পনা এবং অতিরঞ্জনের দ্বারা এর ঐতিহাসিকতা যতটুকু আছে—ক্ষুণ্ণ হয়নি। একমাত্র 'রাজসিংহ'ই বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের ঘটনাটি ঐতিহাসিক। চরিত্রাবলীও কল্পনার অবাঞ্ছিত প্রবেশে সমাচ্ছন্ন নয়। তথাপি ইতিহাসের বিশাল এবং সংগ্রামশীল ঘটনা-সমূহের সাথে সাধারণ জীবনের সংযোগ-সূত্রের যে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসে তা' নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দোষ-দুর্বলতাগুলি রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে নেই। কল্পনা শক্তিতে রমেশচন্দ্র বঙ্কিম অপেক্ষা দৈন্য—কল্পনার এই দীনতা তাঁর পক্ষে মঙ্গল ফলপ্রসূ হ'য়েছে। কল্পনার এই অনটনের জন্যে রমেশচন্দ্র হয়তো জীবনসমস্যার গভীর-

গহনে প্রবেশ করতে পারেননি কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার পবিত্রতা রক্ষিত হ'য়েছে। "রমেশচন্দ্র কল্পনার অতিশয্য বা আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিতে চাহেন নাই—পরন্তু যথাসাধ্য সত্যচিত্রণেরই প্রায়সী হইয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিকূল আকাশ-বাতাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যতদূর বৃদ্ধি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

'বঙ্গ-বিজেতা' (১৮৭৩ খৃঃ) লেখকের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে অপরিণত হাতের চিহ্ন ছাড়াও বহু দোষ-দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে, চরিত্র চিত্রণের দুর্বলতার তো কথাই নাই তথাপি ঘটনার ঐতিহাসিকতা পরম নিষ্টার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণ' (১৮৭৬খৃঃ) লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির একটি। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ অত্যন্ত অল্প তথাপি ঘটনার বিকৃতি কোথাও ঘটেনি। চরিত্র সৃষ্টিতে এ উপন্যাসে লেখক আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮খৃঃ) এবং 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯খৃঃ) কেবল রমেশচন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়—বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে। এ গ্রন্থ দুটিতে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে তেমনি বর্ণনাভংগী এবং ইতিহাসের বিপুলবেগ আমাদিগকে আবেগে স্পন্দিত করে।

এরপর যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথঠাকুর এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা রাখালদাসের কৃতিত্ব সমধিক। বর্তমান কালে এই সমস্যাবহুল জীবনে ও অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে আর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হচ্ছে না। এখন পুরাতন ঘটনার রোমন্থন অপেক্ষা সমস্যাকীর্ণ জীবন-চিত্রায়নের দিকেই বাংলার ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নিবদ্ধ।

॥ বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ॥

॥ এক ॥

॥ যাত্রার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

মানব শিশুকে ঘিরে কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি বিরাজমান। এই সহজাত বৃত্তিগুলির একটি প্রধান বৃত্তি হ'ল অনুকরণপ্রিয়তা। মানুষের এই চিরন্তন সহজাত অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই যাত্রার উদ্ভব। যার পরিণতি নাটক।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজে মানুষ নৃত্যগীতের উদ্বোধনে লোকধর্ম পালন করতো। অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে সম্মিলিত নর-নারী নাচগানের মাধ্যমে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ ক'রতে ক'রতে একস্থান হ'তে অন্য স্থানে গমন করতো। যাত্রা শব্দটির মূল উৎস এইখানেই—এই স্থানান্তর গমনের মধ্যে। কিন্তু কালক্রমে যাত্রা অর্থে স্থানান্তরে গমন কথাটি আর অপরিহার্য রূপে রইল না—একই স্থানে বসে লীলাভিনয়ের মধ্যে তা সীমিত হ'ল।

স্মরণাতীত অতীতে, বৈদিকযুগে দেবতার সম্মুখে যে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল তার বহু প্রমাণ অতীত যবণিকার অন্তরাল হ'তে আমাদের সামনে এসেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে তার নজির ছড়ানো আছে। যজ্ঞস্থলে সমবেত নরনারীর পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ বিধানের জন্য যে বংশদণ্ডসহ নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল সে কথা ঋগ্বেদের মধ্যেই বিঘোষিত হ'য়েছে। পৌরাণিক যুগেও দেবতার স্নান-পর্ব ইত্যাদি উপলক্ষে অনুরূপ নৃত্যগীতের আনন্দানুষ্ঠান হ'ত। বৌদ্ধযুগে রথোৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীত কৌতুকের মাধ্যমে অগণিত নরনারী যে ব্যাপক ও গভীরভাবে জমাট হৃদয়োল্লাস প্রকাশ করতো ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা জানেন। যাত্রার মূলে প্রাচীন সৌর বৎসরের দানও গভীর এবং ব্যাপক। "সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ করে এই সকল উৎসব এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।"

কিন্তু এত সব আনন্দানুষ্ঠান ছাড়াও বাঙালীর কাছে বুঝি শিবোৎসব বাকি ছিল। ভাল মানুষ শিবকে নিয়ে কোন স্মরণাতীত কাল হ'তে কতভাবেই না কত উৎসব কত পূজা, কত পার্বণের প্রচলন হ'য়েছে। ধর্ম সংহিতায় শিবের

সামনে আনন্দানুষ্ঠাদির এক কৌতুকময় বর্ণনা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। শিব পুরাণ, ধর্মসংহিতা ইত্যাদির কয়েকটি পৃষ্ঠা তো শিবোৎসবের আনন্দানুষ্ঠানের বর্ণনায় মুখর। শিব শস্যোৎপাদক দেবতা—সেই জন্য গ্রাম্য নরনারীগণ তাদের প্রাণের আনন্দ ও বেদনাকে শিবদেবতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। তাই এই দেবতাকে নিয়ে অগণিত গ্রাম্য নরনারী এক ব্যাপক এবং বিপুল আনন্দানুষ্ঠানে মিলিত হ'তো। এই শিবোৎসব হ'তে যে যাত্রা ও নাটকের উৎপত্তি হ'য়েছে এমন অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। এই শিবোৎসব বর্তমানে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে পরিণত হ'য়েছে। 'হনুমান মুখানুষ্ঠান' এই গাজনের অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান। এই হনুমান অনুকরণ প্রিয়তা যাত্রা উদ্ভবের একটি প্রধান লক্ষণ। তা' ছাড়া মঙ্গল গান, লোকসঙ্গীত, পালাগান ইত্যাদির মধ্যেও যাত্রার বীজ নিহিত আছে। চণ্ডীমঙ্গল গীত ও মনসার ভাসান এমন কি বিভিন্ন চরিত্রের অঙ্গসজ্জা করে বিশেষ অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাওয়া হ'তো। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে কৃষ্ণলীলার আদি উৎস। শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় তা স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, "এই কাব্যগুলির (গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) গান ও সংলাপ হইতে পরবর্তী কালের যাত্রা গানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

মঙ্গলগান, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পূর্বে পাঁচালীছন্দে গীত হ'তো। প্রাথমিক যুগে পাঁচালী কেবল একজন মূল গায়েন কর্তৃক গীত হ'তো। কিন্তু কালক্রমে পাঁচালীর প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে একজন মূলগায়েনের সহকারীরূপে একাধিক্ গায়েন ও অভিনেতার প্রয়োজন অনুভূত হ'লো। ক্রমে ক্রমে এই পাঁচালী পালাগান হ'তেই জনপ্রিয় যাত্রাগানের উদ্ভব হ'য়েছে। হয়তো, কিংবা, সম্ভবতঃ ইত্যাদির কোন আবরণ না রেখেই ডাঃ সুকুমার সেন স্পষ্টই বলেছেন "পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব।"

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যাত্রাকীর্তন যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলো। ভাবোন্মাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বদা নৃত্যগীতে বিভোর থাকতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাকে 'কালীয় দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই যাত্রা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। 'কালীয়দমন' যাত্রার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে সখের যাত্রার দল। সখের যাত্রাদলের ব্যাপক প্রচলনের কয়েকটি কারণ আছে। এই যাত্রা প্রাচীনতার পটভূমি হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুনতর গরিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন নাটকীয় উপাদান ইহার প্রাণস্পন্দনের মূলে বেগ

সঞ্চার করে। এ ছাড়াও এই যাত্রাদলের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো দেবকাহিনী বর্জন। দৈবী-লীলা মাহাত্ম্যক কাহিনীর পরিবর্তে এই দলই সর্বপ্রথম যাত্রায় মানবীয় কাহিনীর প্রচলন করেন। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এই সখের যাত্রাদলের পরম প্রিয় বস্তু ছিল। খেমটা নাচের প্রবর্তন এই যাত্রা থেকেই সুরু হয়। এরপর প্রয়োজনের তাগিদে যাত্রার বহু সংশোধন ও সংস্কার সাধিত হয়। এক দিকে পাশ্চাত্য প্রভাব, অন্যদিকে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা এই দুইএর চাপে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের অনুকরণে এক নতুন ধরণের যাত্রার উদ্ভব হয়। এই যাত্রার মধ্যে সুসমঞ্জস কাহিনী এল, নাটকের ন্যায় অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ স্থানলাভ করলো এবং নাট্যিক কলা কৌশলেরও প্রচলন হলো। তবে প্রকাশ্য স্থানেই এ সব যাত্রার অভিনয় হ'তো এবং কোন দৃশ্যপট থাকতো না। বর্তমানে নিখিল বাংলা দেশে এই ধরণের যাত্রাই প্রচলিত আছে।

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করে নেওয়া দরকার—যাত্রা হতে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয় নি। ডাঃ সুকুমার সেন ও শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার ঘোষ উভয়েই এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু যাত্রা হতে নাটকের উদ্ভব না হলেও যাত্রার প্রভাব যে নাটকে নেই এ কথা বলা চলে না, বরং উভয়ের মাঝে একটা গভীর ঐক্য অনুভূত হয়। বস্তুতঃ বাংলার প্রথম যুগের নাটকগুলি যাত্রার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রথমে যাত্রার কোন নির্দিষ্ট কাহিনী ছিল না। সংগীতাংশ ঠিক থাকতো কিন্তু মাঝের সংলাপ গায়েন কর্তৃক ইচ্ছামত মুখে মুখেই রচিত হতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনে মানুষের রুচিতেও পরিবর্তন এলো। তার ফলে যাত্রার মনগড়া কাহিনীর পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই কাহিনী হয়তো বহু কবি ও নাট্য-কারকে নাটক রচনার দুর্নিবার শক্তি দান করেছে। পূর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মহাপ্রভু নিজেই যাত্রার অভিনয় করতেন। কিন্তু তাঁর সময় কোন সুস্পষ্ট কাহিনী নিয়ে নাটক লেখা হয়নি। তাহ'লেও তাঁর প্রাঞ্জল অভিনয় বহু বৈষ্ণব গ্রন্থকারকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার প্রমান পাই 'বিশ্বকোষ'এ: "শ্রীচৈতন্যের প্রাণোন্মাদকর কৃষ্ণলীলাগীতির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া বা তদ্বিবরণ অবগত হইয়া তৎপরবর্তী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা করিতে মনোযোগী হন।"

অধিকাংশ যাত্রার কাহিনীতে একজন করে বিবেক থাকে। যাত্রায় এই বিবেকের অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় বহু নাটকে এই বিবেক অথবা বিবেকের অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

সংস্কৃত এবং ইংরাজী নাটকের মত বাংলা নাটকেও প্রথমে সঙ্গীত ছিল না—কিন্তু যাত্রায় ছিল সঙ্গীতের বাহুল্য। জনসাধারণও সঙ্গীতে হ'য়েছিল আকৃষ্ট—তাই দেশীয় রুচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে সঙ্গীতের সংযোজন করা হয়।
বর্তমানে বাংলা নাটক যাত্রা হতে সর্ণস্পূরূপে পৃথক এবং দু'এর মাঝে কোন সামঞ্জস্য-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ প্রথমাবস্থায় যাত্রার প্রভাব যে নাটকে ছিল একথা ধ্রুব সত্য।

॥ দুই ॥

॥ বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটক, রঙ্গমঞ্চ এবং পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব ॥

কাব্যকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। সুদীর্ঘ এক-সহস্র শতাব্দী ব্যাপী কাব্যকে নিয়ে কতই না লীলাখেলা। গদ্যের সৃষ্টি সম্প্রতি কালের—অধিকতর সম্প্রতিকালের সৃষ্টি এই নাটক। তার জন্মেতিহাস মাত্র একটি শতাব্দীর। একটি শতাব্দী অতীত হ'লো বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নাটকের এই যে পদক্ষেপ এর মূলে আছে সংস্কৃত নাটক, যাত্রা-রঙ্গমঞ্চ এবং ক্ষমতাশালী পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে এই ত্রিশক্তি বাংলা নাটককে' বাংলা নাটকের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছে।
বাংলা নাটকের অভ্যুদয় কালে সংস্কৃত নাটক যে তার দিশারী হয়েছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃত নাটকই অমানিশার গভীর অন্ধকার বিদূরিত করে নবীন প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় বাংলা নাটকের ভালে কুসুমের জয়টীকা এঁকে দিয়েছে, পথ প্রদর্শক হ'য়ে তার দুর্গম যাত্রা পথকে বিমুক্ত, সহজ ও সরল করেছে। তাই বাংলা নাটকের গঠমান যুগে দেখি সংস্কৃত নাটকের একছত্র প্রভাব। অনুবাদ যুগে যে ইংরাজী নাটকের প্রভাব ছিল না তা নয়, কিন্তু রাজবেশধারী সংস্কৃত ভাষার দাপটে তার প্রভাব অনেকখানি ক্ষীণ। বস্তুতঃ এই যুগে পাশ্চাত্য নাটকের কোন লক্ষণীয় প্রভাব বাংলা নাটকে পড়েনি। সংস্কৃত নাটককে কেন্দ্র করেই এই যুগের বাংলা নাটক লালিত পালিত হয়ে বেড়ে উঠেছে। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের মতে "সংস্কৃত নাটকের রীতি ও আদর্শই এই সময় অনূদিত বাংলা নাট্য সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কেবল ভাষা নয় আঙ্গিক ও ভাবচেতনার দিক দিয়াও নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্য-ধারাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।" এ প্রসঙ্গে একটি কথা

বিশেষরূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন এ অনুবাদ কেবল আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। নাট্যকারগণ প্রধানতঃ ভাষাকে অবলম্বন করেই নাটক রচনা করেন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকল্পিত দু' একটি চরিত্রও নাটকের মূল ঘটনা প্রবাহে মিশিয়ে দিতেন। হরচন্দ্র ঘোষ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ এই উভয়ের উপর সংস্কৃত নাটকের সুগভীর প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এঁদের "ভাষা সংস্কৃত শব্দে আড়ষ্ট এবং নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি সংস্কৃত রীতিও ইহাতে আছে"। কালীপ্রসন্ন সিংহের সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮) কেবল মূলভাবে নয় ভাষা এবং আঙ্গিকের দিক দিয়েও সংস্কৃতানুগ। সংস্কৃত নাটকের তরল উচ্ছ্বাস এবং সুদীর্ঘ ক্ষেদ ও অবান্তর বিলাপ নাট্যকার বর্জ্জন করতে পারেননি। এঁর মালতী মাধব (১৮৫৮) ভবভূতির প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদ। এই যুগে অন্যান্য যে সব সামাজিক নাটক লেখা হয়ে ছিল তাতেও সংস্কৃত নাটকের ছাপ সুস্পষ্ট। "নান্দী, সূত্রধার ইত্যাদির মধ্য দিয়া অধিকাংশ নাটকের আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগের দিক দিয়াও ইহারা সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াছে।"

প্রাক্‌ন্যাশনাল থিয়েটার যুগের মধুসূদন এবং দীনবন্ধু এই দুই শক্তিমান নাট্যকারের উপরেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব গভীর ভাবে পড়েছে। বিষয় বস্তুতে না হলেও ভাব এবং বিশেষ করে সংলাপে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে। সংস্কৃত নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বগতোক্তি, দীর্ঘসংলাপ, সীমালীন উচ্ছ্বাস, কাব্যিক ধরণের কথাবার্ত্তা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার অজস্র প্রয়োগ, সুদীর্ঘ ক্ষেদোক্তি, ধ্বনিময় নিনাদকারী গম্ভীর ভাষা ইত্যাদি। সংস্কৃত নাটকে নাট্যিক সূক্ষ্ম কলাকৌশল অপেক্ষা সমাসবদ্ধ সুদীর্ঘ পদ ঝংকারই বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করোছ। যাত্রা পথে মহারাণীর পিছনে শত শত দাসদাসীর মত নাটকের মূল সংলাপের অন্তরালে অফুরন্ত উপমা ও শব্দধ্বনি আপন আবেগে গুঞ্জন করে উঠেছে। বলা বাহুল্য মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটক সংস্কৃত নাটকানুগ অলংকৃত বর্ণনায় এবং সংলাপের আত্যন্তিক দীর্ঘতায় মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। মাইকেলের নাটক পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় আমরা যেন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পড়ছি। শর্ম্মিষ্ঠা ও মায়াকাননে সংস্কৃত প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। কেবল ভাষায় নয় রচনারীতিতে এবং সংলাপে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এই দুই নাটকের যাত্রাপথকে আড়ষ্ট, কৃত্রিম ও আবিল করে তুলেছে। দীনবন্ধুর নাটকেও পাত্রপাত্রীদের সংলাপের ভাষা, তাদের চরিত্র বিকাশের পথে দুস্তর বাধার

সৃষ্টি করেছে। সাধারণ স্ত্রীপুরুষকে দুরূহ সংস্কৃত বহুল ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করতে দেখলে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়। কেবল ক্ষুণ্নই হয় না মাঝে মাঝে হাস্যোদ্রেক করে। সামান্য উদ্ধৃতি আমাদের এই উক্তির সমর্থনে যথেষ্ট হবে।—"এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহ নাই, লীলাবতী আমার সহধর্মিনী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম। আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি অশুভক্ষণে এই ভবনে পদার্পম করলেন—আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হ'লো। আমি দুস্তর বিপদ বারিধি জলে নিপতিত হলেম"। (লীলাবতী পঞ্চম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। নীলদর্পন এবং বিশেষ করে কমলে কামিনীর মধ্যে ধ্বনি বৈচিত্র, অর্থগৌরবদীপ্ত দীর্ঘ ভাবোক্তি এবং অলংকার বহুল ক্ষেদোক্তি সমূহ সংস্কৃত নাট্যপ্রভাবেরই পরিচয় বহন করে।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর হ'তে ইংরেজী নাট্য প্রভাব ব্যাপক হওয়ায় সংস্কৃত নাট্য প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত তা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।

নাট্যশালা যে অসংখ্য নাট্যকারকে উৎকৃষ্ট নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এ কথা অনেকেই অস্বীকার করতে চান। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্পষ্ট অস্বীকার না করলেও প্রকারান্তরে করেছেন। তাঁর মতে নাট্যশালা স্থাপিত না হলেও বাংলা নাটক অলিখিত থাকতো না। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় কিন্তু স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে নাট্যশালার সাথে বাংলা নাটকের গভীর যোগ আছে। উভয়ের মধ্যে যে একটি আত্মিক নিবিড়তা আছে তা তিনি যুক্তিতর্কসহ উপস্থিত করেছেন। বাংলা দেশে সর্বপ্রথম নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশদেশীয় ভদ্রলোক। তিনি বেঙ্গলি থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করে Disguise এবং Love is the Best Doctor নামক দুখানি ইংরাজী নাটকের অনুবাদ অভিনয় করান। তারপর ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত সাঁশুলি রঙ্গালয়, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার প্রভৃতিতে অভিনীত কয়েকটি ইংরাজী বই ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করল—কিন্তু দেশের বিরাট অংশ সেই খুশীতে যোগ দিতে পারল না। তারা অন্ধকারেই পড়ে রইল।

চিন্তাশীল ধনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'লো। এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা রঙ্গালয় স্থাপনে উদ্যোগী

হলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল। তারপর অল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিদ্যোৎসাহী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চগুলি। নাট্যশালার এই ক্রমবর্ধমানতার সাথে সাথে অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের চাহিদা বেড়ে গেল, ফলে পাত্র-পাত্রীর মত কালি কলম নিয়ে বাংলার সাহিত্যিকগণও সাহিত্য অভিনয়ে মেতে উঠলেন। নবীন সম্ভাবনায় বাংলা নাটকে সৃষ্টি হ'লো নবযুগের সূত্রপাত। নিছক আনন্দের জন্য লিখিত নাটকাপেক্ষা অভিনয়ের তাগিদে লিখিত নাটকের সংখ্যাই অধিক। মধুসূদনের অধিকাংশ নাটকতো অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা। "বেলগাছিয়া থিয়েটার এবং ইহার কর্মকর্ত্তাদের সহিত জড়িত না হইলে হয়তো মধুসূদন নাটক লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন না। এবং কে জানে তাঁহার প্রতিভার বিকাশে ব্যাঘাত এবং বিলম্ব ঘটিত।" প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের পূর্বে অভিনয়োপযোগী সার্থক নাটক বিরলদৃষ্ট। অভিনয় দেখতে গিয়ে কুরুচি পূর্ণ সংলাপ এবং নাট্যিক কলাকৌশল বিহীন গতি দেখে স্বয়ং মধুসূদন অনুতপ্ত হন। শর্মিষ্ঠা নাটকের ভূমিকায় দেখতে পাই সেই অনুতাপেরই প্রকাশ ঃ

অলীক কুনাট্যে রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

এই 'প্রাণে নাহি সয়' হ'তেই মধুসূদন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং এই প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে যে অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক রচনার প্রতিজ্ঞা মিশে আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি নাট্যকারগণের রচনার মূলেও নাট্যশালার প্রভাব বিদ্যমান। রঙ্গালয়ের সাথে গভীর যোগসূত্র না থাকলে ভারতের সেক্সপিয়র গিরিশচন্দ্রকে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অতি আধুনিক কালের বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, মনোজ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রত্যেকের নাটক রচনার মূলে যে নাট্যশালার প্রভাব এবং তাগিদ আছে তা প্রত্যেকই স্বীকার করবেন। এই সেদিন বাংলার নব নির্মিত রঙ্গমঞ্চ বিশ্বরূপায় অভিনয়ের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরোগ্যনিকেতনের নাট্যরূপ দিতে দেখেছি। এই সব লক্ষ্য করেই অজিত ঘোষ মহাশয় মন্তব্য করেছেন "বাংলা সাহিত্যের সকল নাট্যকারই কোন না কোন রঙ্গ মঞ্চের সংস্পর্শে নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।" বস্তুতঃ বাংলা নাটকের উপর যে নাট্যশালার প্রভাব

বর্ত্তমান তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে যত অধিক নাটক রচিত হয়েছে এত অধিক নাটক রচনা আর কোন সময় সম্ভব হয় নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই উভয় ভাবেই রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটকের প্রাণমূলে বেগ ও বল সঞ্চার করেছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত নাটক রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির প্রভাব ব্যাপক, গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী নয়। এরা চন্দ্রের মত গহন রাতের গভীর অন্ধকারকে ক্ষণিক আলোকিত করেই আবার কৃষ্ণপক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। এরা বাংলা নাটককে আধুনিক মর্যাদায় উন্নীত করতে পারেনি, প্রাচীনতার আবরণ ছিন্ন করে নাট্যভারতীকে যে আধুনিকভাবে সজ্জিতা করেছে সে হ'লো পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য। বাংলা নাটকের গঠমান যুগ হতে তার ক্রমবিকাশমানের জটিল অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটিকে আলোকিত করেছে পাশ্চাত্য নাট্যালোক। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হওয়ার পর বাংলা নাটকের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তাতে কোন প্রাণস্পন্দন পাওয়া গেল না। তা একান্তভাবেই রুগ্ন এবং মৃতপ্রায়। কেতাদুরস্ত সংস্কৃত নাটকের রাজকীয় প্রভাবে তার প্রাণ কণ্ঠাগত। পাশ্চাত্য নাটক তার এই অযথা গাম্ভীর্য্যের খোলস বদল করে স্বাভাবিক সরস পরিচ্ছদ পরিয়ে দিল, অভিনব সম্ভাবনায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবীন অভ্যুদয় হ'ল।

হেরেসিম লেবেডেফ যে Disguise এবং Love is the Best Doctor এই দুইখানি নাটকের অনুবাদ করিয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা প্রথমেই পেয়েছি। এর পর হরচন্দ্র ঘোষ ভানুমতীর চিত্তবিলাস (১৮৫২) নামে Shakespeare এর মারচেন্ট অব ভেনিস এর ভাবানুবাদ করেন। এঁর চারুমুখ চিত্তহরা (১৮৬৪) রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েটের অনুবাদ। বাংলা নাটকের মৌলিক রচনাধারা প্রবর্ত্তিত হয় কীর্ত্তিবিলাস এবং ভদ্রার্জ্জুনের মাধ্যমে। কিন্তু এর কাহিনী মৌলিক হলেও আঙ্গিকের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চত্য নাট্যরীতি-অনুগ। পাশ্চত্য নাট্যরীতির বিশেষ প্রভাব বিকশিত হ'য়ে ওঠে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে। মাইকেল ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী এপিক সাগর মন্থন করে তিনি রচনা করলেন "মেঘনাদ বধ" কাব্য আর ইংরাজী নাট্যসাহিত্য-সাগর মন্থন করে তিনি বাংলা নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সে সময়ে বাংলা নাটকে

সংস্কৃত নাট্যানুযায়ী যে দীর্ঘ সংলাপ ও খেদোক্তি থাকতো পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহলকে তা তৃপ্তি দিতে পারেনি, স্বয়ং মধুসূদনও তৃপ্তি পাননি। সংস্কৃত প্রভাববিমুক্ত পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা নাটক রচনার দিকে মধুসূদনের চেষ্টা যে নিয়োজিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাই গৌরদাস বসাককে লিখিত তাঁর একটি পত্রে: "And that is my intention to throw off the fetters forged for us by servile admiration of evertyhing sanskrit"
বাস্তবিক মধুসূদনই সর্ব প্রথম পাশ্চত্য নাট্যসাহিত্যের প্রথায় তাঁর নাটক-সমূহকে পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত করেন: Exposition, growth or develop-ment, climax, fall, catastrophe or Denouncement, প্রত্যেক অঙ্ককে আবার কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করেন। এ ছাড়াও দর্শকগণের মন লঘু ও হালকা (Relief) ক'রবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি গান সংযোজিত করেন। এ ছাড়াও মধুসূদনের নাটকের প্রধান গুণ তার জমাট কাহিনী আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত কাহিনীর একটি জমাট স্রোত বয়ে গেছে। এই দৃঢ়সংবদ্ধ ঐক্যের (unity) জন্যও তিনি পাশ্চাত্য নাটকের নিকট ঋণী। দীনবন্ধু এবং তাঁর পরবর্ত্তী সকল নাট্যকারগণের উপর যে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনীতে 'মেরি ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসরের ছায়াপাত হয়েছে। বর্ত্তমানে নাটকের যে রূপ আমরা দেখি আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য নাটকের অনুগামী। বাংলা প্রহসনগুলিও ইংরেজী Farce নাটক হতে উৎপন্ন হয়েছে। বর্ত্তমানে বাংলায় যে একাঙ্কিকা নাটকের প্রচলন হয়েছে তাও পাশ্চাত্য One Act play র প্রভাবের ফল।
বাংলা নাটকের উপর যে ইংরেজী নাটকের গভীর প্রভাব বর্ত্তমান এ কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগে ভোরের আকাশে পূবদিগন্ত হ'তে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের যে রক্তিম ছটা দেখা দিয়েছিল আজও দিগ বিথার নীলাম্বর জুড়ে সেই অপূর্ব রক্তিম ছটাই আলোক দান করছে।

॥ তিন ॥

॥ প্রাক্ ন্যাশনাল যুগের প্রহসন ধারা ॥

আমাদের সমগ্র জীবনকে ঘিরে দুটি সত্তা বর্ত্তমান—আনন্দ এবং বিষাদ আনন্দ ধারা আমাদের সমগ্র জীবন প্রবাহকে হাসির 'আলোড়নে উদ্বেল

করে তোলে। যত কিছু দুঃখ' যত কিছু মালিন্য, জীবন হতে ধুয়ে মুছে অনাবিল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর বিষাদ আমাদের জীবনে আনে অশ্রুর প্লাবন। বেদনা এবং ব্যথার অভিঘাত জীবনেকে বেদনামলিন করে তোলে। সমগ্র নাট্য প্রবাহের ভিতর দিয়ে আমরা এই হাসি ও অশ্রুরই লীলা দেখি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ধূলিমালিন্যের ভিতর যে হাসি এবং অশ্রু লুকিয়ে থাকে নাটকের ভিতর আমরা সেই হাসি এবং অশ্রু নির্ঝরকে নতুন চেতনা এবং নতুন মহিমায় দেখি। সুখ দুঃখে ভরা অখণ্ড জীবন প্রবাহকে নিয়েই নাটক—তাই আনন্দ এবং বিষাদের মত নাটকে ও দুইটি স্পষ্ট বিভাগ বর্ত্তমান। জীবনের ব্যথা বেদনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে Tragedy আর Commedy তে হয়েছে হাসি আনন্দের রূপায়ণ। এই Commedy আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর Commedy তে দেখি জীবনের হাসি এবং আনন্দের চরম রূপায়ণ। কোন গভীর সমস্যাকে নিয়ে ব্যথা বেদনার বেড়াজালকে অতিক্রম করে হাসি আনন্দের মধ্যে মিলন মাধুরিমার চরম রূপদান করাই এই শ্রেণীর Commedy র লক্ষ্য। কিন্তু আর এক শ্রেণীর Commedy আছে যারা জীবনের কোন জটিল সমস্যার ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাস্যোচ্ছ্বলতায় মেতে ওঠে। এই শ্রেণীর Commedy কে বাংলায় বলা হয় প্রহসন (Farce)।

লেটিন Farcio শব্দ হইতে Farce শব্দের উদ্ভব। নাট্যজগতে এই Farce শব্দটির অর্থ দাঁড়াল "The type of drama staffed with low humour and extravagant wit।" ষোড়শ শতকে যে সব Commedy Shakespeare ও Ben Johnson কর্ত্তৃক রচিত হয়েছিল তাদের ভিতর দেখা গিয়েছে অপূর্ব নাট্যিক কলাকৌশল এবং অফুরন্ত হাস্যরসের স্ফুরণ। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে Commedy গুলিতে নাট্যকারগণ রসের সেই অপূর্ব দীপ্তি আনতে সমর্থ হলেন না ফলে পূর্ণাবয়ব হাস্যোচ্ছ্বলতায় ভরপুর "পঞ্চাঙ্ক Commedy র স্থলে তিন অঙ্কের স্বল্পপরিসরের লঘু ও তরল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর হাস্য-রস সমন্বিত নাটক" পরিবেশিত হ'তে লাগল। কালক্রমে Commedy র সাথে Farce এর একটি স্পষ্ট বিভেদ রেখা গড়ে উঠলো। বহিরঙ্গ অর্থাৎ আয়তনে পঞ্চাঙ্ক Commedy এবং তিনাঙ্ক Farec এর মধ্যে যে প্রভেদ দেখা গেল অন্তরঙ্গেও সে প্রভেদ ব্যাপক এবং সুতীব্র হয়ে উঠল। আয়তনের বিশালতার জন্য পূর্ণাঙ্গ Commedy তে নাট্যকার চরিত্র চিত্রণের জন্য সুবিস্তৃত পটভূমি পেতেন, কিন্তু আয়তণের স্বল্পতার জন্য Farce এ সে

সুযোগ ছিল না। স্বল্প-পরিসর আয়তনে লেখককে কাহিনী উপস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ এবং তদুপরি নাটকীয় চমক দিতে হ'ত বলেই এই শ্রেণীর রচনায় অতিরঞ্জন এবং কিছু পরিমাণে অবাস্তব ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ অনিবার্য হয়ে উঠলো। শেষকালে farce এর রূপ দাঁড়ালো "A Short humorous play." আলংকারিকের পরিভাষায় প্রহসনকে বলা হয় "হাস্যোদ্দীপন কাব্যস্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম।" জীবনের কোন জটিল সমস্যা বা আনন্দ-বেদনার কোন পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এই জাতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়—সম্ভব অসম্ভব ঘটনার দ্বারা দর্শককে হাস্যাকুল করে তোলা এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মদন মোহন কুমার বলেছেন "Commedy জীবনের বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় পরিস্থিতির মধ্যে সমাপ্তির মাধুর্য্য বিকশিত হইয়া ওঠে; সেখানে হাস্য স্নিগ্ধ, মধুর, উজ্জ্বল। Farce এ কাহিনী সংক্ষেপ করিয়া পদে পদে হাস্যকর ঘটনার সমাবেশ করিয়া লোক হাসাইবার আয়োজন করা হয়। এ হাস্য উদ্দাম, উচ্ছল, অট্টহাস্য।"

বাংলা নাটকের অন্যান্য ধারার মত অনুবাদ হতেই প্রহসন রচনার সূত্রপাত হয়। ইংরাজী এবং সংস্কৃত farce এর অনুবাদে বাংলা নাট্য ধারায় যে হাস্যোচ্ছলতার উদ্দাম স্রোত নেমে এলো তাকে কেন্দ্র করেই প্রহসন রচনা শুরু। অবশ্য এর আগে অত্যন্ত নিম্নরুচিসম্পন্ন যাত্রা, সঙ এবং বিভিন্ন নক্সার মধ্য হতে প্রহসনের আদি রূপটি আবিষ্কার করা যায়।

বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম প্রহসন হ'লো Disguise এবং Love is the Best Doctor নামক দু'খানি ইংরাজী প্রহসনের অনুবাদ। হেরেসিম লেবেডেফ একজন রুশদেশীয় ভদ্রলোক তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলক নাথ দাসের দ্বারা এই প্রহসন দুখানিকে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে অনুবাদ করান। সংস্কৃতের 'হাসার্ণব', 'কৌতুক সর্বস্ব' ইত্যাদি প্রহসনগুলি উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলায় অনূদিত হয়। কিন্তু এগুলি উপাখ্যান আকারে গদ্যে ও পদ্যে রচিত—নাটকের আকারে নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হবার পর আমরা যে বাংলা নাটকগুলি পেলাম সেগুলি প্রধানতঃ কোন না কোন সামাজিক সমস্যাকে আশ্রয় করেই লিখিত হ'য়েছে। বাল্য বিবাহ, সপত্নী বিরোধ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলি সে যুগে বিশেষ ভাবে আলোচ্য হ'য়ে ওঠে। বলা বাহুল্য নাট্যকারদের শ্যেন দৃষ্টি এই বিষয়গুলির উপর নিক্ষিপ্ত হ'তে বিরত হয়নি। ফলে আমরা একে একে পেলাম—উভয় সংকট, চক্ষুদান, বুঝলে কিনা, যেমন কর্ম তেমন ফল ইত্যাদি নাটকগুলি। এই

নাটকগুলি লেখেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এঁর 'কুলীনকুল সর্বস্ব' ঠিক প্রহসন জাতীয় না হলেও হাস্যোচ্ছলতায় ভরপুর। নাটক খানি প্রায় প্রহসনের প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করে গেছে।

এই নাটকের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় কৌলিন্য প্রথার দোষ এবং অসংগতি। এক কন্যাদায়গ্রস্থ ভদ্রলোকের চার কন্যা—বড়টি যৌবনের বিদগ্ধ দিনগুলি অতিক্রম করে প্রৌঢ়ার কোঠায় পদক্ষেপ করেছে, ছোটটি সবেমাত্র নবযৌবনোদ্গমে কম্পমান। পূর্বরাগের অনাস্বাদিত মাধুরিমাই তার এখন কাম্য। অবশেষে এই চার কন্যার বিবাহ এক শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধের সাথে সম্পন্ন হয়। সুতরাং নাটকটি পরিণতির দিক দিয়ে অশুভান্তক, কিন্তু ভিতরে পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তায় প্রহসনের খাঁটি বীজটি খুঁজে পাওয়া যায়। নারী চরিত্রগুলি বিশেষ করে সরল এবং সরস হওয়ায় হাস্যময়তায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। পুরুষদের চরিত্র কিন্তু বড় গম্ভীর—এই চরিত্রগুলি ঠিক প্রাহসনিক চরিত্র হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু নারী চরিত্রগুলির মধ্যে একদিকে ছড়া ও অন্যদিকে প্রবচন থাকায় হাসির অনাবিল স্রোতে ভেসে গিয়েছে। ঘটক, পুরোহিত ইত্যাদিকে নিয়ে যে রঙ্গরস করা হয়েছে তা' অপূর্ব। কিন্তু সর্বাপেক্ষা হাস্যরসের বীজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীদের নাম নির্বাচণে। অনৃতাচায, বিবাহবনিক, উদরপরায়ণ, কুলীনপালক ইত্যাদি নামগুলি বিশেষ কৌতুক পূর্ণ—নামের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি চরিত্রের অন্তঃসত্বা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

প্রহসন রচনায় রামনারায়ণ তর্করত্নের পটুত্ব অপূর্ব। ব্যঙ্গের হুল এবং শ্লেষের খোঁচা পাঠকদের হাস্যাকুল এবং মর্মাহত করে দেয়। 'উভয় সংকট' যেন হাসির খনি। দুই সতীনের প্রতিযোগিতামূলক প্রাণহীন বিকৃত উদ্দাম আদরযত্নের প্রাবল্যে কর্তার যে সংকট সৃষ্টি হ'য়েছে তা' অপূর্ব এবং অভিনব। মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থ-যাত্রা' বোধ হয় প্রাক-মধুসূদন যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। যেমন নাম তেমনি বিষয়বস্তু নির্বাচণে এই নাটকটির মধ্যে প্রহসনের প্রাণ-স্পর্শ পাওয়া যায়। এক মদখোর, এক আফিংখোর, এক গুলিখোর ও এক গাঁজাখোর—এই হ'লো চার ইয়ার, এই ইয়ারগণের যে তীর্থযাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে তা' যে কেমন তীর্থযাত্রা তা' প্রহসন খানিকে স্পর্শ না করেও অনুমান করা যায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়বস্তুর মধ্য হ'তে কেমন এক অপূর্ব হাসির ঝিলিক আমরা অনুভব করি। প্রাক্-মধুসূদন যুগের 'বাসর-কৌতুক'ও একখানি উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

এর পর বাংলার কবিতার ক্ষেত্রের মত প্রহসন রচনার ক্ষেত্রেও সূচিত হ'লো

বিদ্রোহী মধুসূদনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁর হাতেই আমরা পেলাম 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই দু'খানি গ্রন্থ বাংলার প্রহসন বিভাগে অপূর্ব সংযোজনা। হাসির দীপ্তি যেন গ্রন্থ দু'খানির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রহসন রচনার প্রাথমিক যুগে আমরা যে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রহসন পেয়েছি তা' একান্ত গৌরবের বিষয়।

মধুসূদনের নাটক রচনায় অনেক দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু উল্লিখিত প্রহসন দু'খানি আশ্চর্য ভাবে সেই সব দোষ-ত্রুটি হ'তে মুক্ত। এই প্রহসন দু'খানি তাঁর অপূর্ব নাট্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রহসন রচনা করতে গেলে সমাজ সম্বন্ধে যে বাস্তব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা' মধুসূদনের ছিল এবং সর্বোপরি তাঁর বচন-ভঙ্গিমায় সে জ্ঞান অনবদ্য হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'একেই কী বলে সভ্যতা' দু'অঙ্কে সমাপ্ত। মানুষের (বাঙালীর) জীবনের কয়েকটি অসঙ্গত আবেগ এবং ভ্রান্ত মুহূর্তকে এই নাটকে ধরে রাখা হ'য়েছে। যে সময় বাঙালীর মানস-প্রবণতা পাশ্চাত্য শিক্ষানুগ হ'য়ে উঠেছিল ব্যক্তি-মানসের সেই বক্রগতির পিছনে অন্ধ অনুরাগ ছাড়া কোন যুক্তিতর্ক নিহিত ছিল না। একগ্লাস মদ খেয়ে নব্যশিক্ষিতগণ বাঙালীর কুসংস্কারের মূলে কুঠারা-ঘাত করলেন বলে মনে করতেন। ইংরাজীতে কথা বলার যে কী তীব্র স্পৃহা সে যুগে গজিয়ে উঠেছিল তার উলঙ্গ ছবি দেখ্‌তে পাই নবকুমারের কথায়—"আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে doctorকে call করা গেল। তিনি একটি physic দিলেন। physic বেশ operate করেছিল—four, five time motion হলো। অদ্য কিছু better বোধ করছেন।"

এমনিতর আরো বহু হাসির খোরাক 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাত্র একদিনের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত 'অথচ এমন কোন চিত্র নেই যা' এতে স্থান পায়নি—অন্ততঃ সমকালীন ইংরাজ-স্পর্শ-গর্বী নব্য যুবকদের বুঝ্‌তে গেলে যে চিত্রটুকুর প্রযোজন তার সবটাই এতে স্থান পেয়েছে। তবুও আশ্চযের বিষয় গ্রন্থটিতে একটিও অবান্তর কথা স্থান পায়নি—খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি একত্রিত হয়ে যেন এক অখণ্ড রস প্রবাহের সৃষ্টি করেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রহসনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট।"

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর ভিতর দিয়ে সমাজের উপরতলার ভণ্ড

কর্তাদের এবং বকধার্মিকদের উপর তীব্র কষাঘাত করেছেন। এ প্রহসনটিও প্রথমোক্ত প্রহসনের ন্যায় দু'অঙ্ক ও চার গর্ভাঙ্কে পরিসমাপ্ত। সামাজিক প্রহসন হিসেবে এ গ্রন্থখানির মূল্য অনেক। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—"এই শ্রেণীর বকধার্মিক (ভক্তপ্রসাদ) সেই যুগেই যে শুধু বর্তমান ছিল, এই যুগে নাই—তাহা বলিতে পারা যায় না; ইহা একদিন ছিল এবং চিরদিনই থাকিবে। সেই জন্য তাঁহার এই প্রহসনখানির নিত্যকালীন মূল্য আছে।"

মধুসূদনকে আমরা সাধারণে উচ্চ ভাবকল্পনা-সমৃদ্ধ কবি হিসেবেই জানি কিন্তু তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তাঁর রচিত মাত্র দু'খানি প্রহসনকে অবলম্বন করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি বংলার মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান প্রহসন রচনাকারীদের মধ্যে একজন।

মধুসূদনের পর প্রহসন রচনাকার হিসাবে বঙ্গ নাট্যমঞ্চে আমরা পেলাম শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলিতে তাঁর স্বভাবজাত পরিহাস পটুতার অবিস্মরণীয় প্রমাণ রয়েছে। "সেক্সপিয়রের প্রথম যুগের কমেডি 'Merry Wives of Windoer', 'Comedy of Errors' প্রভৃতি নাটকের ন্যায় উচ্ছলিত হাস্যরসই দীনবন্ধুর নাটকের প্রাণ। মনে হয় আমাদের অসংগত, অসংলগ্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবনে যেখানে যতকিছু হাস্যরসের টুক্‌রা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধৃত হইয়া নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকে ব্যঙ্গ আছে, আঘাতও আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আঘাতের নির্মমতা সব স্থানেই সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে।"

'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' এবং 'জামাই বারিক' এই তিনখানি হ'লো দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন। 'সধবার একাদশী'র পাণ্ডুলিপি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এ কথা সত্য যদি এ গ্রন্থটি প্রকাশিত না হতো তা' হলে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রহসন লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে থেকে যেতো! শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার ঘোষ মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"হাস্যরস যদি প্রহসনের প্রাণ এবং সমাজ-শোধন তাহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না।" 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে আমরা হাস্যরসিকতার চূড়ান্ত রূপায়ণ দেখ্‌তে পাই। শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধ রাজীব লোচন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও তাঁর বিয়ের বাতিক কমে নি—

এই বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োকে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র উদ্দাম হাস্য প্রবাহের যে জমাট প্রহসন গড়ে তুলেছেন তা' কোনদিন ভোলবার নয়। "ইহার মধ্যে ধারাল কথার তীব্র ঝলক নাই, কোন গভীর সমাজ-সমস্যার সুস্পষ্ট ইংগিতও নাই, হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসনখানি আগাগোড়া স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া রাখা হইয়াছে।" কিন্তু দীনবন্ধুর সর্বপ্রধান হাস্যরসপ্রধান প্রহসন 'জামাই বারিক'। বাংলায় রচিত অন্যকোন প্রহসনে হাসির এমন উদ্দাম প্রবাহ আছে বলে মনে হয় না। কুলীন নিষ্কর্মা জামাইরা বেকার অবস্থায় শ্বশুরবাড়ী থাকে। হতভাগ্য জামাইগুলির জীবনযাত্রার বিচিত্র দৃশ্য এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। বগলা ও বিন্দুবাসিনীর ঝগ্‌ড়া, স্বামীর স্নেহকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপার, বেচারা স্বামীকে চোর ভেবে উত্তম মধ্যম দেওয়ার দৃশ্যগুলি কি অপূর্ব কৌতুকেই না জমাট বেঁধে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনীতে লিখেছেন "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়াছে যে অনেকে আর হাসিতে পারে না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ রয়েছে 'জামাই বারিকের' পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। এ প্রহসনের প্রতিটি দৃশ্য আমাদের চিত্তকে হাসির অনবরত আঘাতে সকৌতুকে নাচাতে থাকে। জামাইদিগকে পাশ নিয়ে যখন আমরা অন্তপুরে যেতে দেখি তখন প্রহসন পাঠ করা বন্ধ করে আমাদিগকে একচোট হেসে নিয়ে জমে ওঠা হাসির পাহাড়কে ক্ষয় করতে হয়। 'জামাই বারিক' নিঃসন্দেহে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রহসনগুলির একটি।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রহসন রচনার ধারা এখানেই শেষ হয়েছে। এই যুগে মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক অনেক নাটকই লেখা হয়েছিল কিন্তু প্রহসন রচনার ধারা বুঝি সকল ধারাকেই ছাড়িয়ে উঠেছিল। পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অতি অধুনিক যুগের প্রথম বিশী, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেই প্রহসন রচনা করেছেন, কিন্তু কেউ-ই বাংলা নাটকের গঠমান যুগে রচিত প্রহসনের উজ্জ্বল দীপ্তিকে ম্লান করে দিতে পারেন নি। প্রাক্-ন্যাশ্‌নাল থিয়েটার যুগের নাট্যকারদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বোধহয় এইখানেই—এই প্রহসন রচনায়।

॥ দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ ॥

॥ এক ॥

॥ বাংলা নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র ॥

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আকাশে দীনবন্ধু মিত্র একটি অম্লান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি দিক আছে যে দিকগুলিতে তিনি বর্তমানকাল পর্যন্ত অপরাজেয়, এই বিশেষ দিকগুলিতে তিনি এখনও পর্যন্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা বিশেষ রূপে প্রয়োজন, তাঁর নাটকের অংশতঃ নিয়ে বিচার করলে এই দিকগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে—সামগ্রিক বিচারে নয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে দীনবন্ধুর নাটকের দোষ-দুর্বলতা অনেক, বহুক্ষেত্রে পীড়াদায়ক। আপন অভিজ্ঞতাকে যেখানে তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন সেখানেই তিনি পূর্ণাঙ্গ, আপন-বিশিষ্টতায় উন্নত-শীর্ষ কিন্তু অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য হেতু যেখানে তিনি কল্পনার দ্বারস্থ হয়েছেন সেখানে তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছেন: "দীনবন্ধু এই জীবনকে যতটুকু দেখিয়াছিলেন, ততটুকুই তাহার যথার্থ নাট্যরূপ দিয়াছেন। কিন্তু যতটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততটুকুই ভুল করিয়াছেন। দীনবন্ধু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন, দূরদ্রষ্টা কিংবা অন্তর্দ্রষ্টা ছিলেন না; কিন্তু নাট্যিক চরিত্র সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি অপেক্ষা দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি কম প্রয়োজনীয় নহে, সেইজন্য তাঁহার সাফল্য আংশিক বলিতে হইবে।"

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রই বস্তুতান্ত্রিকতার অগ্রদূত। বাস্তব সমস্যাবলী ও ঘাত প্রতিঘাত তাঁর অধিকাংশ নাটকের সূতিকাগার। দীনবন্ধু মিত্রই বোধহয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বাস্তববাদী লেখক।

প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব বিশেষরূপে স্মরণীয়। প্রহসন রচনায় তিনি যে উন্নত ধরণের নাট্যিক কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিরল-দৃষ্ট। প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু মিত্র কেবল কাতুকুতু দিয়ে নিছক সস্তা বাক্যজাল বিস্তার করে পাঠককে হাসাননি

—হাসিয়েছেন অন্তর দিয়ে। হাস্যরসের মধ্যে Humour বা করুণ হাস্যরস শ্রেষ্ঠ—দীনবন্ধু মিত্রের অধিকাংশ প্রহসন এই করুণ হাস্যরসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধারায় অভিসিক্ত। প্রতিটি প্রহসন পাঠকের অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। হাস্যরস সঞ্চারে দীনবন্ধু মিত্র যে একজন বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়াছে অনেকে আর হাসিতে পারেনা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" হাস্‌লেই দীনবন্ধু মিত্রকে একান্ত ঘরোয়া, আপন এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়, হাসি বন্ধ করলে তিনি গম্ভীর এবং অসুন্দর হয়ে ওঠেন, যতকিছু সৌন্দর্য-মাধুর্য যেন তাঁর অবলুপ্ত হয়। তাঁর রচিত প্রহসন গুলিই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসের উজ্জ্বল সাক্ষর।

অনেকে দীনবন্ধু মিত্রকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট মনে করেন কিন্তু আমাদের মনে হয় দীনবন্ধুর মাধ্য অশ্লীলতা ছিল না—তাঁর রচনায় ছিল গ্রাম্যতা। এই গ্রাম্যতাকে অনেকে অশ্লীলতার সাথে এক করে ভুল করেছেন। 'অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা এক জিনিষ নয়। বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতা আছে, গ্রাম্যতা নাই; দীনবন্ধুতে গ্রাম্যতা আছে অশ্লীলতা নাই। দীনবন্ধুর দোষ যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা ছিল একান্ত গ্রাম্যতায় বা বাস্তবানুসরণে—বিশেষ কোন রুচি বোধে নয়।'

গুণের সাথে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে দোষ দুর্বলতারও অন্ত নেই। নাটক রচনায় দীনবন্ধু মধুসূদনকেই অনুসরণ করেছিলেন—ফলে মধুসূদনের মত তাঁর নাটকেও সংস্কৃত-প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে তিনি গদ্যে-পদ্যে নাটক রচনা করেছেন। সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রীদের মুখে পদ্যেয় কথা বার্তা একেবারে অশোভন। তা' ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য প্রতিভা ছিল নিতান্ত সাধারণ স্তরের ফলে নাটকের মধ্যে সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী একেবারে অশোভন ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

ভাবোচ্ছ্বাস বর্ণনা দীনবন্ধুর সার্থক নাটক রচনার আর একটি প্রধান অন্তরায়। ভাব প্রাবল্যে তিনি ভেসে গিয়েছেন। সংস্কৃত উপমা, অলংকার, ধ্বনি-বৈচিত্র্য এবং দীর্ঘ অর্থগৌরব ভাবোক্তিতে প্রায় নাটকের বহু সংলাপই প্রাণহীন এবং অপ্রীতিকর মনে হয়।

যা'হোক শত ত্রুটি-দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর পদক্ষেপ যে বলিষ্ঠ এবং সার্থক সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

॥ দুই ॥

॥ দীনবন্ধুর প্রথম প্রচেষ্টায় "নীলদর্পণ" এবং নাট্য-সাহিত্যে তার স্থান ॥

নাট্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের পদক্ষেপের প্রথম ফল স্বরূপ আমরা পেলাম নীলদর্পণ।

অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বে আমরা কয়েকজন শক্তিমান নাট্যকারকে পেয়েছি—কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং মধুসূদন। কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন, শর্মিষ্ঠা ইত্যাদি মৌলিক নাটক এবং স্বপত্নী নাটক, কুলীনকুলসর্বস্ব ইত্যাদি বিখ্যাত প্রহসনগুলি নীলদর্পণের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে। "নীলদর্পণ" পাশ্চাত্য নাট্য-রীতি অনুযায়ী পঞ্চমাঙ্কে সমাপ্ত—কিন্তু এর আগেই শর্মিষ্ঠায় আমরা এই রীতির সংযোজনা দেখেছি—সুতরাং এদিক দিয়ে নীলদর্পণের মৌলিকতা নেই। মধুসূদনই প্রথম সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের বন্দীশালা হ'তে নাট্যভারতীকে উদ্ধার করে আধুনিক সাজ-সজ্জা ও অলংকারে তাকে ভূষিত করেছিলেন। তা' ছাড়া নীলদর্পণের কাহিনীতে একটি নিটোল ঐক্য (Unity) নেই—মাঝে মাঝে সংলাপ-দোষে শিথিল হ'য়ে এলিয়ে গেছে। এই সংলাপের দুর্বলতার জন্যেই নাটকের প্রধান চরিত্রের একটিও আপন চারিত্রিক মাধুর্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে নি। নবীন মাধব এই নাটকের নায়ক—কিন্তু কোন স্থলেই নায়ক-সুলভ ভাব-ভংগি তার ভিতর নেই। তিনি উদার, মহান এবং অমায়িক। এমন চরিত্র হয়তো কোন দুঃখপূর্ণ সামাজিক নাটকের নায়কের ভূমিকায় শোভনীয় হ'তো কিন্তু নীলদর্পণে যেখানে নিরীহ চাষীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার চরমে উঠেছে সেই অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত জনগণের নেতা হিসেবে চরিত্রের ভিতরে যে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, কঠোরতা এবং সর্বোপরি অনমনীয় মনোভাব থাকা উচিৎ ছিল নবীন মাধবের চরিত্রে তা' নেই। স্বরপুর-বৃকোদর নবীন মাধবের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সমগ্র নাটকে দু'বার দেখেছি—একবার সাধুচরণের কথায় আর একবার ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের বেলায়। কিন্তু সাধুচরণের কথা অপেক্ষা দৃশ্যটি যদি নাটকের মধ্যে উপস্থিত থাকতো তা' হ'লে dramatic action এবং নবীনমাধব-চরিত্রের বিকাশের পক্ষে তা' অধিকতর ফলপ্রসূ হ'তো। মোট কথা নবীনমাধবের চরিত্র আমাদের মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে না। অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে গোলকবসু এবং সাধুচরণের চরিত্র।

এই নাটকের সংলাপ মাঝে মাঝে যে অত্যন্ত দুর্বল সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় অলংকৃত-উপমাবহুল সংলাপের আত্যন্তিক

দীর্ঘতা, শোকোচ্ছ্বাস-বাহুল্য মাঝে মাঝে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছে। প্রণয়ে কিংবা প্রলাপে চরিত্রগুলির মুখ হ'তে যে ভাষা ধ্বনিত হ'য়েছে তা' তাদের অন্তঃস্থল হ'তে উৎসারিত হয় নি, তা আহৃত হয়েছে সংস্কৃত নাটক হ'তে। একটি দৃষ্টান্তে আমাদের কথার যাথার্থ প্রমাণিত হ'বে। বিকৃতমস্তিষ্কা মাতার হাতে স্ত্রীর মৃত্যু দেখে বিন্দুমাধব বল্‌ছে, "আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কী সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রাচীরে বেষ্টিত; শোকশার্দূল আক্রমন করিতে অক্ষম।" এ উক্তি আমাদের মনে শোক সঞ্চার করা দূরে থাক হাসিয়ে পাগল করে।

নাটকটি পুরাপুরি tragedy-ও হ'য়ে ওঠেনি। মানুষ নিষ্ঠুর ভাগ্যের সাথে বিরামহীন সংগ্রাম করে যখন পরাজিত হয় এবং সেই পরাজয়ের দ্বন্দ্বে যখন তার হৃদয়-মূল ক্ষতবিক্ষত হয় তখনই তার হৃদয়-মূলে পতিত হয় tragedy-র বজ্রাঘাত। কিন্তু এই নাটকে কোথাও সে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটেনি। এ নাটকে দৃশ্য-দৃশ্যান্তে আমরা পেয়েছি কেবল একটানা নিপীড়নের ইতিহাস, ক্ষমতাশালী কর্তৃক দুর্বলের নির্যাতন—কিন্তু সেই নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পুরুষাকার প্রতিরোধ কই? কেবল একটানা ছেদহীন দুঃখভোগের মাঝে Tragedy নেই। এই সব ত্রুটি মনে রেখে এই নাটককে বাংলা ভাষর সর্বপ্রথম সার্থক নাটক বল্‌তে আমাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না।

কিন্তু এই সাথে আমাদের আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। দোষগুণ নিয়েই মানুষ, তার সৃষ্টিও তাই আলো-আঁধারেই ভরপুর। ত্রুটিহীন নাটক পৃথিবীর সাহিত্যেই বা কটা আছে! প্রথম শ্রেণীর যত ভাল উপন্যাস-নাটকই হোক না কেন—তার ভিতর থেকে ত্রুটি বের করা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু এই ত্রুটি দিয়ে যদি তার মান নির্ণয় করতে যাই তা হ'লে গ্রন্থটির প্রতি অবিচার না হ'য়ে পাবে না। চাঁদে কলঙ্ক আছে তাই বলে আমরা যদি তাকে কলঙ্কিনী বলে উপহাস করি তা' হ'লে তা' আমাদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হ'বে। সকল কলঙ্কের মাঝে, সকল অন্ধকারের মাঝে তার নয়নাভিরাম অনাবিল সৌন্দর্যরাশি আমাদের হৃদয়-বেলাভূমিতে যে অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন আনে সেইখানেই চাঁদের সৌন্দর্য-মূল্য নিহিত। শত ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা নাটকের গঠমান যুগে ভোরের আকাশে নীলদর্পণ যে অপূর্ব রক্তিমচ্ছটা এনেছিল তা' আজিও অম্লান রয়েছে।

নীলদর্পণের মূল কাহিনী গোলকবসু পরিবারকে কেন্দ্র করেই কল্পিত হ'য়েছে কিন্তু এই মূল কাহিনীর সাথে সাধুচরণের পরিবারকে অবলম্বন করে আর একটি

উপকাহিনী সংযুক্ত হ'য়েছে। নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন যে কী গভীর ও ব্যাপক হ'য়েছে—নিখিল বাংলার হ'য়ে এই দুইটি পরিবারই তার সাক্ষ্য দিয়েছে। উভয় পরিবারই সর্বস্ব হারিয়ে পথের কাঙাল হ'য়েছে, অবশেষে আত্ম-পীড়নে মৃত্যু-বরণের মাঝে চরম শোকবহ পরিণতি নেমে এসেছে। দু'টি পরিবারের ক্রমপরিণত পরিনামের বিকাশধারা নাটকটির মধ্যে অনবদ্য হ'য়ে ফুটেছে। এই দু'টি পরিবারই নীলকরদের সহজ অত্যাচার রীতির মাঝে সংঘাত এনেছে—আর সেই সংঘাতের ইন্ধন যুগিয়েছে গোপীনাথ ও পদীময়রাণী। "নীলদর্পণের বিষয়বস্তুর মধ্যে এক দৃঢ় সংহতি ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, অপ্রাসংগিক দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের অনুচিত অবতারণা দ্বারা ইহার ঘটনা প্রবাহ কোথাও তির্যক কি তরল করা হয় নাই। স্বল্পকালের পরিসরের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তু সীমায়িত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে এক ঘন-গম্ভীর ভাবচেতনা প্রাণময় রূপলাভ করিয়াছে। অনেকগুলি দৃশ্যের উত্তেজনামূলক চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া নাট্যকার তাঁহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন।" বেগুনবেড়ের কুটির গুদাম ঘরে রাইয়তদের দুঃখভোগ, রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা এবং নবীনমাধব ও তোরাপ কর্তৃক তার উদ্ধার সাধন ইত্যাদি ঘটনাগুলি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত মূল কাহিনীর মধ্যে চমকিয়ে ওঠে। এই ঘটনাগুলির দ্বারায় যে dramatic action-এর সৃষ্টি হয়েছে তা অনবদ্য।

কাহিনী বিকাশে লেখক পাশ্চাত্য-রীতি অনুসরণ করেছেন। প্রথম অঙ্কে গোলকবসু ও সাধুচরণ এই দুই পরিবারের ওপর দুর্যোগের আভাস হ'তে Exposition শুরু। দ্বিতীয় অঙ্কে নির্যাতনের সূচনা—গোলকবসুকে কারারুদ্ধ করবার সংকল্প ইত্যাদি হ'তে কাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে (Growth or Developement)। তৃতীয় অঙ্কে দুই পরিবারের চরম অবস্থা (Climax), নবীনমাধবের প্রকাশ্য সংগ্রাম এবং ক্ষেত্রমনির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার ইত্যাদি। চতুর্থ অঙ্কে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি (Fall), মৃত্যুমুখে গোলকবসুর পরিবার এবং পঞ্চম অঙ্কে অঙ্কিত হ'য়েছে সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলায় দুটি পরিবারের নিষ্ঠুর ও সর্বনাশা পরিণতি (Catastrophe)। নীলদর্পণের পূর্বে মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে পাশ্চাত্য-রীতির এমন সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ ছিল না। এদিক দিয়ে নীলদর্পণের বিশিষ্টতা সহজেই চোখে পড়ে। পাশ্চাত্য-রীতি অনুযায়ী নাট্যকার এক একটি অঙ্ককে কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করেছেন এবং পাঠকের

মনকে লঘু ও হালকা করার জন্যে (Relief) মাঝে মাঝে রসিকতা ও ছড়া-গানের সংযোজনা করেছেন।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্র বিকাশে দীনবন্ধু মিত্র কোন মৌলিকতা দেখতে না পারলেও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার যে মুন্সীয়ানা এবং পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা' নিঃসন্দেহে অভিনব। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ইত্যাদি চরিত্রগুলি কেবল অনবদ্য নয় বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই চরিত্রগুলি তাদের আপন আপন পরিবেশে অপূর্ব রূপে বিকশিত হ'য়েছে। তোরাপ অশিক্ষিত, গেঁয়ো চাষা। জীবনে সে বেপরোয়া। যা' ভাল-বোঝে তা' সে করবেই—প্রাণ থাক আর যাক, পরোয়া নেই। সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত, আর চোখের বদলে চোখ। কিন্তু কঠোরতার অন্তরালে রয়েছে সুমহান আত্মত্যাগ, নিঃসীম প্রভুভক্তি আর অকৃত্রিম স্নেহসিক্ত মনুষ্য প্রীতি। শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের ভাষায়, "বাংলা সাহিত্যে তোরাপ ও রাইচরণের মত কৃষক এবং আদুরীর মত ঝি আর কোথাও অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না।" বাস্তবিক নাটক পড়ার সময় আমরা এই চরিত্র গুলির সংলাপ কেবল ছাপার অক্ষরে পড়ি না—কয়েকটি জীবন্ত মানুষকে যেন বইয়ের পাতায় দাপাদাপি করে ফিরতে দেখি। দীনবন্ধু মিত্রের এই সৃষ্টি কখনো ভোলবার নয়। গোপীনাথ এবং পদীময়রাণী চরিত্রহীন কিন্তু তাদের অন্তরের যে প্রীতি ও প্রেমের পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা'তে এই চরিত্রগুলিও অন্যান্য প্রধান চরিত্রের সাথে তাদের সমুদয় মালিণ্য ও কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে কখন কোন অজ্ঞাতসারে আমাদের মনের গহনে এক ধারে একটু খানি ঠাঁই করে নিয়েছে।

কিন্তু এ সব ছাড়াও নীলদর্পণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি আত্মগোপন করে আছে তার কাহিনীর চিরন্তনতায়। সাময়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে লিখিত এই নাটকের বিষয় বস্তু সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বকালীন হ'য়ে উঠেছে। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে এই গ্রন্থ যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল তার নজির অন্যকোথাও আর বড় একটা নজরে পড়ে না। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিখিল বাংলার নিপীড়িত কৃষককুল যখন মনে মনে প্রতিশোধের চরম পরিকল্পনা করছিল তখন নীলদর্পণ তাদের দুর্যোগঘন অন্ধকার পথ-যাত্রার নির্ভীক দিশারী হয়ে মশালের মত জ্বলে উঠ্‌লো। সেই অগ্নি-শিখায় চরম দীক্ষা লাভ করল অগনিত দেশবাসী এবং দাবানলের মত সে আগুন ছড়িয়ে গেল নিখিল বাংলার পথে প্রান্তরে। আবালবৃদ্ধবনিতা

সকলেই ক্ষিপ্রপ্রায় হ'য়ে উঠ্‌লো। "ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহাউদ্দীপনার ফল স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।" কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার শেষ হ'য়েছে বলে নীলদর্পণের মূল্য এতটুকুও কমে নি—এই গ্রন্থে যে বিদ্রোহের বাণী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে তা' দুঃখ-লাঞ্ছনা, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিত্যকালের প্রতিবাদ। "সে জন্য তাহার রক্ত-আখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।" অতীতে বহু নাটক লিখিত হয়েছিল কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না, বড় জোর তাদের স্থান বিশিষ্ট্য লাইব্রেরীর অন্ধকার সেলের মধ্যে হ'য়েছে—কিন্তু এই অতি আধুনিক যুগেও নীলদর্পণের পাঠ এবং অভিনয়তোড়জোড় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। গ্রন্থখানি যে চিরন্তন এবং শাশ্বত কালের ভাব সম্পদে ভরপুর তা' বলাই বাহুল্য।

নীলদর্পণই বাংলার সর্বপ্রথম সামাজিক এবং রাজনৈতিক নাটক। গোলকবসু এবং সাধুচরণের পারিবারিক চিত্র এর অক্ষয় সম্পদ। জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" যেমন পরবর্ত্তীকালের বহু কবিকে "গীত" রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল তেমনি নীলদর্পণ পরবর্ত্তীকালের বহু নাট্যকারকে "সমাজ-দর্পণ-নাটক" লিখ্‌তে প্রলুদ্ধ করেছে। নীলদর্পণ হোক ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু বর্ত্তমানের কোন ত্রুটিবিহীন নাটককে তো এই ত্রুটিপূর্ণ নাটকের মত মযাদা পেতে দেখা যায় না। এই সীমাহীন প্রভাব, এই চিরন্তনতাতেই নীলদর্পণ শাশ্বতকালের পূজনীয় গ্রন্থ। সত্যই নীলদর্পণই বাংলার সর্বপ্রথম সার্থক নাটক—নীল-দর্পণ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় সংযোজনা।

॥ তিন ॥

॥ নীলদর্পণে উন্নত চরিত্রগুলি অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি অধিকতর সার্থক ॥

একজন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক বলেছেন: গোপন করাই সাহিত্য। গোপন করার 'আর্টে' যিনি সিদ্ধহস্ত তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। যা বলা হয়, যা' প্রকাশ করা হয় তা' অপেক্ষা যা' অকথিত, যা' অপ্রকাশিত তার ব্যঞ্জনাই সাহিত্যে অধিকতর মূল্যবান। কেবল ছাপার অক্ষরে যে

তথ্য পরিবেশিত হয় তা একান্ত স্থূল, তার গণ্ডী সীমিত কিন্তু এই প্রকাশিত .তথ্যের অন্তরালে যে অপ্রকাশিত জগৎ, যে অপ্রকাশিত সৌন্দর্য-রাশি আপন মহিমায় শত বর্ণরাগে অনন্য হ'য়ে ফুটে ওঠে তার মূল্য অসীম। বস্তুতঃ এই অপ্রকাশিত সৌন্দর্যালোকের জন্যেই সাহিত্য সুন্দর। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে লেখককে অনেক কিছুই গোপন করতে হয়। ভাবের প্রাবল্যে, অনুভূতির তীব্র বেগবান স্রোতধারায় লেখক যদি কেবল ভেসেই চলেন তা' হ'লে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি কোন কালেই সম্ভব হয় না। ভাবকে আত্মস্থ করে অনুভূতির মাধুরিমা মিশিয়ে তাকে প্রকাশ করলে সাহিত্য প্রাণবন্ত এবং শাশ্বতকালের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে।

নীলদর্পণে আমরা দু' শ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করি : উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র—যার মধ্যে গোলোক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রধান এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্র—যার মধ্যে তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণী প্রভৃতি অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকার ভাবের প্রাবল্যে ভেসে গিয়েছেন, অনুভূতির তীব্রতায় দিকহারা হ'য়েছেন—ফলে এই চরিত্রগুলি আপন স্বরূপে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি; এক অপরিণত ভাবে এবং অস্পষ্টতার মাঝে এরা সলিল সমাধি লাভ করেছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকার যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এদের বেলায় লেখক ভাবকল্লোলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান নি বরং ভাবকে আত্মস্থ করে এদের সাথে একাত্মা হ'তে পেরেছেন। গোপনতার প্রকাশ মহিমায় তাই এই চরিত্রগুলি একান্ত সজীব ও ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কণে লেখক একদিকে যেমন ভাবের প্রাবাল্যে ভেসে গিয়েছেন তেমনি এদের মুখে সংলাপও দিয়েছেন কাব্যধর্মী। অলংকৃত এবং উপমাবহুল সংলাপের অন্তরালে এই চরিত্রগুলি তাদের আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। সৌরিন্ধ্রী এবং ক্ষেত্রমণী উভয়েই তাদের স্বামীকে ভালবাসে। সৌরিন্ধ্রী যে তার স্বামীকে কী গভীর ভাবে ভালবাসে নবীনমাধবের মৃত্যুর পর একস্থানে তার প্রকাশ দেখতে পাই। নবীন-মাধবের মৃতদেহ অবলোকন করে সৌরিন্ধ্রীর উক্তি : "আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পরাণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন।" ......পৃঃ ৯৫। এখানে আর যাই প্রকাশ পাক সৌরিন্ধ্রীর অন্তরের প্রগাঢ়

ভালবাসা উজাড় হয়ে প্রকাশ লাভ করে নি। অন্যত্র : "......প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন।"......এখানে অলংকৃত ভাষার কড়া-নাকাড়া-খোল-করতাল মৃদঙ্গের গম্ভীর নিনাদের অন্তরালে মূল সুরটি খান খান হ'য়ে ভেঙ্গে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

পক্ষান্তরে বেগুনবেড়ের কুঠিতে যখন পদীময়রাণী ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে রোগ সাহেবের কাছে যেতে জোরজবরদস্তী করে তখন ক্ষেত্রমণির মনভাব কত সুন্দর এবং সরলভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে : "......মুই পরাণ দিতি পারবো ধর্ম্ম দিতি পারবো না।" পদীময়রাণী তার কথায় এগিয়ে যায়। বলে, এখানে ধর্ম্ম দিলেও কেউ কিছু দেখ্‌তে পাবে না। এই কথার উত্তরে ক্ষেত্রের ধর্ম্মানুগত্য এবং স্বামীর প্রতি নিঃসীম ভালবাসা কী সুন্দর ভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে : "ভাতারই যেন জান্‌তি পারলে না—ওপরেব দেবতা তো জান্‌তি পারবে। ......আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বল্‌বে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল-বাস্‌বে ততমোর মন তো পুড়তি থাকবে।" অমার্জিত চাষার উলঙ্গ ভাষায় সতীত্বের কী মহিমাময় প্রকাশ এবং এই সতীত্ব বোধের জন্যেই অবশেষে তার কণ্ঠে সেই চিরন্তন অস্বীকারের বাণী : "জানাই হোক, অজানাই হোক—মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।" রোগ সাহেবকে অঙ্গদান করলে সুন্দর একসেট বিবির পোষাকের উপহারের কথা যখন পদী উচ্চারণ করে তখন গ্রাম্য ভাষার আবরণে ক্ষেত্রমণির হৃদয়টা উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশ পায় :...... "চট পর্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পরতি না হয়।" সাহেবকে বাবা বলে অনুনয় বিনয় করে যখন ক্ষেত্র ব্যর্থ হয় তখন তার বিদ্রোহিনী মূর্ত্তি ভাস্বর হ'য়ে উঠে : ...... "ও ভাইভাতারির ভাই, মার না মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না আর যে মুই সইতি পারি নে।"......

"ভাতার" এই বিশিষ্ট্য বাক্যটি সরলতা, সাবিত্রী কিংবা সৌরিন্ধ্রী এদের মুখে শোনা যায় নি—এদের মুখে আমরা প্রাণনাথ, প্রাণাধিক, প্রাণকান্ত ইত্যাদি উপমাযুক্ত বিশেষণই শ্রবণ করেছি। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রমণির মুখে শুনি আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ অশ্লিলতা সমৃদ্ধ গ্রাম্য ভাষা। কিন্তু এই গ্রাম্য ভাষার অন্তরাল হ'তে ক্ষেত্রমণির চরিত্রটি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। ক্ষেত্রমণি এই গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ এই পরিবেশ হ'তে ছিন্ন

করে যদি তাকে চক্‌চকে সহরে পরিবেশে আনা হ'তো—তা হলে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু অনিবার্য হ'য়ে উঠ্‌তো। আপন পরিবেশে আপন গ্রাম্যতায় আছে বলেই ক্ষেত্রমণি এত সুন্দর, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

অনুরূপে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে তোরাপের চরিত্রটি। তোরাপ-চরিত্রাঙ্কণে লেখক সর্বাপেক্ষা কৃতীত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তোরাপ অশিক্ষিত, বেপরোয়া এবং গ্রাম্য চাষা। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বল্‌তে সে জানে না—যা মুখে আসে তাই বলে, সেইমত কাজ করে। এবং এই জন্যই তোরাপকে বুঝ্‌তে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না। বেগুনবেড়ের কুটিরে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে গিয়ে রোগ সাহেবের প্রতি নবীন মধবের লাঞ্ছনা বাক্য এই: "রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানদের দয়া, বিনয়শীলতা? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার!" আর তোরাপেব গঞ্জনা বাক্য এই: "সমিন্দি দেঁড়্‌য়ে যেন কাঠের পুতুল—গোড়ার বাক্যি হরে গিয়েছে—বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোন্‌বে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা"...... এই বিদ্রূপবাণগুলি বাণের মতই কাজ করে। তীরের ফলার মত গিয়েই বুকে বেঁধে। কিন্তু নবীনমাধবের কথা আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা হ'লেও ধারহীন। তোরাপের রূঢ় গ্রাম্য কথা অনিবায লক্ষ্যভেদী, নবীনমাধবের উপমাবহুল কথা পথের বাঁকে দিক হারায়।

সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ট হ'য়ে উঠেছে নিখিল বাংলার প্রজাকুল। তার আভাস পাই নবীনের কথায়। নীলকরদের জবরদস্তি কম হ'বে কীনা পিতার এই জিজ্ঞাসায় নবীনমাধব উত্তর দেন: "জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে্য কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়?" নির্যাতনে অতিষ্ট হ'য়ে অবশেষে নবীনমাধবের কণ্ঠে শোনা যায় হতাশার দীর্ঘ নিশ্বাস: "হে মাতঃ পৃথিবী! তুমি দ্বিধাহও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!" কিন্তু তোরাপ একেবারে বেপরোয়া—ধরণী দ্বিধা হও এই কাতর প্রার্থনার বদলে তার কণ্ঠ হ'তে উৎসারিত হয় এক দীপ্ত বিদ্যুৎ-বহ্নি: "সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে

বার করি।" হোক এ কথা গ্রাম্য, রুচিহীন—কিন্তু উপমাবহুল রুচিপূর্ণ ভাষার এর সাথে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ কোথায়?

তোরাপ প্রভুভক্ত। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও "একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করো বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে" প্রস্থান করেছিল। কিন্তু নবীনমাধব গুরুতর আহত হওয়ায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল। তারপরই তোরাপের সেই বুকফাটা আর্তনাদ: "আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে— মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না!" অকৃত্রিম প্রভুভক্তির কী অনবদ্য প্রকাশ।

নবীনমাধবের মত তোরাপ উদার নয়—"ক্ষমার মহিমা সে জানে না, আবেদনের কোন মূল্য তাহার কাছে নাই, সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।" এবং এই জন্যই সে সাহেবের নাক ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই একগুয়েমী এবং জান্তব প্রেরণার অন্তরালে তোরাপের মর্মমূলে আছে আদিম মানব-প্রীতি: "……বড়বাবু যদি আপনি পলাতে পাত্তেন, সমিন্দির কান দু'টো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।" অত্যাচারী হোক, নেমকহারাম হোক তবু সাহেবগুলো খোদার জীব! একদিকে অকৃত্রিম প্রভুভক্তি অন্যদিকে নিঃসীম মানবপ্রীতি এই উভয়বিধ গুণ তোরাপ-চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

'ভাতার', 'শালা', 'সমিন্দি', 'মুই', ছাড়া তোরপ এবং ক্ষেত্রমণির মুখে কথা নেই। এ কথা অশ্লীল, অরুচিকর এবং গ্রাম্য তবুও এই 'গেঁয়ো' কথাগুলিই অঙ্গ ধারণ করে পরিপূর্ণ সজীব তোরাপ এবং ক্ষেত্রমণিকে আমাদের সাম্‌নে তুলে ধরেছে। নবীনমাধব, গোলকবসু, সৌরিন্ধ্রি এঁরা ভদ্রঘরের—মুখে ভদ্রোচিত ভাষা—কিন্তু সে ভাষা এদের কাউকে জীবন্ত করে তুল্‌তে পারে নি। "তাহাদের মুখের ভাষার তোড়ে হৃদয়ের ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে, হৃদয়বৃত্তির কোন প্রবল সংঘাত তাহাদের মধ্যে নাই।" কিন্তু তোরাপ ও ক্ষেত্রমণির মধ্যে এটি হয়নি। তাদের প্রাণ সহজ এবং সরল। তারা অশিক্ষিত—সুতরাং প্রাণের দিক দিয়ে তারা আদিম গ্রাম্য-তারই অধিকারী। আর ভাষার তো কথাই নেই। এই ত্রিবিধগুণের জন্যই তারা নাট্যাকাশে নির্মল, নিষ্কলুষ শুকতারার মত জ্বলেছে। নাটক যখন আমরা পাঠ করি তখন তোরাপ কেবল কল্পলোকের একটি গ্রাম্য চাষা হয়ে আমাদের সাম্‌নে ধরা দেয় না—এবং আমরা দেখ্‌তে পাই

একটী জীবন্ত গোঁয়ার-নম্র মহিষ নাটকের পাতায় পাতায় দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যিই তোরাপের মত চাষা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও আঁকা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ক্ষেত্রমণি বাংলার পল্লী ঘরের এক সরল বালিকা—তার লাজ-নম্র-বিধুর ছবিটি আমরা কোন দিন ভুলতে পারবো না। সত্যই এই নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি কেবল যে নাট্যরসের আধিক্য ঘটিয়েছে তা' নয়—এই চরিত্রগুলি নাটকের গতি-ধারায় তীব্রবেগ সঞ্চার করে সমগ্র নাটকটিকে দ্রুত মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

॥ চার ।

॥ নীলদর্পণে সমসাময়িক ঘটনা এবং নাটকের চিরন্তনতা ॥

সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায় "Art for Arts' Sake" এবং "Art with a purpose" এই দু'টি কথার সাথে আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত হতে হয়। একটির অর্থ সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি। আর একটির অর্থ প্রয়োজনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি। এই দু'টি আদর্শের কোনটি ঠিক এবং কোনটিকে অবলম্বন করে সাহিত্য-সৃষ্টি করা উচিত তা নিয়ে কেবল বাংলা দেশের নয় নিখিল বিশ্বের পণ্ডিত মহলে কত তর্ক-যুদ্ধই না হয়েছে। সুদূর অতীতকালে কে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তা' আমাদের জানা নেই কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নকে নিয়ে বিরামহীন গতিতে মসীযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে—কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কেউ সমর্থ হননি। Art for Arts Sake-এর দল বলেছেন—যে সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সৃষ্টি হয় তাই শাশ্বত, তাই কাল হতে কালান্তরে পদচারণা করে নিত্যকালের হয়ে ওঠে আর Art with a purpose বাদীরা বলেছেন সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে যদি কোন উদ্দেশ্য নিহিত না থাকে, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন দিয়ে যদি সাহিত্য সৃষ্টি না হয় তা হলে সে সাহিত্য কখনো দেশকালব্যাপী চিরন্তন সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। মাঝ হ'তে একদল নিরপেক্ষ মত নিয়ে বলেছেন শাশ্বত সাহিত্যে এই উভয়বিধ গুণ-ই বর্তমান। সাহিত্যকে দেশ কালের সীমারেখা অতিক্রম করে যদি চিরন্তন হয়ে উঠতে হয় তা হলে তাকে মানুষকে বিশুদ্ধ আনন্দ দান করতে হবে এবং সাথে সাথে কোন না কোন প্রয়োজন মেটাতে হ'বে। কেবল যদি একটি সাময়িক প্রয়োজনের

ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচিত হয় এবং তার শিল্প সম্মত-প্রকাশ গৌণ হয়ে যদি প্রয়োজনটাই মুখ্য হয়ে ওঠে তা হলে সে সাহিত্য কখনো চিরন্তন হয়ে উঠতে পারে না। সাময়িকভাবে তা পাঠকের চিত্ত হরণ করলেও প্রয়োজন সমাপ্তির সাথে সাথে তার অবসান ঘটবেই।

নীলদর্পণকেও আমরা এই উভয় মানদণ্ড দিয়েই বিচার করবো। নীলদর্পণ রচনার পিছনে যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না এ কথা কখনই বলা যাবে না। নীলদর্পণ উদ্দেশ্য মূলক নাটক। ভূমিকায় লেখকের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এই: "নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়।" এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নীলদর্পণ পরিপূর্ণরূপেই উদ্দেশ্যমূলক। এমন কী এর চরিত্রগুলিও একান্ত বাস্তব। নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়ে রাইয়তদিগকে নীল বুনবার চুক্তিতে বলপূর্বক আবদ্ধ করতেন। নীলকরদের এই অত্যাচারের ইন্ধন জুগিয়েছিল তৎকালীন ইংরেজ-জেলা মেজিষ্ট্রেটগণ এবং কয়েকটি বিদেশী চালিত সংবাদ পত্র। যে সব রাইয়তরা নীল বুনতে অসমর্থ হতো তাদের গুলি করে কিংবা বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করা হতো। হতভাগ্য নিপীড়িত প্রজাদের জন্যে সবুট অভ্যর্থনা তো হামেশাই চলতো। গোলক বসু এমনি এক অত্যাচারিত পরিবারের কর্তা, নবীন ও বিন্দুমাধব এমনি এক নিপীড়িত পরিবারের সন্তান। তোরাপ এবং রাইচরণ এমনই এক সর্বস্বান্ত ও বিধ্বস্ত গ্রাম্যচাষা। গোলক বসু তার জীবন দিয়েছে তোরাপ তার হাত দিয়েছে, রাইচরণ তার বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছে নীলকর পাষাণদের নির্মমতায়। গৃহস্থ কন্যা এবং বধূগণও এই পাষাণ-শ্বেতাঙ্গদের হাত হতে রেহাই পেত না। তাদের আত্মমর্যাদা, তাদের সতীত্ব লুন্ঠিত হ'তো এই শ্বেতাঙ্গ পশুদের দ্বারায়। ক্ষেত্রমণি এমনি এক নির্যাতিত গৃহস্থ কন্যা, আদুরী এমনি এক গৃহস্থ-ঝি। আর্চিবল্ড হিল্‌স্ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এক কৃষক-কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হ'ন। ঐ কন্যার নাম হরমণি। বালিকা যখন একদিন দীঘি হতে জল আনবার জন্যে বাড়ীর বার হয় তখন আর্চিবল্ডের লোক হরমণিকে জোর করে ধরে কুঠিতে অর্ধরাত পর্যন্ত আটক রাখে। এই সত্য ঘটনারই ছায়াপাত হ'য়েছে নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির চরিত্রে। প্রজাদের মনে অসন্তোষের আগুন ধীরে

ধীরে পুঞ্জিভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তারা নীরবে বহু অত্যাচর সহ্য করেছে এখন তারা নিজেদের অধিকারে সচেতন। নিখিল বাংলার আকাশে বাতাসে যখন এই বিদ্রোহের বাণী গুঞ্জন করে ফিরছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে নীলদর্পণ প্রদীপ্ত অনল-বর্তিকার মত জ্বলে উঠ্‌লো। আকুল হয়ে ব্যাকুল হৃদয়ে বুকের মাঝে বরণ করে নিল নিখিল বাংলার আপমর জনসাধারণ। সেই অগ্নিস্পর্শ করে চরম দীক্ষায় দীক্ষিত হ'ল তারা। বিধ্বস্থ কৃষককুল একতার মধ্যে এক মহাশক্তি খুঁজে পেল, বাঙালীর জীবনে জাতীয় ঐ এক মহাশক্তির উদার অভ্যুদয়। "অত্যাচারের লেলিহ জিহ্বা মুহূর্তকালের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।......এই মহাউদ্দীপনার ফল স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।"

নীলদর্পণ যে উদ্দেশ্য মূলক নাটক সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় যা কামনা করেছিলেন তা' পরিপূর্ণ-ভাবেই সফল হয়েছে। নীলকর-অত্যাচার বন্ধ হ'য়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন: উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরই কী নীলদর্পণের সমুদয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে? পরবর্তীকালের মানুষের ওপর তার কী কোন প্রভাব নেই? নবীনমাধব-তোরাপ কী আমাদের কানে আর কোন নতুন মন্ত্র দান করে না? যদি করে সেখানেই নীলদর্পণের চিরন্তনতার মূল বীজটি সুপ্ত আছে।

নীলদর্পণের সমসাময়িক বহুনাটক রচিত হ'য়েছিল—কিন্তু সে সব নাটক আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাদের কোন স্মৃতি আজ আর আমাদের মনকে আলোড়িত করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু নীলদর্পণ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়। নীলদর্পণ যখনই আমরা পড়ি তখনই এক অপূর্ব উন্মাদনা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়, বিদ্যুত ঝিলিকের মত একটি চকিৎ দীপ্তি যেন আমাদের সর্বাঙ্গে চাবুক মারে। গোলকবসু, নবীনমাধবের কথা তখন আমরা ভুলে যাই—গোলকবসু-নবীনমাধবকে অতিক্রম করে আমাদের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে অত্যাচারিত জনগণের বিধ্বস্থ ছবি। পাষাণ-শ্বেতাঙ্গদের নির্মম প্রহারে যখন তোরাপের বক্ষ হ'তে রক্তের ধারা প্রবহিত হতে দেখি তখন আমাদের হৃদয়-মন ব্যাকুলভাবে দুরন্ত আবেগে কেঁদে ওঠে। দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের অত্যাচার কী উলঙ্গভাবেই প্রকাশিত হ'য়েছে। আমাদের সম্মুখ হ'তে তোরাপ মিলিয়ে যায়, রাইচরণ অবলুপ্ত হয়—থাকে কেবল চিরলাঞ্ছিত, চির অপমানিত মানবতার এক করুণ ছবি!

নবীনমাধব যখন প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তোরাপ যখন পেশীফুলিয়ে তার আদিম স্বভাব নিয়ে মরণ পণ করে প্রতিশোধের জন্য উন্মত্ত হয়—তা' কেবল নিষ্ঠুর নীলকরদের বিরুদ্ধে গ্রাম্য চাষীর প্রতিবাদ নয়, দুঃখ-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তা' নিত্যকালের প্রতিবাদ। সে জন্য নীলদর্পণ "রক্ত-আখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ" হ'য়ে উঠেছে। ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেব যখন চরম অত্যাচারে মেতে ওঠে সে অবমাননা কেবল নীলকর এবং বাংলার বধূদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—তা'তে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের জান্তব চরিত্রের কাছে দুর্বল নারীর আত্মাহুতি এবং লাঞ্ছনারই পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রভুর সাহায্যের জন্যে তোরপের যে বিক্রম দেখেছি তা' চিরকালীন প্রভু-আনুগত্যের সোনালী-লিখন। বর্তমানের বাস্তবতার সূত্রপাত নীলদর্পণেই হ'য়েছে। নীলদর্পণেই দীনবন্ধু বাস্তবতার পথনির্দেশ করেছেন। "লেখকের দৃষ্টি এই সর্বপ্রথম আদর্শের নন্দন-কানন হইতে বিদায় লইয়া বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় সঞ্চরণ সুরু করিয়াছে, ধনীর বিলাস-হর্ম্যের মায়া কাটাইয়া দরিদ্রের কারুণ্য-কুটিরে প্রকৃত সত্য সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, ক্ষেত্র-মণিও তাহাদের দুঃখবেদনা শুনাইবার দরদী শ্রোতা পাইয়াছে।" নীলনর্পণ পরবর্তী বহু নাট্যকারকে যে সামাজিক নাটক লিখ্‌তে অনুপ্রাণিত করেছিল তা' বলাই বাহুল্য। তা' ছাড়াও এই গ্রন্থে যে করুণরস বর্ণিত হ'য়েছে পরবর্তী বহু নাট্যকারকে এমনকী নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রকেও তা' গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল', 'বলিদান' ইত্যাদি বহুবিখ্যাত নাটকের পৃষ্ঠায়। নীলকরদের অত্যাচার উচ্ছেদের মধ্যেই যদি নীলদর্পণের কাজ শেষ হ'য়ে যেত তা' হ'লে কখনই পরবর্তী নাট্যকারগণ এমন ভাবে প্রভবিত হ'তেন না। সব শেষে স্মরণ করি: শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ উক্তি: "বহু পুরাতন জনপ্রিয় নাটক বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিকার দিনেও নূতন করিয়া নীলদর্পণের অভিনয়ের আয়োজন যে দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় সমসাময়িক কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নিত্যকালের সাহিত্য-দরবারে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।" নীলদর্পণ রচনার পিছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল তা' আমরা দেখেছি—কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সাধনই এই নাটকের প্রাণধর্ম নয়। প্রকাশ ভংগির গুণে এ নাটক সেই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে সর্বকালীন হ'য়ে

উঠেছে। এখানেই এ গ্রন্থ সর্বকালীন শাশ্বত সম্পদ।

॥ পাঁচ ॥

॥ নায়ক-চরিত্রের স্বরূপ এবং নীলদর্পণের নায়ক ॥

নায়ক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নায়ক-চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। নায়কের ধ্যান, নায়কের কল্পনা, নায়কের কার্য-কলাপ ইত্যাদিকে অবলম্বন করেই নাটকের দৃশ্যাবলীর ক্রমবিকাশ সাধিত হয় এবং কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে বেড়ে চলে। নাটক যদি বিয়োগান্ত না হয় তা' হ'লে সে নাটকের নায়ক সাধারণতঃ শান্ত, ধীর স্থির হ'য়ে থাকে। দয়াশীল, ক্ষমাশীল এবং পুণ্যবাণ হওয়াও বিচিত্র নয়। ধর্ম কোন কোন নাটকের নায়কের প্রাণ-বস্তু হ'য়ে ওঠে।

নীলদর্পণ নাটকের মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি চরিত্রে আমরা উল্লিখিত গুণ-গুলির সমাবেশ দেখি—গোলক বসু এবং নবীনমাধব। গোলক বসু পরম ধার্মিক—দয়াশীল এবং ক্ষমাশীলও। কিন্তু নায়কোচিত যে চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন তা' গোলকবসুর চরিত্রে নেই। তিনি অল্পে ভীত হ'য়ে পড়েন; সামান্য বিপদেই তাঁর প্রাণান্তকর অবস্থা উপস্থিত হয়। ফলে তাঁকে নীলদর্পণের নায়কের পদে বরণ করে নিতে আমাদের মন সায় দেয় না। অবশ্য গোলকবসুকে কেন্দ্র করে নাটকের গতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে সত্য, তার কারাবাসে নবীনমাধবের বিচালিত অবস্থা ইত্যাদি, কিন্তু মূল কাহিনীতে গোলকবসু অপেক্ষা নবীনমাধবের প্রাধান্য সূচিত হ'য়েছে অধিক। নবীনমাধবও পিতার ন্যায় ধর্মভীরু এবং শান্ত নিরীহ মানুষ। কিন্তু বিপদ দেখে তিনি বিচলিত হ'লেও গোলকবসু ধৈর্যহারা হ'য়ে পড়েন না। এখানে তাঁর চরিত্রে নায়কোচিত স্বভাবেরই সমাবেশ ঘটেছে। প্রজাবৃন্দ এবং প্রতিবেশীগণ নবীনমাধবের ওপর অধিকতর আস্থাশীল। Dramatic action দেখবার জন্যে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত নাটকের সরল কাহিনীতে এসে সংযুক্ত হ'য়ে তাকে জটিল করে তোলে। নায়ক সেই বিপদরাশি অতিক্রম করে, জটিলতার গ্রন্থিজাল ছিন্নকরে নির্ভিকতা ও দৃঢ়তার সাথে আপন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু নীলদর্পণে কোন চরিত্রে আমরা এই বলিষ্ঠতার পরিচয় দেখি না। সাধু-চরণের কথায় একবার মাত্র জানা যায় স্বরপুর-বৃকোদরের বিক্রম-কাহিনী, আর একবার এই বিক্রম দেখি ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের বেলায়। সেখানে

নবীনমাধব যথেষ্ট সংগ্রামশীল হ'য়ে উঠেছেন—কিন্তু ঐ একটিবার মাত্র। নাটকের মধ্যে আর সর্বত্র তিনি জড়-পুত্তলিকা। সুতরাং নবীনমাধবকেও এই গ্রন্থের নায়ক বলা যায় না।

দৃঢ়তা এবং সংগ্রামশীলতার পরিচয় অদ্ভুত হ'য়ে ফুটেছে তোরপ চরিত্রে। বিপদে সে ভেঙে পড়ে না। যে তাকে অপমান করে সেও তাকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়। গ্রাম্য চাষা, সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—হাতের বদলে হাত, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জীবনের বদলে জীবন। ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের বেলায় তার চারিত্রিক যে দৃঢ়তা ও সংগ্রামশীলতা দেখি তা' কোনদিন ভোলবার নয়—কিন্তু তোরাপ একটি পার্শ্ব চরিত্র মাত্র, সে নায়ক হওয়ার উপযুক্ত নয়।

নীলদর্পণ বিয়োগান্তক নাটক। সুতরাং বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্যের সাথে নীলদর্পণের প্রধান চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক নিকল তাঁর 'Theory of Drama'তে বলেছেন যে, পুরুষচরিত্রই সব সময় ট্রাজেডীর নায়ক হবে। নীলদর্পণ পুরুষ চরিত্র প্রধান নাটক—সুতরাং এদিক দিয়ে এ গ্রন্থের নায়ক পুরুষ হওয়া বিচিত্র নয়। Aristotle তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে বলেছেন যে ট্রাজেডীর নায়ক অত্যন্ত ধর্মিক ও ন্যায়পরায়ণ হবেন না, তিনি পাপী এবং দুষ্কৃতকারীও হবেন না কিন্তু কোন মানবীয় (human) ভ্রান্তির জন্য ট্রাজেডী অনিবার্য হয়ে উঠ্‌বে :

'But a character of this is one who neither excels in virtue and justice, nor is changed through vice and depravity into misfortune from a great renown and prosperity, but has experienced this change through some (human) error,'

এ মানবদণ্ডেও বিচার করলে দেখা যায় গোলকবসু এবং নবীনমাধব নীলদর্পণের নায়ক হওয়ার উপযুক্ত নন—কেননা তাঁরা পাপী ও দুষ্কৃতকারী নন কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক। ন্যায়পরায়ণতাই তাঁদের জীবনের মর্মমূল হ'তে উৎসারিত হ'য়েছে। অন্যায়ের পথে তাঁরা কোন দিনই পদক্ষেপ করেন নি। তা' ছাড়াও এই গ্রন্থ যদি ট্রাজেডীপূর্ণ হয় তা' হলে এ ট্রাজেডী কোন মানবীয় ভ্রান্তির (hnman error) দ্বারা সংঘটিত হয় নি। এ ট্রাজেডী সংঘটিত হ'য়েছে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে।

সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ ট্রাজিক নাটকগুলিতে দেখা যায় নায়কের স্বকৃত কোনো

না কোনো ক্রিয়ার দ্বারা ট্রাজেডী নিয়তির মত অনিবার্য হয়ে উঠেছে—কিন্তু এখানেও সেই একই কথা। গোলকবসু কিংবা নবীনমাধব এদের কোন স্বকৃত ভ্রান্তির জন্যে ট্রাজেডী সংঘটিত হয়নি—এ ট্রাজেডী এসেছে বাইরে থেকে।

নীলদর্পণের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে একটিও দানা বেঁধে জমাট হ'য়ে ওঠেনি। গোলকবসু, নবীনমাধব কিংবা অন্য কোন চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় নি। কেন্দ্রীভূত কোন চরিত্রই এতে নেই। দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে কয়েকটি খণ্ডিত ছবি যেন আমাদের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। ফলে এ গ্রন্থের কোন চরিত্রকেই নায়ক বলা যায় না। যদি কোন চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে নায়ক বলে স্বীকার করতেই হয়—তা' হলে নবীনমাধবের চরিত্রই এই গৌরবের অধিকারী। কাহিনী তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা মূল কাহিনীতে নবীনমাধবের প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

॥ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

॥ এক ॥

॥ বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন ও সূচনা ॥

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সকল দেশে সকল সাহিত্যেই সর্বপ্রথম হয়েছে পদ্যের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। পদ্যের আগমন এবং সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠার বহুকাল পরে ধীরে ধীরে গদ্যের উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সকল দেশেই মানুষ তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্মে মনের ভাব প্রকাশ করেছে গদ্যের মাধ্যমে—সেখানে পয়ার বা লাচাড়ী ছন্দের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গদ্যের প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে হ'য়েছে সাহিত্যে তার ঘটেছে প্রাতষ্ঠা বহুকাল পরে। কেন? কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সকল দেশের সাহিত্যের কৈশোরাবস্থা কেটেছে যুক্তি-তর্ক হীন অন্ধ ধর্মীয় আবেগের মধ্যে। সেখানে অন্ধ বিশ্বাস, অসীম উচ্ছ্বাস ছিল বিশেষ রূপে ক্রিয়াশীল। পদ্য এই অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের উপযুক্ত বাহন। কবিতায় যে ভাবে সীমাতিক্রমী আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয় গদ্যেয় তা' হয় না। গদ্য বৈজ্ঞানিক মনের দান। উচ্ছ্বাস হীন যুক্তি-তর্কের পটভূমিতেই তার জন্ম। তাই কালের অগ্রগতিতে মানুষের মন যখন অন্ধ বিশ্বাসের আবেগবহুল পথ পরিত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে বিচার-বিবেচনার পথে পদচারণা করল তখন নিয়তির মত অনিবার্য কারণ বশতঃ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের হ'ল আবির্ভাব। আধুনিক কবিতায় যে গদ্যের প্রবেশাধিকার ঘটেছে তারও মূল কারণ এখানে নিহিত। আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের পথ পরিত্যাগ করে বাংলা কবিতা এখন সমস্যা-সংকুল বাস্তবাভিসারী হ'য়েছে।

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব যে পরে ঘটেছে সে সম্পর্কে আরো একটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। পূর্বে বাংলা কাব্যের "প্রধান বাহন ছিল পায়ার ছন্দ। বাংলা পায়ার ছন্দ বড়ই নমনীয় এবং সর্ববিধ ব্যবহারের উপযোগী। অনতিস্বল্পপরিসর পয়ার ছন্দের মধ্যে বাংলা ভাষার সরল বাক্য মূলক বাগ্‌ভংগির প্রকাশে কোন বাধা হয় না। এই হেতু পুরাতন

বাংলা সাহিত্যে বোধ এবং যুক্তিমূলক ভাবপ্রকাশের পক্ষে বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। পয়ারের মধ্যে সংযোজক অব্যয় অথবা অসমাপিকার প্রাচুর্যের কিংবা তালহীন জটিল বাক্য-পরম্পরার অবসর একেবারেই নাই, এজন্য পয়ারের ছাঁদে পর পর সরলবাক্যের মধ্য দিয়া ভাবপ্রকাশ গুরুতর প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। গুরু গম্ভীর দার্শনিক বিচারেও যে পয়ার ছন্দের ক্ষমতা কত দূর প্রসারিত হইতে পারে তাহার সুষ্ঠু পরিচয় পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে।"

এবার আমরা বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শনাদির দিকে মনোযোগ দেব। বাংলা পদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'—যার রচনা-সূত্রপাত আনুমানিক ৯৫০ খৃঃ হ'তে। কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে মাত্র ষোড়শ শতাব্দী হ'তে। বহু অনুসন্ধানের পরও এর পূর্ববর্তীকালের এক ছত্র গদ্য লেখা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নি। ষোড়শ শতাব্দী হ'তে আমরা বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাই তা প্রধানত চিঠিপত্র এবং দলীল-দস্তাবেজের মাধ্যমে। বলাবাহুল্য বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন-ধারায় এদের যে স্বল্পমূল্য আছে সেটুকুই এদের একমাত্র প্রাপ্য—এ ছাড়া এদের কোন স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মূল্য নেই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে তোডর মলের সময় 'সেকশুভোদয়া' নামে একটি বই সংকলিত হয়। বইটির ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের অন্তরালের বাংলা গদ্যের স্বরূপ এবং কাঠামো সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। সেজন্য বিশিষ্ট সমালোচকগণ পুস্তকখানিকে ষোড়শ শতকের বাংলা গদ্যের প্রতিচ্ছবির নিদর্শন হিসেবে ধরেছেন। বাংলায় লেখা প্রাচীনতম পত্র এবং নিদর্শন হিসেবে পণ্ডিতগণ যে পত্রটির কথা উল্লেখ করেন তা' ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ("শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়") কুচবিহারের রাজা নারনারয়ণ কর্তৃক আসামরাজকে লিখিত হ'য়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৪ই আষাঢ় ১১০৩ সালে) লিখিত একটি চুক্তিপত্রের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের উপভাষার একটি সুন্দর রূপ ধরা পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত (১১৩৮ সালের বৈশাখ মাস) যে দলীলটি পাওয়া গিয়েছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক 'প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবেও তেমনি মুল্যবান। রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া স্ত্রী অথবা পরকীয়া নায়িকা এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্বকীয়াবাদের সমর্থক জয়পুরের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য বাংলায় আসেন এবং পরকীয়াবাদের সমর্থক আচার্য রাধামোহন ঠাকুরের সাথে সুদীর্ঘ ছ' মাস ধরে

তর্কে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে রাধামোহন ঠাকুরকে গুরু স্বীকার করে' এই দলীল লিখে দেন।

Father Hasten-এর মন্তব্য হ'তে আমরা জানতে পারি যে ১৫৯৯ খৃঃ পূর্বে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলায় কিছু কিছু পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। বাংলা সাহিত্যে বিদেশীর দান নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন বৈষ্ণব সাধকগণের পুস্তক রচনায় বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী বৈষ্ণবসাধক দিগের একটি সম্প্রদায় গদ্যে পদ্যে "কড়চা" জাতীয় কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। কড়চা অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীতে নরোত্তম দাস রচিত "দেহকড়চা" এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই কড়চার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

"তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে হইল। তত্ত্ব বস্ত হৈতে। তত্ত্ব বস্তু কি। পঞ্চ আত্মা।" ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলা গদ্যের সাধু রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় নেপালে লিখিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিসয়ক একটি নাটকের গদ্যাংশযুক্ত সংলাপ হ'তে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরো কয়েকখানি গদ্য নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তা' ছাড়া বাংলা গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই শতাব্দীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কর্তৃক অনূদিত ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের গদ্যানুবাদ হ'তে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা বিক্রমাদিত্য-বেতাল ঘটিত অপূর্ব কাহিনী হ'তে সেকালের গল্প বলা ঢং-এর বাংলা গদ্যের নিদর্শনটি সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। এ ছাড়া সপ্তদশ শতকে রচিত "শূণ্যপুরাণে" বাংলা গদ্যের কিছু কিছু রূপ ধরা পড়েছে কিন্তু বিশিষ্ট্য সমালোচকগণ শূণ্যপুরাণে ব্যবহৃত গদ্যাংশকে বাংলা গদ্যের নিদর্শন না বলে ছড়া বলার পক্ষপাতী।

॥ দুই ॥

॥ বাংলা গদ্যে বিদেশীদের দান এবং তাঁরা বাংলা গদ্যের জনক কিনা ॥

বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে বিদেশী লেখকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অকৃপণ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণীয়। বাংলা গদ্যে বিদেশীদের দানের

আলোচনা সুবিধার জন্যে আমরা বিষয়টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারি। প্রথম ভাগের কাল-সীমা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ হ'তে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বে বাংলা গদ্যের যে উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল তা' একান্ত ভাবে রোম্যান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পোর্ত্তুগীজ পাদরীদের দ্বারা। দ্বিতীয় পর্বের কাল-পরিধি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হ'তে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পাদরিদিগের দ্বারা প্রথম পর্বে বাংলা গদ্যের যে উন্মেষ ঘটেছিল দ্বিতীয় পর্বে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারিদিগের দ্বারা তাই অভিনব প্রাণ-প্রাচুর্যে ও সম্ভাবনায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম পর্বের আলোচনা: ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পোর্ত্তুগীজগণ ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে বাংলা দেশে আসেন। বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই পোর্ত্তুগীজ পাদরিগণ এদেশে এসে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাধ্য হ'য়ে তাঁদের বাংলা ভাষা শিখ্‌তে হয়। কেননা বাঙালীর সাথে মেলামেশার জন্যে বাংলা ভাষা শিক্ষা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। বাংলা ভাষা শিক্ষালাভ করে কথ্য এবং লেখ্য উভয় প্রকারে তাঁরা খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ধর্ম প্রচারে এই লিখিত প্রচেষ্টাই বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হ'য়েছিল। পাদরিগণ খৃষ্টীয় ধর্ম-গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে তা' জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করতেন। Father Hasten এর উক্তি এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক-সংবাদ' এর প্রস্তাবনা হ'তে জানা যায় ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই ধরণের দু' একটি পুস্তক রচিত হ'য়েছিল। এই পুস্তিকাগুলির কোন সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও গদ্যের ক্রমবির্তন ইতিহাসে তাদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এখানে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক পাদরিগণের এই অনুবাদ-প্রচেষ্টার সম্মুখে বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ বা নমুনা ছিল কীনা। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকগণ বলেছেন যে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়গণ সাধনতত্ত্ব সম্পর্কীয় যে প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা কড়চা রচনা করেন সেগুলিই ছিল এই অনুবাদ-প্রেরণার উৎস-মূল এবং আদর্শ স্থানীয়। এ ছাড়া তখনকার দিনে "বাংলা সাধুভাষায় গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হইয়া গিয়াছিল।"

এরপর বাংলা গদ্যের বলিষ্ঠ রূপদানে দোম আন্তোনিওর—Dom Antonio—নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। দোম আন্তোনিও আসলে বাঙ্গালী। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ভূষণার এক রাজপুত্রকে মগদস্যুরা চুরি করে নিয়ে যায়। এক পর্ত্তুগীজ পাদ্‌রি বহু টাকার বিনিময়ে দস্যুদের হাত হতে রাজপুত্রকে

ছাড়িয়ে নিয়ে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং নামকরণ করেন দোম আন্তোনিও। এই দোম আন্তোনিও ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে অবিচ্ছিন্ন গদ্যে 'ব্রাহ্মণ রোম্যানক্যাথলিক-সংবাদ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থকেই অবিচ্ছিন্ন সাধুভাষায় রচিত প্রাচীনতম গদ্য পুস্তক বলে মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ এই গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করা হল: "রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ তাহান ভাই লকন, বাজা অযোদ্ধা বাপের সত্য পালিতে বন্‌বাসী হইয়াছিলেন"..... ইত্যাদি।

এর পরবর্তী গ্রন্থ পাদরি মনোএল-দা-আস্সুম্পসাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এবং ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবন সহর হতে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিকে পণ্ডিতগণ প্রচীনতম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক বলে মনে করেন। এবার গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। গ্রন্থখানি রচিত হয় ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে। মানোএল-দা-আস্সুম্পসাঁ — Manoel-da-Assumpsam-ঢাকা জেলার ভাওয়ালে অবস্থান করতেন। সুতরাং তাঁর গ্রন্থের মধ্যে ভাওয়ালের কথ্য ভাষায় প্রবেশাধিকার ঘটেছে। দোম আন্তো-নিওর গ্রন্থখানি ছিল পূরাপুরি সাধুভাষায় লেখা কিন্তু আস্সুম্পসাঁর গ্রন্থখানি কথ্য এবং সাধুভাষার সংমিশ্রণ বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে গ্রন্থ-খানির ভাষা পর্তুগীজ গন্ধী। কেবল গ্রন্থ রচনায় নয়—বাংলা ভাষার সুস্পষ্ট কাঠামো গঠন করার জন্যে আস্সুম্পসাঁ পর্তুগীজ ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণও রচনা করেন। এই ব্যাকরণ খানিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ। বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোশ-সংকলন আস্সুম্পসাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা: মানোএল-দা-আস্সুম্পসাঁর পর প্রথম পর্বে আর কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়নি। এবপর মুদ্রণ কার্যে বাংলা অক্ষরের প্রবর্তনায় বাংলা গদ্যের নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সাক্ষাৎভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে বাংলার শাসন-ভার। এরপর হতে কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে বাংলা শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এ উপলক্ষে কোম্পানির কর্ম্মচারী ব্র্যাসি হ্যাল্‌হেড ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে একটি বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয় স্যার উইলিয়ম জোন্‌স হলেন বাংলা মুদ্রণ-অক্ষরের সৃষ্টিকর্তা।

কোম্পানির আইনের পুস্তকগুলি অনুবাদ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল এ সময়। এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে দেওয়ানী আদালতের কার্যবিধি সংক্রান্ত তিনখানি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তবে স্মরণরাখা প্রয়োজন এই সব অনুবাদের ভাষা সর্বত্র সহজ এবং সুগম নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যের নবজন্ম ঘটে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হতে। ১৮০০ খৃষ্টব্দের জানুয়ারী এবং মে মাসে যথাক্রমে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—College of Fort William—স্থাপিত হয়। বাংলা গদ্যের ক্রম পরিপুষ্টিতে এই উভয় প্রতিষ্ঠানের মূল্য চিরস্মরণীয়।

ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনের উদ্দেশ্য ছিল বাইবেল, খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষিত এবং সাধারণ সমাজের মধ্যে বহুলরূপে প্রচার করা। তা' এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মাধ্যক্ষগণ করে ছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এবং এই গ্রন্থের পূর্বেও 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে Gospel of st. Mothew এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা শিক্ষা করা কোম্পানির কমচারীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। বাংলা বিভাগ ছিল এই কলেজের অন্যতম। এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়ম কেরি এবং কেরির অধীনে ছিলেন দু'জন পণ্ডিত—মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি—এবং ছ'জন সহকারী—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু। বাংলা পড়াতে গিয়ে কেরি সাহেব বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করেছিলেন। মূলতঃ তাঁর অদম্য উৎসাহে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন ফলে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিকতার সাথে সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমি গঠিত হয়। বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও দু'খানি বাংলা গদ্য পুস্তক, একখানি ইংরাজিতে বাংলা ব্যাকরণ এবং 'কথোপকথন' 'ইতিহাসমালা' নামে আরো দু'খানা বই কেরির নামে প্রচলিত আছে। শেষোক্ত বই দু'খানা উইলিয়ম কেরির রচনা কি না সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ আরোপ করেছেন। যা'হোক কেরী সাহেবের নিজস্ব রচনা ছাড়া তাঁর অদম্য উৎসাহে এবং উপদেশে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাংলা গদ্যের যে সুদৃঢ়

ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছিল—সেখানেও কেরির দান এবং মূল্য বাঙ্গালী মাত্রই চিরকাল কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করবে।

মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচার-প্রসার এবং বিবিধ পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যদিয়ে বাংলা গদ্য বিকাশের যে অভিনব পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেখানেও বিদেশীগণই পথপ্রদর্শক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল এবং মে-তে বিদেশীগণের দ্বারাই সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক 'দিগদর্শন' এবং সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য এই পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েই পরবর্তি কালে বাংলা গদ্যের অভিনব বিকাশ ঘটেছিল।

সুতরাং আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার, অনুবাদ গ্রন্থ এমন কি সংবাদ পত্র ইত্যাদি সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান-আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশীগণ ক্রমে ক্রমে বাংলা গদ্যের বলিষ্ঠ রূপ দান করার চেষ্টা করেছেন। জন্ম-লগ্ন হতে কৈশোরাবস্থা পর্যন্ত বাংলা গদ্য যেন বিদেশীদের হাতেই লালিত-পালিত হয়েছে। এ সকল দিক দিয়ে বিচার করলে বিদেশী-গণকেই বাংলা গদ্যের জনক বলা সঙ্গত। কিন্তু কিছু কথা আছে। কেবল মাত্র বিদেশীগণের দ্বারাই যে বাংলাগদ্যের জন্ম এবং বিকাশ সাধিত হয়েছে এ কথা ঠিক নয়। কেননা পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি বিদেশীগণের আগমনের পূর্বেও বিভিন্ন কড়চা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছে। এছাড়াও বিদেশীগণের রচনার বলিষ্ঠরূপ গড়ে ওঠার পূর্বেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শাস্ত্রের বলিষ্ট গদ্যানুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল। এ সকল পুঁথির কথা উল্লেখ করে ডকৃটর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন: "এই সকল পুঁথির সন্ধান না রাখিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে শ্রীরামপুরের পাদরি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদিগের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রবর্তন হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে আছে একদেশদর্শিতা এবং অসম্যক্‌বোধ।" এ প্রসঙ্গে ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত একটি সুন্দর কথা বলেছেন: "অনেকের ভিতরে এইরূপ একটা অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয় বণিক এবং ধর্ম্মযাজকগণের আবির্ভাব না ঘটিলে আমাদের গদ্যসাহিত্য গড়িয়াই উঠিত না। বাংলা গদ্য সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার কাজে ইউরোপীয় ধর্মযাজকগণের দান কিছুতেই অস্বীকার্য নয়,—তাই বলিয়া তাহাদের অনাগমনে এখনও পয়ার বা লাচাড়ী প্রবন্ধে আমরা আমাদের সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত করিয়া চলিতাম এমন কথাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কাল প্রবাহের ভিতরে বীজাকারে উপ্ত ছিল

গদ্য-সাহিত্যের সম্ভবনা,—প্রকৃতির অযাচিত দানের ন্যায় পশ্চিমের আলো-হাওয়া, বাংলার উর্বর ক্ষেত্রে তাহার সহৃদয় বর্ষণ এই বীজকে অতি অল্পকালের ভিতরে বাড়াইয়া তুলিয়াছে শাখায়-পল্লবে ফুলে-ফলে।" বস্তুতপক্ষে বাংলা গদ্যে বিদেশীগণের দান সম্পর্কে এইটাই হলো সার কথা। বিদেশীদিগকে বাংলা গদ্যে জনক বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে যেমন সত্যের অপলাপ হয় তেমনি পরশ্রীকাতরতায় তাদের নামকে প্রত্যাখ্যান করলেও অন্যায় করা হয়। আসলে কালের প্রবর্ত্তনে বাংলা গদ্যের উন্মেষ বাঙালীদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। বিদেশীদের আগমনে এবং সমবেত প্রচেষ্টায় সেই উন্মেষ ত্বরান্বিত হয়েছে।

॥ তিন ॥

॥ সাময়িক পত্রের উদ্ভব ঃ বাংলা গদ্যে তার দান ॥

বর্ত্তমান বাংলা গদ্যের অর্থগৌরব-দীপ্ত এবং অলংকার সমৃদ্ধ যে অনন্যসাধারণ উন্নতরূপের সাথে আমারা পরিচিত তা' প্রধানতঃ সাময়িক পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়েছে। সাময়িক পত্র পত্রিকার উদ্ভবের সাথে সাথে বাংলা গদ্য বিকাশের রুদ্ধ বেগবান উৎসমূলটি খুলে গিয়েছে। যে সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যের এই অসাধারণ উন্নতি তার জন্ম কিন্তু সেদিন—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। অবশ্য এর আগেও দু একখানি পত্রপত্রিকার সন্ধান মেলে—সেগুলি ইংরাজিতে মুদ্রিত, বাংলা গদ্যের উন্নতি-সাধনে তাদের কোন মূল্য নেই।

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রথম প্রবর্তনার মত আমাদের দেশে সংবাদ-পত্রেরও প্রতিষ্ঠা হয় ইংরাজদের দ্বারা। বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র Hickyর 'Bengal Gazette'। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নামকরণ কেবল ইংরাজীতে নয়—ইহা ইংরাজীতে মুদ্রিত এবং এরও সম্পাদক ছিলেন একজন ইংরেজ। এরপর 'India Gazette', 'Calcutta Gazette', 'Harkara' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি ১৭৮০খৃঃ হতে ১৮১৮ খৃঃ মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এ পত্রিকাগুলিও পূর্বের মত ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত। সাময়িক পত্রিকায় বাংলা ভাষার প্রথম ব্যবহার পাই ১৮১৮খৃষ্টাব্দে—শ্রীরামপুরের মিশনারি হতে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি ক্ষুদ্রায়তন মাসিক পত্রিকায়। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের

প্রথম সংখ্যা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটিতে 'ভূগোল, ইতিহাস, দেশ বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়-জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী প্রকাশিত হত। দীগ্‌দর্শনের ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ছিল বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী! সেজন্য স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে দিগ্‌দর্শন পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলন লাভ করেছিল।'

দিগ্‌দর্শনের পর উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক এবং প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশের তারিখ ১৮১৮খৃষ্টাব্দের মে মাস। এ পত্রিকাটিও শ্রীরামপুর মিশনারি হতে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। কিন্তু নামে মাত্র। আসলে পত্রিকাটির সকল কিছু করতে হতো জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়কে। 'সমাচার দর্পণে'র প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি হতে বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা' লঘু এবং গুরু উভয়প্রকার গদ্যের পরিচয়বাহী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের রচনায় আছে সংস্কৃতাদর্শের গুরুগম্ভীর রচনা আবার ছোট ছোট চিত্তাকর্ষক বর্ণনা এবং উপাখ্যানে পাওয়া যায় সহজবোধ্য লঘুরচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন 'সমাচারদর্পণের' প্রধান লেখক—এর রচনায় লঘু এবং গুরু উভয় প্রকার গদ্যাদর্শের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।

বাঙালীর দ্বারা সম্পাদিত এবং মুদ্রিত প্রথম সংবাদ পত্রের নাম 'বাংলা গেজেট'। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক। সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক কলিকাতা হতে ১৮১৮র জুন মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বাঙ্গালা গেজেটে'র কোন সংখ্যা আজ পযন্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ পত্রিকার বাংলা গদ্যের আদর্শ যে কিরূপ ছিল তা' জানবার কোন উপায় নেই।

এরপর যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'সম্বাদ কৌমুদী'। পত্রিকাটি রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন নেতার অদম্য উৎসাহে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি প্রকাশের একটু ইতিহাস আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা ছিল বলে এতে হিন্দুধর্মের কুৎসা এবং আক্রমনমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো। এবং প্রতিবাদমূলক কিছু ছাপা হতো না। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশ তাই বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমে রামমোহন 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির উপযুক্ত জবাব দিতেন এবং এই উত্তর প্রত্যুত্তর এর মাধ্যমে রামমোহন রায় কর্তৃক বাংলা সাহিত্যে বিতণ্ডামূলক গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশক। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের স্বল্পকাল পরেই ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে প্রকাশ করেন। এই ভাবে রামমোহন-পক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। রামমোহন-পক্ষীয় পত্রপত্রিকার সংখ্যা তিনটি—'ব্রাহ্মণ সেবধি'—১৮২১, 'সম্বাদ কৌমুদী'—১৮২১, এবং 'বঙ্গদূত'—১৮২৯ আর রামমোহন বিপক্ষীয় পত্রপত্রিকার মধ্যে প্রধান হলো দুটি—'সমাচার চন্দ্রিকা'—১৮২২, এবং 'সংবাদ তিমিরনাশক'—১৮২৩। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে এই যুগের বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট রূপটি ধরা পড়েছে। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রধান লেখক রামমোহন রায়ের রচনা অপেক্ষাকৃত সরল। তিনি উপদেশাত্মক, আখ্যানমূলক বা শিক্ষামূলক যে সকল প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সেগুলিতে আধুনিক বাংলার ছোট গল্পের কিছু রূপ ধরা পড়েছে। এগুলি যেমন অনাড়ম্বর, সরল, তেমনি চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু রামমোহনের প্রবন্ধাদির অধিকাংশই সংস্কৃতগন্ধী। রাম-মোহনের গদ্যরচনা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য : "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"

'সমাচার চন্দ্রিকার' সম্পাদক এবং প্রধান লেখক ছিলেন ভবানী চরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়। ভবানী চরণ ভাবধারা এবং আদর্শে ছিলেন প্রাচীনপন্থী। সমাজ সংস্কারের উগ্রতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। রামমোহনের সাথে মনোমালিন্য হওয়ার মূল কারণও ভবনী চরণের এই মানসিক দৃষ্টিভংগীর কৌণিকতা। তাঁর নববাবুবিলাস, কলিকাতা কমলালয় ইত্যাদি নিবন্ধ পুস্তকগুলি সেযুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ভবানীচরণের গদ্যভংগী অজটিল নয়। মাঝে মাঝে দীর্ঘবিলম্বিত সংস্কৃত লয়তালের সমাবেশ ঘটেছে।

এরপর উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সংবাদ-প্রভাকর। পত্রিকাটি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের—১২৩৭ সাল, মাঘ—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। পরে দৈনিকে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য সংবাদ প্রভাকরই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মুদ্রিত দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় বহু কবি-সাহিত্যিকের আত্মবিকাশ ঘটে। বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধনে সংবাদ-

প্রভাকরের মূল্য অল্প নয়। অলংকারবহুল নতুন ধরণের গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় সংবাদ-প্রভাকরের মধ্যেই। বঙ্কিমের অনুপ্রাসবহুল গুরুগম্ভীর অলংকৃত গদ্যরচনা প্রকাশের সূত্রপাতও এই পত্রিকায়। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে বলা যায় যদিও তাঁর গদ্য রচনার প্রভাব এই যুগের সকল লেখক এবং পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিল তথাপি পদ্যেয় তিনি যে সুনাম অর্জন করে ছিলেন গদ্যেয় তা' অনুপস্থিত।

সংবাদ প্রভাকরের পর 'জ্ঞানান্বেষণ', 'জ্ঞানোদয়' ইত্যাদি পত্রপত্রিকাগুলি ১৮৩১ হতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় কিন্তু বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় এদের সামান্য মূল্য থাকলেও সাহিত্যের ইতিহাসে এদের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ।

এরপর 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'—বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ গদ্যরচনার সূতিকা-গার। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যে নতুন প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চার ঘটে। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে। সম্পাদক হন অক্ষয় কুমার দত্ত। পত্রিকাটি ব্রহ্ম সমাজের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। সমিতির বিবরণ, কার্যসভার আলোচনা বক্তৃতার অনুলিখন, সংবাদ ইত্যাদির প্রকাশ ছিল এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা গদ্যের নবযুগ প্রতিষ্ঠার সকল বলিষ্ঠ লেখকগণই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফৎ আত্মপ্রকাশ করেন। অসংখ্য লেখকের মধ্যে অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদির নাম বিষেশরূপে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা ছিল তত্ত্ববোধিনীর প্রাণ-সম্পদ। অধ্যাপক মদনমোহন কুমাররে ভাষায়ঃ "সুদীর্ঘ মিশ্র বা যৌগিক বাক্য ব্যবহারের কৌশলকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া বাংলা গদ্যের মধ্যে যে শ্রুতিসুখকর গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতার সৃষ্টি করা যায়। তাহা অক্ষয়কুমারের প্রকাশিত বক্তৃতা গুলির মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়। কেবল বাগ্মিতা-প্রকাশে নয়, বৈজ্ঞানিক রচনার তত্ত্বনিষ্ঠায় ও ঐতিহাসিক আলোচনার যুক্তিপূর্ণ গাম্ভীর্যে অক্ষয়কুমারের রচনা সমভাবেই সার্থক একথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধ-গুলি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানের গভীর ও সুক্ষ্ম আলোচনায়, ইতিহাসের তথ্যানুশীলনে, ভাষাতত্ত্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য কঠিন আলোচনায় যে বাংলাভাষার প্রয়োগ কতখানি সুষ্ঠু হইতে পারে অক্ষয়কুমার তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষাগত সৌন্দযবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রবন্ধ ত্রয়ের ভাষায়। বাংলা গদ্যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রমুখ সাহিত্যিকগণ তাঁহার রচনারীতির দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক সুদীর্ঘ বার বছর তত্ত্ববোধিনী সম্পাদিত হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েক বছরের জন্য পত্রিকাটির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগরের মহাভারত উপক্রমণিকা পর্বের অনুবাদ সর্বপ্রথম এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয়—যে গদ্য এবং উপখ্যান রচনায় বিদ্যাসাগরের নিজস্ব গদ্য-রীতি, শিল্প-সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে তা' কোন মাসিক বা সাময়িক পত্রপত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না।

তত্ত্ববোধিনীর পর উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। পত্রিকাটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকাটিই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম সচিত্র পত্রিকা। বিবিধার্থের প্রথম সংখ্যাতেই তার উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে: "যাহাতে এই পত্র সকলে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের কর্তব্য;...অপভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্র সমাজে কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।" এই ঘোষণাপত্র হতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে বিদ্যাসাগরীয় সমাসবহুল সংস্কৃত-গন্ধী সাধু ভাষা অপেক্ষা প্রচলিত সহজ সরল ভাষার দিকেই ছিল এ পত্রিকার পরিচালক-গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব। বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে সাধুভাষাকে নাকচ করে দিতে না পারলেও পত্রিকাখানি সাধুভাষার গুরুগম্ভীর নিনাদকে অনেকখানি ক্ষীণ করে ফেলেছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টার পরও সাধুভাষার যে বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত আবরণ ছিল 'মাসিক পত্রিকা'র আবির্ভাবে তা একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকদ্বয়ের সবর ঘোষণা বিশেষরূপে লক্ষণীয়: "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এই ঘোষণার উপযুক্ত ভাষ্যরূপ প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যে আটপৌরে চল্‌তি ভাষা এতদিন ব্যবহৃত হয়ে আসছিল 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের একটা কৌলিন্যরূপ দেওয়া হল। বস্তুতপক্ষে গুরুগম্ভীর সাধুভাষার বিরুদ্ধে 'আলালের ঘরের দুলাল' যেন চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই চল্‌তি ভাষা ব্যবহারের জন্যে বাংলা গদ্যের বিবর্তনধারায় 'আলালের ঘরের দুলালে'র একটি বিশিষ্ট্য স্থান আছে।

এবং এর প্রভাব সে সময়ের বিভিন্ন গদ্য-লেখক এমন কি বিদ্যাসাগরের ওপর পর্যন্ত পড়েছিল। এই জন্যেই 'সীতার বনবাসের' শেষাংশের সমাসবহুল দীর্ঘ পদগুলি ভেঙে পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র সরল সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। এ পত্রিকার লেখকগণ ছিলেন প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরীয় গদ্য-রীতির অনুকারী। তবে 'মাসিক পত্রিকা'র মাধ্যমে বিদ্যাসাগরীয় রীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছিল তারও কিছু কিছু ছাপ এ পত্রিকায় আছে।

এরপর 'বঙ্গদর্শন'—বাংলা মাসিক পত্রিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রিকা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গ দর্শনের' প্রথম অভ্যুপ্রকাশ ঘটে এবং সাথে সাথে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যাসাগরীয় এবং টেকচাঁদী ভাষার যে দ্বন্দ্ব এতদিন চলে আসছিল বঙ্গ দর্শনের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাদের একটা সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই উভয় রচনা-রীতির সুন্দর সমন্বয় দেখি ১৮৭২ খৃঃ হ'তে বঙ্গ দর্শনে ক্রমপ্রকাশিতব্য উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হ'য়েছিল। কিন্তু এই উভয় উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বর বহুল ভাষার সাথে 'বিষবৃক্ষে'র ভাষায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান রচিত হ'য়েছে। বস্তুতপক্ষে বিষবৃক্ষের ভাষাতেই আধুনিক বাংলা গদ্য যেন আপন বলিষ্ঠ স্বরূপটি খুঁজে পেয়েছে। আধুনিক বাংলা গদ্য লেখকগণেব প্রত্যেকেই কমবেশী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত।

এরপর 'ভারতী' পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ-লগ্ন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ। এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই কল্পস্বপ্নের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার প্রথম সূত্রপাত। এ ছাড়া বালক, সাধনা (১৮৯১), নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-(১৯০১), প্রবাসী ইত্যাদি পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা অবিরাম প্রকাশিত হ'তে লাগল। বাংলা গদ্যের যত প্রকার রীতি এবং প্রকাশ-বৈচিত্র্য আছে তাদের সকলের সমন্বিত রূপ ধরে যেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। কোন কোম প্রবন্ধে গুরুগম্ভীর বিদ্যাসাগরীয় রচনা-রীতির ছাপ আছে, আবার কোন প্রবন্ধ বা আলালী ভাষার উপযুক্ত বাহন হ'য়ে উঠেছে। কোন কোন প্রবন্ধের অঙ্গ অলংকার-বৈচিত্র্যে দীপ্তোজ্জ্বল আবার কোন কোন গদ্যরচনা লিরিকের সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে। গদ্যরচনাও যে কবিতার সীমা-স্পর্শী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা তার প্রথম প্রমাণ পেলাম। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনায় শিল্পসৌন্দর্যের

এবং অলংকার সুষমার কাছে অন্যান্য সকল গদ্যলেখকের রচনা যেন নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছে।

সাময়িক পত্রপত্রিকারণ্যে "যমুনা" পত্রিকাটিরও একটি বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্রাদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যমুনার মধ্য দিয়েই গদ্যের অপূর্ব সারল্য-সৌকুমার্য নিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। 'Style is the man himself', কথাটি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। সারল্য, মাধুর্য্য, সমন্বিত শরৎচন্দ্রের লাবণ্য-সুষমামণ্ডিত গদ্যরচনা বাংলা গদ্য সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত অতি সাধারণ কথ্য ভাষার অন্তরালে যে শিল্প-সৌন্দর্যের এমন সুমহান অভিব্যক্তি লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্রের গদ্যরচনা না পেলে হয়তো আমরা তা' কোন দিন বিশ্বাসই করতাম না।

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সবুজপত্রের' মধ্যে বংলা গদ্য সাহিত্যের আর একটি বিশেষ দিকের আবরণ উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। এ পত্রিকার প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী। এখানে আমরা যে গদ্যরীতির সন্ধান পেলাম তা' কাব্যধর্মী নয়—বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তা' তীক্ষ্ণধার, ভাষার শানিত প্রয়োগে তা' ঝলকিত। বাক্যের শিথিল প্রয়োগ কিংবা এলায়িত বাক-বিন্যাস নয়—ভাষার কারুকরণ-সমৃদ্ধ অলংকার গৌরব ভূষিত মননশীল গদ্যরীতিই 'সবুজপত্রে'র বিশিষ্ট্য দান। 'বীরবলের 'হালখাতা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' এই গদ্যরীতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বর্তমানে বাংলা দেশে অসংখ্য পত্রপত্রিকা চালু আছে তন্মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, পরিচয়, দেশ প্রভৃতির নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে সওগাৎ, মোহাম্মদী, মাহেনও, ইমরোজ, আজাদ, জাগরণ, নওবহর ইত্যাদির নামও বিশেষরূপে স্মরণীয়। এ ছাড়াও আছে দৈনিকের শারদীয়া সংস্করণ। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বাংলা গদ্যের যে উন্নতি তা' কেবলমাত্র পত্রপত্রিকার মধ্যদিয়েই সাধিত হচ্ছে। সুদূর অতীত কাল হ'তে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার মধ্যদিয়ে বাংলা গদ্যের যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হ'য়েছে তা' চিন্তা করলে বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে যেতে হয়। এক একটি প্রভাবশালী মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী লেখক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

পত্রিকা	লেখক গোষ্ঠী
তত্ত্ববোধিনী, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩খৃঃ ভাদ্র মাস। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার দত্ত।	অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারী চাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।
বঙ্গদর্শন, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ, সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোগেশ চন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।
ভারতী, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ,সম্পাদক—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি।
সাধনা, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ইত্যাদি।

॥ **চার** ॥

॥ কয়েকজন শক্তিশালী গদ্যলেখকের রচনা-রীতি ॥

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকগণের মধ্য বাংলা গদ্যরচনায় সর্বাপেক্ষা দক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি কেরীর অনুরাগ ভাজন এবং সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। জন্ম এবং নিবাস মেদিনীপুর জেলায়। পূর্বে এ অঞ্চলটিকে উড়িষ্যার মধ্যে গণ্য করা হ'ত। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনার স্বরূপ পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে বিধৃত হ'য়েছে। গ্রন্থগুলি এই: বত্রিশ সিংহাসন—১৮০২, রাজাবলি—১৮০৮, হিতোপদেশ—১৮০৮, বেদান্ত চন্দ্রিকা—১৮১৭, এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা—১৮৩৩ খৃঃ।

বত্রিশ সিংহাসন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। বহুস্থানে আক্ষরিক অনুবাদ হওয়ায় অনূদিত গ্রন্থের সৌন্দর্য-সুঠাম ভংগী বহুস্থানে খণ্ডিত। বর্ণনামূলক সাধুভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানির বাক্য প্রায়ই জটিল এবং এই জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের সল্পতায়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর রাজাবলি। এই গ্রন্থখানিই দেশী লোকের লেখা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস। আলোচ্য গ্রন্থে চন্দ্রবংশের রাজা বিচিত্রবীর্য হ'তে বাংলা দেশে ইংরেজ আগমন ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। গ্রন্থখানি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডক্‌টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন: "রাজাবলির ভাষা প্রাঞ্জল এবং সেই গুণেই ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাপর গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে অনুবাদের আড়ষ্টতা, শব্দাড়ম্বর এবং লেখ্য ও কথ্য পদ্ধতির বিসদৃশ মিশ্রণ আছে। রাজাবলির ভাষা এই সব দোষ হইতে অনেকটা বিমুক্ত বলিয়া ইহার রচনা জমাট বাঁধিয়াছে।"

মৃত্যুঞ্জয়ের অপর তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রবোধ চন্দ্রিকার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির অধিকাংশই লেখকের স্বাধীন রচনা। গ্রন্থখানি সে যুগে বিভিন্ন কলেজ এবং কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং পর পর পাঁচটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থখানিকে মৃত্যুঞ্জয়ের এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যপুস্তক বলা চলে।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার প্রধান ত্রুটি সংস্কৃত সাহিত্যানুগ অলংকৃত ভাষা, অনুপ্রাস এবং সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার। তৎকালীন পণ্ডিতদের ন্যায় তাঁরও ধারণা ছিল পাণ্ডিত্যদ্বারা বাংলা ভাষা অলংকৃত করা যাবে। অনুপ্রাস-বাহুল্য হেতু তাঁর গদ্য লেখা স্থলে স্থলে ঢক্কানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্বোধ্য হ'য়ে পড়েছে। তথাপি সেই যুগে তাঁর রচনায় যে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে তা' সত্যই অভিনব।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যদিয়ে যে গদ্যরীতির শুরু করেন তা' মোটামুটি একইভাবে পরবর্তী কালের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের লেখার-ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল। সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় ভাবানুবাদে তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগ্‌লেন তা' সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হ'য়ে রইল। তারপর সাময়িক পত্রের প্রচলনে সাধারণের বোধগম্য লেখার প্রচলন হ'ল বটে তবে ভাষা

দোষ-দুর্বলতা-মুক্ত হ'ল না। চলতি বাংলা শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা। বাক্যের ছন্দ ও তাল না থাকবার দরুণ শ্রুতিমাধুর্য্যও বিশেষ ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়॥ বাংলা গদ্যের এমন এক ক্রম-জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিখিল ভারতবর্ষে যিনি আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন—লেখনীতে বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর মাধ্যমে বাংলা গদ্য সাহিত্যেও আধুনিকতার সূত্রপাত হল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্ম এবং দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে তিনি যে অভূতপূর্ব কৃতীত্ব দেখিয়েছেন তা' সত্যই বিস্ময়কর। রামমোহন রায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল বেদান্ত গ্রন্থ—১৮১৫, বেদান্তসার—১৮১৫, এবং কয়েটি বিতর্কমূলক গ্রন্থ। এই বিতর্কমূলক গ্রন্থাদির রচনা-উৎসগুলি ডক্টর সুকুমার সেন এইভাবে বর্ণনা করছেন: "রামমোহন প্রবর্তিত বেদান্তচর্চ্চা ও ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রণয়ন করেন। তাহার জবাবে রামমোহন লেখেন 'ভট্টাচাযের সহিত বিচার' নামক পুস্তিকা। ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন সহমরণ প্রথার অযৌক্তিকতা ও অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দুইখানি পুস্তিকা লেখেন—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ', এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার'। রাম-মোহনকে কটাক্ষ করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষান্তপীড়ন' রচনা করেন (১৮২৩)। ইহার উত্তরে রামমোহন লিখিলেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)।" প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণদের সাথে তর্কযুদ্ধে নেমে রামমোহন যেমন উল্লিখিত পুস্তিকাগুলি রচনা করেন তেমনি হিন্দুধর্মের ওপর কটাক্ষ করে শ্রীরামপুরের পাদরীগণ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কয়েকটি সাময়িক পত্রের প্রবর্তন করে এবং বিভিন্ন পুস্তিকার মাধ্যমে তিনি তার সমুচিত জবাব দেন। কয়েকটি উপনিষদের গদ্যানুবাদ এবং কয়েটি পারমাথিক সংগীত রচনা ছাড়াও ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনাপেক্ষা বাংলা গদ্যে প্রাঞ্জলতা এবং সরসতা দানের জন্য রামমোহন রায় আমাদের নিকট যুগযুগান্ত স্মরণীয়। যে যুগে বাংলা গদ্যে সরলতা বলে কোন জিনিষই ছিলনা বাংলা গদ্যের সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা-র যুগে রামমোহন রায় আপন সুদুর্লভ প্রাণ-প্রাচুর্যে অসীম শক্তি

ও সাহস দান করে গদ্য-শিশুকে প্রাঞ্জল সারল্যে উত্তর-যৌবনের প্রদীপ্ত বলিষ্ঠতায় উন্নীত করেছেন। সমকালীন বাংলা গদ্য রচনা সরল না হ'য়ে ওঠার পিছনে দু'টি কারণ ছিল—একটি ছেদচিহ্নর সল্পতা এবং অপরটি দূরান্বয়। রামমোহন এই উভয় ত্রুটী সম্বন্ধে বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বেদান্ত চন্দ্রিকার ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেছেন "এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভূত হয়।......বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"

সমকালীন বাংলা গদ্যের এই দোষ-দুর্বলতাগুলি অবহিত ছিলেন বলেই রামমোহনের রচনা বিশেষরূপে সরল, সহজ এবং সুষম (balanced) হ'য়ে উঠেছিল। তিনি প্রথম বাংলা গদ্যকে আড়ষ্টমুক্ত করে তার গণ্ডীকে সুদূর প্রসারী করেন। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যদিয়ে গদ্য সাহিত্যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। কিন্তু রামমোহন বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা দূর করে তাকে সরল এবং প্রাঞ্জল করলেও তাঁর রচনায় একটি মারাত্মক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। সরল এবং সহজ হ'য়েও তাঁর রচনা ছিল সাহিত্য রস হ'তে বঞ্চিত। ঈশ্বরগুপ্ত তাই ঠিকই লিখেছেন : "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন ......কিন্তু সে-লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই সাহিত্য রসের অল্পতাই হ'ল রামমোহনের রচনার সর্বাপেক্ষা বড় দুর্বলতা। বাংলা গদ্যের এই বড় রকমের অভাবটি মিটেছিল আরো কিছুকাল পরে—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ পূর্বেই বলেছি বাংলা গদ্যে সাহিত্য রসের সঞ্জীবনী ধারার অভাব পূরণ করার স্পষ্ট ইংগিত ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলা গদ্যের বুকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হ'লেন। যে সুধার অভাবে বাংলা গদ্য এতদিন নিরস হ'য়েছিল সেই সঞ্জীবনী সুধার দু'কূল প্লাবী বন্যায় তিনি বাংলা গদ্যের বেলাভূমিকে উদ্বেল করে দিলেন। বাংলা গদ্য প্রাণ পেয়ে জেগে

উঠ্‌লো। কৈশোর ছেড়ে যৌবনের দীপ্তরাগে হ'ল উন্নীত। বিশ্বকবির ভাষায়: "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ একটি বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে একাজটি তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।" যতিচিহ্ন স্থাপনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। এই চিহ্নগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের ছন্দ এবং ঝংকারকে হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ধ্বনির আরোহ এবং অবরোহ নিপুনতম ছন্দ-শিল্পীর ন্যায় বিদ্যাসাগর ধরেছিলেন। ধ্বনি ঝংকার অনুসরণ করে উপযুক্ত স্থানে যতিচিহ্ন স্থাপন করে বাক্যাংশগুলিকে শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্ব অনুসারে সাজিয়ে তিনিই প্রথম গদ্যছন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন।

লেখার ভিতর দিয়ে লেখক আপনার ব্যক্তিসত্তাকে রেখে যায়। শ্রেষ্ঠ লেখকের রীতি বা Style কেবল তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেনা, তা' কেবল ভাষার বাইরের অলংকারও নয়—তার ভিতরে রয়ে যায় লেখকের অন্তঃ পুরুষের সুনিবিড় প্রকাশ, গতিসত্তার অনবদ্য রূপায়ণ। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে আমরা বিদ্যাসাগরের যে গদ্য রীতির পরিচয় পাই 'বিদ্যাসাগর চরিতে'র মধ্যে তদপেক্ষা প্রাঞ্জল, মনোহর, শক্তিশালী রীতি আছে। এই রীতি পরিবর্তনে তাঁর প্রগতিশীল মন বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগরের রচনা রীতি আপন মাধুরিমায় প্রকাশিত হ'য়েছে। এই পুস্তকদ্বয়ের অনেকস্থলে যে ক্রিয়াপদের ব্যবহার হ'য়েছে তা' কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদ: "শকুন্তলা কহিলেন—হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হ'য়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি।" শকুন্তলায় ব্যবহৃত গদ্য রীতিতেই বিদ্যাসাগরীয় গদ্য রীতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছে। এবং এ রীতি আধুনিক গদ্য রীতির প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করে গেছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হ'তে এতদিন কোন স্পষ্ট প্রকাশ-রীতি গড়ে ওঠেনি যে রীতিকে অবলম্বন করে পরবর্তী

লেখকগণ আপন হৃদয়কে পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে এ অভাব আর রইল না। তিনি আদর্শ রচনা-রীতি গঠন করে তা সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরলেন। ভবিষ্যৎ গদ্য-লেখকদের পথকে তিনি সুপ্রসারিত ও সুগম করে দিয়ে গেলেন। এতদিন যে ধারা কোন রকমে আপন সত্তাটিকে রক্ষা করে আসছিল বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে সেই শুষ্ক-প্রায় ধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বেগবান হ'য়ে উঠ্‌লো। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা ভাষার অবয়ব খাড়া করেন, রামমোহন রায় আড়ষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দূর করেন আর বিদ্যাসাগর লালিত্য ও মাধুরিমা দিয়ে তাকে প্রাঞ্জল করে তোলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ॥ বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি আদর্শ মুগ্ধকর গদ্যরীতি পাওয়া গেলেও কথ্য ভাষা তখন ব্যাপকভাবে সাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে ওঠেনি। সাহিত্যের আনাচে কানাচে কোন রকমে সে আত্মগোপন করে ছিল। কথ্যভাষাকে তার আত্মগোপনের স্থান হ'তে তুলে নিয়ে তাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করার জন্যে এলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাধু-ভাষার মধ্যে এনেছিলেন গদ্য ছন্দের গুরু গম্ভীর ভংগী আর প্যারীচাঁদ মিত্র আনলেন বাংলা চল্‌তি ভাষার অবয়বে বাংলা গদ্য ছন্দের অভিনব লঘু ভংগী। এই অভিনব ভংগীতে লেখা আলালের ঘরের দুলালের প্রথম প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের বুকে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নভেল বা উপন্যাস বল্‌তে যা বোঝায় বাংলা সাহিত্যে আলালের ঘরের দুলাল দিয়ে তার সর্বপ্রথম সূত্রপাত। এই গ্রন্থে কথ্য ভাষার সাথে বাংলার বহু প্রবাদ স্থান পেয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের ভাষার প্রধান গুণ এর সর্বসাধারণের বোধগম্য সারল্য। "সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাস যুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্যভাষার ব্যবহৃত ফার্সী-শব্দের এবং কথ্যভাষা সুলভ বাক্যাংশ বা ইডিয়াম এবং প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ—ইহাই স্থূলতঃ আলালের ঘরের দুলালের ভাষাকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করিয়াছে।"

'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়,' 'যৎকিঞ্চিৎ' ইত্যাদিতেও এই গদ্যরীতির ব্যবহার হ'য়েছে। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতিতে যে কথা উপমা-অলংকার ইত্যাদিতে আবৃত হ'য়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ত প্যারীচাঁদ মিত্রের রীতিতে তার সম্পূর্ণ সত্তাটি ধরা পড়েছে।

গদ্য রীতিতে এই সরসতা দান প্যারীচাঁদ মিত্রের এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এখানেই।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে ধারা আমরা পর্যালোচনা করলাম তা'তে একক ভাবে কা'কেও প্রাধান্য দিলে অন্যায় করা হ'বে। প্রত্যেকেই আপন সাধ্যানুযায়ী বাংলা গদ্য সাহিত্যধারায় বেগ সঞ্চার করেছে। একটি কুসুমের মুকুল অবস্থা থেকে পূর্ণ পরিস্ফুট হওয়ার মধ্যে অখণ্ড প্রবাহ বিদ্যমান। অপরিণত মুকুল ছাড়া বিকশিত পুষ্প পাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্রের সময় যদি বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকশিত অবস্থায় থাকে তা' হ'লে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনে তার মুকুল অবস্থা। মৃতুঞ্জয় ও রামমোহনকে না পেলে আমরা কোনক্রমেই বিদ্যাসাগর ও মিত্র মহাশয়কে পেতাম না। শিশুর শৈশবের হাঁটি-হাঁটি পা-পা অবস্থা থেকে যৌবনের সুদৃঢ় পদক্ষেপ সঞ্চারণের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, এক অখণ্ড ধারায় তা' গ্রথিত। কোন বিশিষ্ট্য মুহূর্তকে যৌবনের স্বর্ণাসনে বসান যায় না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসেও সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট একজনকে বাংলা গদ্যের জনক বলা যায় না। বাংলা গদ্যের গঠমান যুগ হতে তার পূর্ণ রূপদানের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র এবং প্যারীচাঁদ কারও প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা গদ্যের পিতৃত্বের দাবীতে তাই কম বেশী সকলেই অংশীদার।

॥ ছিন্নপত্র ॥

॥ এক ॥

॥ রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের বহুমুখীনতা ॥

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মত পত্র-সাহিত্যের উৎসমূল খুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রাণ-প্রাচুর্য্যে তাকে সাবলীল ও বেগবান করে তুলেছেন। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে এই ধারাটির জন্মক্ষণ সূচিত হলেও সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র সে তখনো পাইনি। তখন চিঠি কেবল চিঠিই। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে সে ফতুর হয়ে গেছে। বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন-ঋণ মিটিয়ে সে দেউলে হয়ে পড়তো। যে গুণের জন্য চিঠি ব্যক্তিগত হয়েও সর্ব্বসাধারণের আনন্দের, ব্যষ্টির হয়েও সমষ্টির সম্পদে পরিণত হয়, প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে তার বড় একটা সন্ধান মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি তাঁর রচনা-বিচারের মানদণ্ড হয়ে উঠেছে! তার বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। কোন বইটা উপন্যাস হলো আর কোনটা বড় গল্প, গ্রন্থের কোন অংশ নীতি-বোধের ঔজ্জ্বল্যে প্রাণবন্ত আর কোন অংশ দুর্বল ইত্যাদির হিসাব-নিকাশে বঙ্কিম চন্দ্রের চিঠিগুলির সমুদয় রস ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং সে চিঠি প্রয়োজনের বেড়ি পায়ে পরে মরণ-মুখে এগিয়ে গেছে। মধুসূদনের চিঠির বিশেষ রস মূল্য আছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সীমা ডিঙিয়ে সে চিঠি সাহিত্যিক মর্য্যাদা দাবী করার স্পর্দ্ধা রাখে, কিন্তু তাঁর সমুদয় চিঠি ইংরাজীতে লেখা। স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিগুলির প্রকাশ এমন মর্ম্মস্পর্শী—যা'র পৃথক সাহিত্যিক মূল্য আমরা না দিয়ে পারিনে, কিন্তু রস-বিচারে সে চিঠি ধোপে টেঁকে না। প্রমথ চৌধুরীর চিঠিই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম চিঠি—যার একটি বিশেষ রস-মূল্য আছে। প্রয়োজনের ইস্পাত-কঠিন সীমারেখা সহজেই ছিন্ন করে দিয়ে সে চিঠি সাহিত্যের দরবারে আপন আসনটি দখল করে নিয়েছে। চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের বুদ্ধি-দীপ্ত মনন-প্রধান আলাপচারণা—এই নতুন ভঙ্গীতে, নতুন বাক্‌বিন্যাসের মূলে রয়েছে চৌধুরী মহাশয়ের ক্ষুরধার সুকর্ষিত গদ্য-রীতি। এই অননুকরণীয় বুদ্ধি-মুখর গদ্য-রীতি চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীর এক বিশেষ গুণ। তবুও

এই চিঠিগুলিকে ঠিক যেন অন্তরের সঙ্গে এক করে মনের মানুষটির সাথে মিলিয়ে গ্রহণ করা যায় না। মনে হয় কোথায় যেন কী একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। ঠিক ঠিক যতটা ঘরোয়া ও আপন হলে আমাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে, এই চিঠিগুলি ঠিক যেন সেই পরিমাণে ঘরোয়া নয়। তাই সকল প্রাচুর্য্যের মাঝেও যেন চিঠিগুলি ঠিক প্রাণবন্ত ও আপন হয়ে ওঠেনি। পত্র-সাহিত্যের এই সকল দুর্বলতা দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ তাকে এক অপূর্ব সৌকুমার্য্য ও রূপ লাবণ্য দান করলেন। এতদিন যে অকুলীন মেয়ের মত পরিত্যক্ত হয়ে পথের ধূলোয় আপন দেহ-ভার নিয়ে লজ্জামলিন হয়েছিল, আজ সেই পত্র-সাহিত্যই কৌলিন্যের জয়টিকা কপালে এঁটে সাহিত্যের রাজদরবারে অসংখ্য রাজপুত্রের মাঝখানে অকস্মাৎ স্বয়ম্বরার পশরা খুলে বসলো। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ মৃত পত্র-সাহিত্যের উপরে জীবন-কাঠির স্পর্শ বুলিয়ে তাকে সজীব, প্রাণবন্ত ও অপরূপ করে তুলেছেন।

ছিন্নপত্রের বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-পত্র-সাহিত্যের কল্পনা-স্বরূপের ও ব্যাপকত্তার প্রকাশ ঘটবে, কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী কম উল্লেখযোগ্য নয়। সুদীর্ঘ গৌরবময় সাহিত্য-জীবনে ও বৈচিত্র্যময় কর্ম-জীবনে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে নানাজনের কাছে পত্র লিখতে হয়েছে অবিরাম; কখনো তাগিদে, কখনো লৌকিকতায়, কখনো খেয়াল-খুশীতে কখনো কারণে, কখনো ইংরাজীতে, কখনো বাংলায়। কৈশোরের প্রথম কবিতা-উন্মেষের সূত্রপাত হ'তে শুরু করে আমরণ চলেছে এই চিঠি লেখালেখি। গুরুজন, পুত্র-পৌত্র, নাতি-নাতনী, জামাতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভাইজি, ব্যবসায়ী-বন্ধু, জ্ঞানী-গুণী সকলের কাছে তিনি চিঠি লিখেছেন। ফলে চিঠিতে তিনি কখনো বন্ধু, কখনো পিতা, কখনো বা স্বামী, কখনো বা পুত্র। নাতি-নাতনীদের কাছে লেখা চিঠিগুলি পরম রসিকতায় ভরা। আবার পুত্রদের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি অযথা কঠোরও নন। তাঁর চিঠির কতকগুলি জার্ণাল ধর্মী, কতকগুলি ডায়েরী ধর্মী, আবার কতকগুলি বা ভ্রমণকাহিনীমূলক। তাঁর পরিবারাশ্রয়ী চিঠিগুলির সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কোন কোন চিঠিতে তিনি করেছেন তত্ত্বালোচনা, আবার কোন কোন চিঠিতে দেখি তিনি পরম হাস্যবেগে মেতে উঠেছেন, আবার কোন কোন চিঠিতে পাওয়া যায় তাঁর কবি-মানস ও কাব্য-জীবনের অপূর্ব ব্যাখ্যা। পত্র রচনার বোধহয় এমন কোন দিক নেই, যেদিকে রবীন্দ্রনাথ পদচারণা করেননি। সাহিত্য রচনার মত পত্র রচনায় সকল দিকে তাঁর কল্পনার

পক্ষীরাজ দুরন্ত গতিতে উড়ে বেড়িয়েছে। সুতরাং বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার স্পর্দ্ধা পৃথিবীর খুব কম পত্র-লেখকেরই আছে। এই বৈচিত্র্যময়তা আবার উদার কল্পনা-মহত্ত্বে সজীব। কোথাও কোন দৈন্য নেই, কোথাও কোন কষ্ট-কল্পনা নেই—পত্রগুলি আপন স্বরূপে আপনি উজ্জ্বল। অপূর্ব বাক্য-বিন্যাস এবং সুকর্ষিত গদ্য-রীতি এই পত্রগুলিকে অনবদ্য করে তুলেছে। অধিকাংশ পত্রকেই তিনি অনমুকরণীয় গদ্য রীতিতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে খেয়াল-খুশীর মালা গেঁথে চলেছেন। কখনো এক-একটি পত্র আবার কল্পনায় মোহাঞ্জন-স্পর্শে নিটোল মুক্তোর মত লিরিকের অখণ্ড সুরে বেজে উঠেছে। সবার পেছনে আছে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃজনশীল মন—যার স্পর্শে সকল চিঠিই ব্যক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমষ্টির, প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের লীলা-রসের অঙ্গীভূত হয়েছে।

॥ দুই ॥

॥ ছিন্নপত্রের নামকরণ এবং রবীন্দ্র-পত্র-সাহিত্যের মধ্যে তার দান ॥

ছিন্নপত্রে সংকলিত চিঠিগুলি লেখার পরিধি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সর্ব্বমোট একশো বাহান্নটি চিঠি স্থান পেয়েছে এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখা চিঠির সংখ্যা মাত্র তেরটি আর অবশিষ্ট চিঠিগুলি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হ'তে পরবর্ত্তী-কালে লেখা। ছিন্নপত্রের সমুদয় চিঠিগুলি লেখা হয় কবি-বন্ধু শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্র-গবেষক শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "ছিন্নপত্রের মুদ্রিত সংস্করণের (১৬৩৫ সং) প্রথম আটখানি পত্র (২৭ পৃষ্ঠা) লিখিত হয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। তারপর ২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ১২৯৪, আশ্বিন হইতে ১৩০২ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে পত্রগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত। ১৪ বৎসর হইতে ২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইন্দিরা দেবী এই পত্রগুলি পান।" কিন্তু চিঠিগুলি 'অছিন্ন'—অর্থাৎ যে অবস্থায় লেখা হয়েছিল, সেই অবস্থায় মুদ্রিত হয় নি—'ছিন্ন' অবস্থায় এগুলির মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হয়। পত্রগুলি লেখার পঁচিশ বছর পরে যখন কবি এগুলি ছাপতে অনুমতি দেন তখন পত্রগুলি হতে ব্যক্তিগত অংশ বাদ দেওয়া হয়। তাই গ্রন্থের নামকরণ হয় ছিন্নপত্র।

ছিন্নপত্র এক আশ্চর্য্য পত্র-সংকলন গ্রন্থ। স্বাদ-বৈচিত্র্য, লিপি-চাতুর্য্যে এবং সহজ বেগবান বাক-বিন্যাসে গ্রন্থখানি কী মহানসুন্দর। অস্পটতায় এবং ম্লানতার এতটুকু গ্লানি পত্রগুলিকে স্পর্শ করতে পারেনি—পরম স্পষ্টতায় পত্রগুলি সহজ, সরল এবং সরব। নীল পদ্মাতীরে বসবাসের সুদীর্ঘ দশ বছরের এই যে জীবন—এই জীবনটিকেই যেন ছিন্নপত্রের বুকের মধ্যে একান্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করি! ঘূর্ণিত পদ্মার স্রোত মাথায় ফেনিল আবর্ত নিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম—রূপমুগ্ধ কবি অনিমেষ নয়নে সে দিকে তাকিয়ে বাক্য-হারা, হয়তো বা সম্বিৎহারাও। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি তখন একাত্ম, প্রকৃতি আর কবি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছেন। একের অন্তরে আর একের কী নিঃসীম প্রবেশ!

ছিন্নপত্র বিশাল প্রকৃতির একখানি অভিনব চিত্র এ্যালবাম। প্রকৃতির চিত্ররসে ছিন্নপত্র রসায়িত। পদ্মাতীরে নিখিল নিসর্গ-প্রীতি কখনো বক্রায়িত ছন্দে, কখনো নিরুদ্বেগহীন হাস্যমুখে, কখনো বিষণ্ণতার মহিমায়, কখনো বিপুল অর্থভরা নীরবতায় কবির মানসলোকে দূর-দূরান্তরের কত না কলগুঞ্জনকে নিবিড়ভাবে মেলে ধরেছে। ছিন্নপত্র তো এই সব নিবিড় চিত্র-বিলাস-স্পন্দনের সরব মূর্চ্ছনা। মূক প্রকৃতি এইভাবে মুখর হয়ে ওঠায় গ্রন্থখানি চিরন্তন কালের শাশ্বত রোম্যান্টিক সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ছিন্নপত্র সত্যই বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য কালের নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র-সাহিত্যের সাহিত্যের সঙ্গে ছিন্নপত্রের বোধহয় মূল পার্থক্য এইখানে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডাইরী'—এই দুই গ্রন্থের মিলিত সংযোজনায় আমরা পাই ভিক্টোরীর যুগের গ্লাডষ্টোন-শাসিত ইংল্যাণ্ডের এক অপূর্ব ছবি—এ সব পত্রেও প্রকৃতির ছবি কিছু কিছু আছে, কিন্তু ছিন্নপত্রের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আকাশ-পাতালের। 'ভানু সিংহের পদাবলী'তে কবির ভাব অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সাদাসিধে। গদ্য-রীতির কিংবা ভাব প্রকাশের কোন ইস্পাত-কঠিন নিয়ম-কানুন নেই। হাল্কা চালে আপন খেয়াল-খুশী মত কবি তাঁর আপন বক্তব্য বলে গেছেন। বক্তব্য যাই হোক, প্রকাশ-ভঙ্গীর সৌকুমার্য্যের মাপকাঠিতে 'ভানু সিংহের পদাবলী'কে ঠিক শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই। ছিন্নপত্রের সঙ্গে ভানু সিংহের পদাবলীর মূল পার্থক্যও এইখানে। ছিন্নপত্রও ঘরোয়া, তবু ভাব প্রকাশ মহিমায় মুক্তার ঔজ্জ্বল্যের মত একটি অপূর্ব্ব দীপ্তি তার সারা

অঙ্গে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথের পরিবারাশ্রয়ী চিঠিগুলি সংকলিত হয়ে আজ পর্য্যন্ত পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী এবং পৌত্রী নন্দিনী দেবীর নিকট লেখা পত্রগুলির মধ্যে হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপটি অতি সুন্দররূপে ধরা পড়েছে। এ সব চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ঘরোয়া, অত্যন্ত কাছের মানুষ, কৌতুক-পরিহাসের যেন চূড়ান্ত প্রতীক। কয়েকটি উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে: "শীত রীতিমত জমেছে, পিঠের ওপর মোটা কাপড়ের বোঝা বেড়ে উঠেছে। ধোপার গাধার যে কী দুঃখ তা' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।" অন্য আর একটি পত্রাংশ: "গতকাল অপরাহ্ণে চারু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটি চিরকুট এসে পৌছল। তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্ষ্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে তার মাতামহের লোক বিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষার খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিত চক্ষু মাষ্টার মহাশয়ের জয় জয়কার। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করেছি তার স্মরণাগত হব, অন্ততঃ ম্যাট্রিকটাও যদি কোন মতে তরে যেতে পারি।"

ছিন্নপত্রের মধ্যেও যে হাস্যরস নেই তা' নয়—তবে হাস্যরসই ছিন্নপত্রের মুখ্য বিষয় নয়। হাস্য-পরিহাসের মাঝে মাঝে কবির যে কল্পনা-জমাট ভাব-নিবিড় মনের প্রকাশ ঘটেছে, তার স্পর্শ এই সব ঘরোয়া চিঠিগুলির মধ্যে কোথায়? স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এবং কন্যা মাধুরীলতা ও মীরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে পরিবারাশ্রয়ী রবীন্দ্রনাথকে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে প্রথম যৌবনের উন্মাদ-মদিরবিহ্বলতা নেই বললেই চলে—মাঝে মাঝে উপদেশ বর্ষিত হয়েছে। সুতরাং এ সকল পত্রের মধ্যে আর যাই থাক, ছিন্নপত্রের সেই বিপুল কল্পনা-বিলাসী মনটি অনুপস্থিত। প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে কবির বুদ্ধি-দীপ্ত মনের পরিচয় সুন্দর হয়ে ফুটেছে। চৌধুরী দম্পতির কাছে লেখা চিঠিগুলিতে হৃদয়-বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সমান তালে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠে একই সমান্তরাল সরলরেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। কিন্তু ছিন্ন-পত্রের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তি প্রবল।

'পথে ও পথের প্রান্তে', 'জাপানে পারস্যে', 'জাভা যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি পত্রগুলি প্রায় একই রকমের। সবগুলিই ভ্রমণ কাহিনী-মূলক। বিশ্বগ্রাসী খ্যাতি নিয়ে কবি যখন যে দেশে যাত্রা করেছেন—নতুন কিছু রচনার উল্লাসে তখনই কবি মেতে উঠেছেন। ষ্টীমার জাহাজে

বসেও কবির বিরাম নেই—রূপমুগ্ধ স্রষ্টা কেবিনে ব'সে ব'সে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছেন। "সর্ব্বত্রই একটি গভীরাশ্রয়ী মন চিন্তার গ্রন্থি মোচন করে চলেছে। প্রাচীন ইজিপ্টের ভূগর্ভউদ্ভূত স্থাপত্য-কীর্ত্তি, কায়রোর হোটেল ম্যুজিয়ম, আরবী সাহিত্য, সহযাত্রী জার্মান নৃ-তত্ত্ববিদ প্রভৃতি টুক্‌রো কথার মধ্যে কবির মন্তব্যগুলি গভীর প্রসারী। ভ্রাম্যমান কবি চলার ফাঁকে ফাঁকে জগৎ ও জীবনের যে সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা বিস্ময়কর।" বস্তুতঃ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের এটাই সার কথা। চলমান দিনগুলির কত কথাই না তিনি এই গ্রন্থগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে কেবল 'পথে ও পথের প্রান্তে' একটু ভিন্ন ধরণের গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের ভ্রমণ-কাহিনী নয়—চলিষ্ণু জীবনের টুকরো ঘটনার আবেগময় রূপায়ণ। এই গ্রন্থটির সঙ্গে ছিন্নপত্রের একটি নিকট-সম্পর্ক আছে। ছিন্নপত্রের পত্রগুলি যেমন গভীরাশ্রয়ী, আত্মলীন ধ্যান-ধারণার আবেগে কম্পমান, তেমনি 'পথে ও পথের প্রান্তে'র অনেকগুলি পত্রে হয়েছে অতলান্ত মনের ধ্যান-কল্পনার অভিনব উদ্‌ঘাটন। তবুও ছিন্নপত্রে আমরা কবির বিপুল কল্পনা-প্রবণ মনের যে পরিচয় পাই, 'পথে ও পথের প্রান্তে' সে প'রচয় কোথায়? ছিন্নপত্রের সকল চিঠিই পত্র-সাহিত্যের সীমিত এলাকা অতিক্রম করে ডায়েরীর সীমায় পদচারণা করেছে। মনে হয়, এই পত্রগুলি কবি কাউকে লেখেন নি—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার মদির বিহ্বলতায় আপনিই নেশাতুর হয়ে পড়েছেন; চিঠিগুলি যেন মনের গহনে সদাজাগ্রত মানুষটির কাছেই লেখা। রোম্যান্টিক কল্পনার বিপুল উন্মেষে ছিন্নপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় সমুদ্ভাসিত। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, গ্রন্থখানি যেন পত্রের সঙ্কলন নয়—একশো বাহান্নটি অখণ্ড বিচিত্র লিরিক কবিতার অপূর্ব্ব সমাবেশ। ছিন্নপত্র নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-পত্র-সহিত্যের মর্ধ্যমণি।

॥ তিন ॥

॥ সমকালীন সৃষ্টিতে ছিন্নপত্রের দান ॥

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর ব্যাপক প্রচারে এবং তাদের অন্তর্নিহিত পরিচ্ছন্ন ভাব দেখে একটি কথা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন—রবীন্দ্রনাথ পত্র লেখেন না—পত্রের নামে লেখেন প্রবন্ধ, প্রচার

করেন আপন কবিধর্ম্মের স্বরূপটিকে। অনেক চিঠিই তিনি লিখেছেন কেবল প্রকাশ করবার তাগিদেই। তিনি বিশেষরূপে জানতেন, কোন-না-কোন সময়ে তাঁর পত্রাবলী বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে, সাময়িক এবং মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি তাঁর পত্র পাওয়ার আশায় হা করে তাকিয়ে আছে। বিশ্বগ্রাসী কবি-প্রতিভা এবং সুনাম এই 'অপেক্ষার' পিছনে বিরাজমান। অনুমানটি মিথ্যা না হলেও সর্ব্বাংশে সত্য নয়। কেন না কেবল প্রকাশের জন্যেই তিনি পত্র লিখতেন, এ কথা ব্যাপক খ্যাতির জন্য শেষ বয়সের বেলায় সত্য হলেও প্রথম জীবনের জন্য সত্য নয়। ছিন্নপত্র তিনি যখন লেখেন তখন তিনি মাত্র খ্যাতির কৈশোরে পদার্পণ করেছেন—সুতরাং এই চিঠিগুলি যে কোনদিন প্রকাশিত হবে, এমন কল্পনাও হয়তো কবি করেন নি। আর তা' ছাড়াও কেবলমাত্র প্রকাশের তাগিদে যে এমন চিঠি লেখা যায় না—তা ছিন্নপত্রের পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। আসল কথা, এসব চিঠিতে তাঁর বিপুল প্রাণ-প্রাচুর্য্য ভরা কবিমানসের নিভৃত পদসঞ্চার ঘটেছে।

চিঠিপত্র প্রকাশের একটি মস্তবড় বিপদ হলো এই ভাল-মন্দ নির্ব্বিশেষে কবির পূরো স্বরূপটি তা'তে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। কোন বিশেষ কবিকে তাঁর কাব্য পড়ে আপন মনের কল্পনায় তাঁর যে পবিত্র মূর্ত্তিকে খাড়া করি, চিঠিপত্রের মধ্যে এমন অনেক অজ্ঞাত এবং অপ্রীতিকর তথ্য প্রকাশিত হয়, যা' কবির জীবন-মহিমাকে অনেকখানি গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। মনে হয় এ চিঠির প্রকাশ না হলেই ভাল হ'ত। কিন্তু সুখের বিষয়, ছিন্নপত্র সে জাতের পত্র-সঙ্কলন নয়। এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত না হলে কবির কাব্য-জীবন-ধারার অনেক মূল্যবান তথ্যই অনুদ্ঘাটিত রয়ে যেত—আমরা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হতাম। কাব্য-রচনার অন্তরালে কবি-মানস যে কেমন ধীরে ধীরে আপনার কল্পনার দলগুলি মেলে দিচ্ছিল, কেমনভাবে মনের উপলে ভেঙ্গে পড়ছিল ভাবের ঊর্ম্মিমুখর ঢেউগুলি, অতি নিভৃতে কেমন-ভাবে চলছিল কল্পনার স্বর্ণ মসলিন নিয়ে কাব্য-বয়নের পালা—ছিন্নপত্র যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো অতি সঙ্গোপনে সেই সকল কথাই আমাদের কানে কানে বলে দিয়ে যায়। সুতরাং কবির কাব্য-জীবনধারায় বিকাশ-রূপ বুঝতে গেলে ছিন্নপত্র অবশ্য পাঠ্য।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি, ছিন্নপত্রের রচনাকাল ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হলেও মুখ্যতঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে লেখা

চিঠিগুলিই এতে স্থান পেয়েছে। আর এই সময়টি রবীন্দ্র-প্রতিভার এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনার যুগ। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই যুগটিই রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনার স্বর্ণযুগ। ভাবের জোয়ার প্লাবনে কবি-চিত্তের বেলাভূমি বার বার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। দু'কূল ছাপানো বান-ডাকা জোয়ার প্লাবনে শোনা গিয়েছে উদার অসীম উদাত্ত সমুদ্র-কল্লোল। প্রাণ-প্রাচুর্য্যের কী অপূর্ব্ব উন্মাদনা! ভাব-ঐশ্বর্য্যের কী দুর্ব্বার প্রক্ষেপ! রবীন্দ্র-নাথের অপরিসীম মর্ত্ত্যপ্রীতি এই যুগে জমাট বেঁধে উঠেছে। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষার সুস্নিগ্ধ রশ্মিমালা অনন্তের অলৌকিক পথে মোহজাল বিস্তার করেছে এই যুগেই। লোকালয়ের তীরে তীরে ঘুরে চলমান জীবনের সুখ-দুঃখে রাঙানো কবিমানসের যে অনবদ্য প্রতিফলন দেখি সংখ্যাতীত ছোটগল্পের মধ্যে—এই পদ্মাতীরে বাসের কালেই তার সূচনা। অসীমের সঙ্গে মিলনের যে সুবিপুল বাসনা পরবর্ত্তী যুগে কবিকে উন্মাদ করে তুলেছিল এই অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাগত দিবসের নির্জন কূলে বাসের সময়েই তা' নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কবির চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। দু'কূল ভাঙ্গা সঙ্গীতের সুর-মূর্চ্ছনার ইতিহাসও এই সময়কার দিনগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান। ছিন্নপত্রের দিনগুলি তাই কবির কাব্য-জীবনে মোহাঞ্জন মাখানো প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরা স্বপ্ন-বিহ্বল মুহূর্ত্ত। কাব্যে, গানে, গল্পে, পত্রে এই দিনগুলি অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনালোকে শুভ্র শুকতারাটির মত অম্লান হয়ে আছে।

সমকালীন সৃষ্টির সঙ্গে ছিন্নপত্রের এক গভীর সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্ক নিবিড় ঐক্যের, সে সম্পর্ক রক্তের। সোনার তরী, চিত্রা, গল্পগুচ্ছ আর ছিন্নপত্রের মধ্যে তাই দেখি একই সুর, একই ভাব, একই ধ্যান-কল্পনার গুঞ্জন। সকলের ধমনীতে যেন একই রক্ত আপন আবেগে সঞ্চালিত হয়েছে। গল্পগুচ্ছের পোষ্টমাষ্টার, ছুটি, সমাপ্তি, ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র গল্প গুলির জন্মেতিহাস যথাক্রমে ছিন্নপত্রের (২১,৬০), ২৮, ৩০, ১১০ এবং ১০৬ সংখ্যক পত্রের মধ্যে লুকান আছে। ছুটি গল্পের ফটিক এবং মাখন চক্রবর্ত্তীদ্বয়কে যেন ২৮ সংখ্যক পত্রের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে স্পষ্ট রূপ ১১৯ সংখ্যক পত্রের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে এসেছে। সোনার তরী এবং চিত্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে ছিন্নপত্রের বিশেষ কয়েকটি পত্রে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির স্পষ্ট রূপ পাই ৩৮, ৬৪ এবং ৬৭ সংখ্যক পত্রের মধ্যে। বসুন্ধরা, যেতে নাহি দিব, শৈশব সন্ধ্যা (সোনার তরী)

এবং সুখ, অন্তর্যামী (চিত্রা) ইত্যাদি কবিতাগুলির ছায়া পাই যথাক্রমে ৫৭, (১০, ১৯), ১০৮, (২২, ২৬, ৪৩), ২০২ সংখ্যক চিঠিগুলির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য: "স্বর্গ হইতে বিদায়, বৈষ্ণব কবিতা, পুরস্কার, বসুন্ধরা, জীবনদেবতা প্রভৃতি যে সকল কবিতা ভাবে ও প্রকাশে ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ তত্ত্বমাত্র নহে কিন্তু বিচিত্ররূপে ব্যঞ্জনাপূর্ণ, যাহাদের ভিতরকার দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারিত এবং প্রকাশ উপমায় ও রূপে জীবন্ত ও বস্তুগত—আমি তো কখনই মানিতে রাজী নই যে, কবি আপনার ভাব-জীবনকে পরিস্ফুট করিয়া লইবার এমন অবসর না পাইলে সে সকল কবিতায় এরূপ প্রসার বিচিত্রতা ও সত্যতা কদাচ দেখা যাইত।" বাস্তবিক পদ্মাতীরে বসবাসের এই জীবনটা কবিকে কী অদ্ভুত-ভাবেই না পরিপূর্ণতা দান করেছে। প্রকৃতি দেবী যেন স্বয়ং আপন শ্যামল হাতের পরশ দিয়ে কবির চিত্তকে প্রসারিত উদার বিপুল অসীমের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি কবির চিত্তে যে অভিনব রূপলোকের উদঘাটন করেছে, ছিন্নপত্রের বহু স্থানেই তার অঙ্গীকার আছে: "যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পিয়ালার মত আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে; যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে"—পঃ সঃ ১২২।

…"কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী আর তারি মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলী পরা বধূ, অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে, ধীরে ধীরে শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নদীর উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে, মৌনমুখে, শান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহ বেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!"—পঃ সঃ ১৫২।

মোট কথা, পদ্মা তীরে বসবাসের জীবনটি কবির মানসলোকে যে গোপন বিস্ময়কর সৃষ্টির পট পরিবর্ত্তনের পালা চলছিল, সেই অজ্ঞাত মানসলোকের

রহস্য ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রের এই 'উপরি পাওনাটাই' বোধ হয় আমাদের সব থেকে বড় লাভ।

এই পত্রগুলির বুকে যে অফুরন্ত মণি-মাণিক্য লুকান আছে, সে সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হ'তে একটি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন: "আমার অনেক সময় ইচ্ছে করে, তোকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আর চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্ত্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সের মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লে সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা কিছু ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়, কিন্তু যেটাকে আমি বাইরে থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, সেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল তোর সেই চিঠির বাক্সের মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্য্যাদা আমি যেমন বুঝব, এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার চিঠিগুলো দিস—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য্য সম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেন না, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, তা হলে এক সময় নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে। তখন আজকের এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা ভাবে ফিরে পাব···আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখ-দুঃখের দিনরাত্রিগুলি এ রকম করে গাঁথা নেই।"

ছিন্নপত্র হ'তে ব্যক্তিগত অংশটুকু ছিন্ন করায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কেন না এগুলি ছিন্ন করায় চিঠির যেটি মূল রস অর্থাৎ ব্যক্তিগত রস, সেটা থেকেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এই ব্যক্তি রসই চিঠিকে অনবদ্যতা দান করে এবং এর জন্যে পাঠকমণ্ডলী পত্র সাহিত্যের প্রতি একান্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠে। প্রিয় কবি সাহিত্যিকদের ব্যক্তি-গত জীবনের স্বরূপটি এই 'ব্যক্তি রসে'র মধ্যেই উদঘাটিত হয়। সুতরাং ছিন্নপত্র হ'তে এই 'ব্যক্তিগত রস'টি উধাও হওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বিশেষ অংশগুলি না থাকাতেও চিঠির রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এগুলি না

থাকার জন্যেই বরং সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে একটি অখণ্ড রস-প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। পড়তে পড়তে চিঠিগুলি এত সুদীর্ঘ-কালের ব্যবধানে রচিত হয়েছে বলে মনেই হয় না। একটি অখণ্ড রস এবং ভাব-ঐক্য আমদের মনে এক বিশেষ রকমের ভাল লাগার স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। অচ্ছেদ্য রস-প্রবাহের এই বিশেষ বিরামহীন সুরটি ছিন্নপত্রকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

পত্র সাহিত্যের বিশিষ্ট্য গুণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'ভারহীন সহজের রস' এবং 'ব্যক্তিগত রস' এই দুইটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ছিন্নপত্রের মধ্যেও এই দুইটি ভাবের সাক্ষাৎ মেলে। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি যেন প্রাণাবেগে আপনিই উৎসারিত হয়েছে। সহজ দৃষ্টি এবং সরল প্রাণের ভাল লাগা মন্দ লাগা বিষয়গুলি এখানে অনাবৃত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির মত কোন সচেতন প্রয়াস এই চিঠিগুলিকে স্পর্শ করেনি। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ভাব সরল হলেও সেখানে শিল্পীর সদাজাগ্রত মন ক্রিয়াশীল। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র অনেক স্থলেই রবীন্দ্র-নাথের কবি-চিত্ত সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে—কিন্তু ছিন্নপত্রের উল্লাস থাকলেও কবি কোথাও তাঁর ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে যাননি। জাগ্রত শিল্পী মন তাঁর সৃষ্টিকে শাসন করতে পারেনি। চিঠি লেখার নামে প্রবন্ধ লেখার যে দুর্নাম রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটেছে ছিন্নপত্র অন্ততঃ সেদিক থেকে মুক্ত। "একান্ত আত্মকেন্দ্রিক মনন কল্পনা নয়—হালকা চালে আলাপ করে যাওয়া, লঘুপদভারে চারিদিকের তথ্যের সংসারের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সংবাদ পরিবেশন করাই হলো চিঠি লেখার আসল উদ্দেশ্য।" বলা বাহুল্য এদিক দিয়ে বিচার করলে ছিন্নপত্র আদর্শ পত্র সাহিত্য। মাঝে মাঝে দু'এক স্থানে যে তত্ত্বকথা প্রকাশপায়নি তা' নয়—কিন্তু সে তত্ত্বকথা একটুখানি মাত্র উঁকি দিয়েই ব্যক্তিগত কথার ভীড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। অলংকার নইলে কবিতা-রমণীর লাবণ্যই ফোটে না। দোদুল ছন্দ এবং অনুপ্রাসের আন্দোলন না হলে সে অনেকখানি ম্রিয়মান। কিন্তু ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির জন্যে এমন কোন সাজ-সজ্জার প্রয়োজন হয়নি। এই চিঠিগুলির বেণী বাঁধা হয়নি, বেশবাস এলায়িত, সাজ-সজ্জা না করে যেমন ছিল তেমনি এসে হাজির হয়েছ—তাই পত্রগুলি এমন আশ্চর্য্য মনোহর।

॥ চার ॥

॥ ছিন্নপত্রে হাস্যরস ॥

লঘুপক্ষ ছিন্নপত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর হাস্যরস। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন পরম হাস্যরসিক। ছিন্নপত্রের মধ্যে তাঁর সেই পরিহাস-প্রিয় মনটার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। গুছিয়ে না রাখা সাদা কথায় কবি যে চিত্ররূপ এবং ভাবরূপের আনন্দ-ঘন প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই গ্রন্থে—তার পাশে হাস্য কৌতুকের যে একটি বেগবান স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে তার মূল্যও বড় কম নয়। মনে হয় এই নির্ম্মল হাস্যরসের ধারাটি গ্রন্থটিকে একটি অনাবিল মাধুর্য্যময় সহজ সারল্য দান করেছে। সকল উদার ধ্যান-কল্পনা, প্রকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনাবিল প্রকাশ—সবার পিছনে হাস্যরসের উচ্ছল সঞ্জীবতা মিশে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলেছে। গ্রন্থের একদিকে গভীর কথায় কবি যেমন গম্ভীর তেমনি অন্য দিকে বঙ্গ কৌতুকে তিনি লঘুভার। কৌতুক পরিহাসের ধারাটি যেন কবির রক্তে মিশে ছিল—তাই দেখি অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়ের আলোচনাতেও পরিহাস ব্যঙ্গ তার দলবল নিয়ে উন্মাদের মত কবির লেখায় এসে ভীড় জমিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। আটচল্লিশ সংখ্যক চিঠিতে কল্পনার প্রসারতার সাথে হাস্যরসের অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। মনোরম বিকেলে কবি সবান্ধবে বেরিয়েছেন বোলপুরের মাঠে ভ্রমণের জন্যে। আকাশে ছিল হালকা মেঘের স্বচ্ছ আবরণ। কিন্তু হঠাৎ "দেখি সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হলো এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই নিরাপদ।......বাড়ীর যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি তিন চারটে চাকর মহাসোরগোল করে দ্বিতীয় আর একটা ঝড়ের মত আমাদের উপর এসে পড়লো।...হয়তো কোন দিন বাধ্য হয়ে কাব্যে বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্য দিয়ে ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যা কথা লিখতে পারবো না। ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব—কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে।"

ছিন্নপত্র যেন হাসির খনি। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েও যে এমন ভাবে মানুষকে হাসান যায় তা' কল্পনা করেও বিস্মিত হতে হয়। এর পাতায় পাতায় এমনি

কত না হাসির টুকরো ছড়ান আছে। রবীন্দ্রনাথ যে পরম হাস্যরসিক ছিলেন এক ছিন্নপত্রকে তার দলিল হিসেবে উপস্থিত করলেই যথেষ্ট হবে।

ছিন্নপত্রের অঙ্গ সৌষ্ঠবে এর ভাষার অবদানই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এমন ভাষায় না লিখলে বুঝি ছিন্নপত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। ভাষা যেন ভাষা নয়—বিমূর্ত্ত মানব প্রকৃতির এক বিশেষ রূপ। কুমারীর প্রথম প্রণয়ের মত ভাষা যেন কথা কয়ে আমাদের অন্তর-ওষ্ঠে চুম্বনের পর ব্যাকুল চুম্বন দিয়ে সমুদয় প্রেম-সুধা দান করছে। শিল্পী মানুষটিকে তথ্য-পুঞ্জের আড়াল থেকে টেনে এনে একেবারে পাঠকের সামনে অনবদ্য ভাবে প্রকাশ করে তুলেছে। তথ্যভার অপসারিক করে কবি-সত্তাটিকে চিনে নেওয়ার কাজ সহজ করেছে। উপল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, শাল পিয়ালের বন মাড়িয়ে উদ্বেল কলহাস্য প্রিয় ঝরণা যেমন দুরন্ত পথে পাড়ি জমায়—সরল সহজ অনবদ্য ভাষা তেমনি সমুদয় ভাবরাশিকে মাথায় নিয়ে দুরন্ত বেগে পাঠকের অন্তর বেলাভূমিতে প্লাবন জাগিয়াছে।

বাংলার পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে ছিন্নপত্র এক অপূর্ব্ব সংযোজনা, এমন লঘুপক্ষ ভাববাহী সারল্য মাধুর্য্যে ভরা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। ছিন্নপত্র পত্র-সাহিত্য, ছিন্নপত্র লিরিক কবিতা, ছিন্নপত্র সঙ্গীত মূর্চ্ছনা, ছিন্ন-পত্র ভ্রমণ কাহিনী, ছিন্নপত্র ডায়েরী, ছিন্নপত্র রস-বাহী, ছিন্নপত্র চিত্র-গরিমার শ্রীক্ষেত্র, ছিন্নপত্র মানবহৃদয়ের বিচিত্র সুরালাপনার আন্দোলন। ছিন্ন-পত্রের পাতায় পাতায় কবি খেয়াল-খুসীর মালা গেঁথেছেন—যে মালা অনবদ্য, অপূর্ব, দোসরহীন, অনন্যসুন্দর!

॥ জীবন স্মৃতি ॥

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা : আত্মজীবনীর শ্রেণী বিভাগ ॥

আত্মজীবনী বোধহয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তার জন্ম অতি অল্প দিনের। রাসু সুন্দরীর "আমার জীবনী" হ'তেই সম্ভবতঃ এই জাতীয় আত্মচরিতের সূত্রপাত। তারাশঙ্করের "আমার কালের কথা'ই বোধহয় এই জাতীয় গ্রন্থের শেষতম প্রকাশ। আধুনিক কালে এই জাতীয় গ্রন্থের সমাদর বাংলায় দুর্বার হ'য়ে উঠেছে। বাঙালী পাঠক অত্যন্ত সমাদর ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই আত্মচরিত জাতীয় গ্রন্থকে আপন আনন্দ সহচর হিসেবে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্ত্য জগতে চরিত গ্রন্থের প্রচলন বহুপূর্ব হ'তে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার এবং প্রসার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হলেও আনন্দের কথা তা' অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে।

কবি এবং লেখকদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় জানার জন্যে সাধারণ মানুষের মনে একটা অনন্ত কৌতূহল আছে। কাব্যে এবং গল্প-উপন্যাসে সেই অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ার মত নয়—এ সবের অতিরিক্ত আরো কিছু প্রয়োজন, যেখানে পাঠক-পাঠিকা তাদের প্রিয়-কবি লেখকের সাথে একান্ত পরিচিতের মত মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াবে, একান্ত আপনজনের মত শুনতে পাবে তাঁদের চলমান জীবনের নিগূঢ় সুখদুঃখের খুঁটিনাটি কথা। আত্মচরিত গ্রন্থসমূহের বোধকরি এইটাই সবচেয়ে বড় লাভ। জীবন-চরিত গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনা ও আলোচনার মাধ্যমে আমরা লোকটির ব্যক্তি-পুরুষ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কিন্তু অন্তঃ-পুরুষের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনে। জীবনীতে আম-মহলের দ্বারই উদ্ঘাটিত হয় কিন্তু অন্দর-মহলের দ্বার থাকে যবনিকার অন্তরালে। জীবনী-কাব্যের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করার ছাড়পত্র সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা কায়িক রবীন্দ্রনাথের অন্তরালে যে আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন, কবি-সত্তা প্রকাশের অন্তরালে যে রবীন্দ্রনাথের আর একটি সত্তা বিরাজমান—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সেই সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। নজরুলের

ব্যক্তি-পুরুষের অন্তরালে যে আর এক নজরুল জীবিত—সে নজরুলের সন্ধান দেবে কে ? এখানেই প্রয়োজন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, স্বয়ং নজরুলের ; নিজের জীবনের চারপাশ ঘিরে দৈনন্দিন যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা স্বর্ণ-মসলিন বয়ণ করে চলেছে অবিরাম—আপনা ছাড়া আর কারও পক্ষে তার যথার্থ চিত্রণ সম্ভব নয়। আত্মজীবনী গ্রন্থে থাকে এই চিত্রাবলীর সুন্দরতম রূপায়ণ। জীবনী গ্রন্থে যা আভাসে ইংগিতে সমাপ্ত আত্মপরিচয় গ্রন্থে তাই রং ও রেখায় অনন্যসাধারণ। জীবনী গ্রন্থ প্রধানতঃ বাইরের এবং প্রসঙ্গত অন্তরের আর আত্মপরিচয় গ্রন্থ প্রধানতঃ অন্তরের এবং প্রসঙ্গত বাইরের ঘটনাবলীতে সুসমৃদ্ধ। জীবনীগ্রন্থ ব্যক্তির কর্মময় জীবনকে সুন্দর করে তুলে ধরে এবং তা' Objective আর আত্মপরিচয় গ্রন্থ অন্তঃপুরুষের পরিচয়ে উজ্জ্বল তাই এই জাতীয় গ্রন্থ প্রধানতঃ Subjective ধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি আত্মচরিত জাতীয় গ্রন্থ। কিন্তু তথাপি কবি গ্রন্থটিকে আত্মপরিচয়, আত্মকথা কিংবা আত্মচরিত নাম না দিয়ে জীবন-স্মৃতি নাম দিয়েছেন। এই নামের অন্তরালেই নিহিত আছে গ্রন্থটির স্বরূপ।

আত্মজীবনীর বিষয়বস্তু ও স্বরূপ নির্ণয়ে পণ্ডিত-মহলে মত বিরোধের অবধি নেই। এক একজন এক একভাবে এর স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। কেউ বলেছেন আত্মজীবনী হ'বে আত্মোদ্ঘাটনের চাবিকাঠি। আত্মোদ্ঘাটন না হ'লে আত্মজীবনীর কোন অর্থই হয় না। সকল ভালমন্দ, সকল পাপপুণ্য মিলিয়ে যে আমি সেই দোষগুণ সংপৃক্ত 'আমি'র রূপ ফোটানটাই আত্মজীবনীর প্রধান লক্ষ্য। প্রখ্যাত মনীষী রুশো এবং সেণ্ট আগষ্টিনের কনফেসান্স্ এই জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে রুশো এবং সেণ্ট আগষ্টিন যে ভাবে আপন পাপাচারের কথা লিপিবদ্ধ ক'রেছেন তা কল্পনা করাও যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে অসম্ভব। রুশোর গ্রন্থে নিজের যে উলঙ্গ-প্রকাশ ঘ'টেছে তা একদিকে যেমন ভয়াবহ তেমনি বাস্তব প্রেরণা-সমৃদ্ধ। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি গ্যায়টের আত্মজীবনীও এই জাতীয় গ্রন্থের একটি। সেখানে গ্যায়টের যে পরিচয় পাই তা অপূর্ব। পাপপুণ্যের সংমিশ্রণে সে গ্যাটে রহস্যাবৃত। পাপ-পুণ্যের উদ্ঘাটনই যদি আত্মজীবনীর মানদণ্ড হয় তা হ'লে জীবনস্মৃতিকে কোনক্রমেই আত্মজীবনী বলা যায় না। রক্তমাংসে গড়া মানুষের পক্ষে পাপ করা বিচিত্র নয়। কিন্তু জীবনস্মৃতির দিগন্ত যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাতে জীবনের প্রধান অংশই বাদ পড়ে গেছে এবং এ কথা জোর করেই বলা যায় পাপপুণ্যের যথাযথ স্বীকৃতি এ গ্রন্থে নেই।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা প্রয়োজন। নিজেকে উলঙ্গ প্রকাশ পাশ্চাত্ত্য রীতি হ'লেও ভারতীয় রীতি তা নয়। ভারতের রীতি সকল প্রকাশের মধ্যে কল্যাণের সঞ্জীবতাকে প্রধান ক'রে দেখেছে, সকল প্রকাশের মধ্যে দীপালোকের মত মঙ্গলের শিখাকে খুঁজে ফিরেছে। তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি লিখেছেন পরিণত বয়সে এবং এ সময় কবি পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং নিজেকে উলঙ্গরূপে প্রকাশ কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি যে তাঁর দুষ্টামীর পরিচয় দেননি—এমন কথা বলা যায় না। গ্রন্থের কোন কোন স্থানে তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।

আত্মপরিচয় গ্রন্থের দ্বিতীয় লক্ষণ সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন এই জাতীয় গ্রন্থে আত্মোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে দেশকালের কথা। তারাশঙ্করের 'আমার কালের কথা' এই জাতীয় গ্রন্থের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ গ্রন্থের একদিকে আছে সমসামায়িক দেশকালের অনবদ্য প্রকাশ। সমাজনৈতিক এবং রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থার ক্রম প্রকাশের সাথে সাথে আত্মপরিচয় মিলিত হ'য়ে গ্রন্থখানিকে অপূর্ব ক'রে তুলেছে। এই মানদণ্ডেও জীবনস্মৃতিকে আত্মপরিচয় গ্রন্থের গণ্ডীতে ফেলা যায় না। কেননা সমসাময়িক দেশকালের কথা গ্রন্থের মধ্যে অতি অল্পই স্থান পেয়েছে। স্বরাজ-আন্দোলন এবং দেশী জিনিসপত্রের প্রসার সম্পর্কীয় সামান্য আলোচনা হ'তে জীবনস্মৃতির দেশকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। তবে আভাসে ইংগিতে এইটুকু বোঝা যায়, সে সময় দেশ স্পষ্ট পরিবর্তনের মুখোমুখী এসে পড়েছে, নতুন জোয়ার আসার ইংগিত ফুটে উঠেছে তার সারা দেহে।

আত্মজীবনী সম্পর্কে আর একদলের মত এই জাতীয় গ্রন্থে থাকবে আপন শিল্পী জীবনের কথা। শিল্পীজীবনের ক্রম বিকাশের আত্মোদ্ঘাটন করাই এই জাতীয় গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। গ্যাটে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Poetry and Truth' এ তাঁর শিল্প জীবনের ধারাটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। "আমার সাহিত্যিক জীবন"-এ তারাশঙ্কর ঠিক এই ধারাটিকে নূতন রূপ দান করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবন-বিকাশ-ধারার কিছু পরিচয় পাই। বলা বাহুল্য এই বিকাশ ধারার ইতিহাস প্রাথমিক স্তরের। জীবনের প্রথম-প্রভাতে কবিতা উন্মেষ হ'তে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত এই প্রাথমিক ধারাটির পরিচয় লিপিবদ্ধ হ'য়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে। এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি হ'লেও পরযুগে

কবির কাব্য মানসের যে অনন্ত বিশাল প্রসরণ দেখেছি তার সামান্যতম আভাসও এ অংশে অবর্ত্তমান। রবীন্দ্র-কাব মানসের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর ঐকান্তিক মর্ত্তপ্রীতিতে, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষায় এবং জীবনদেবতার ইংগিতে অভিসারের যাত্রায় তথা আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র পর কবির কাব্যে যখন নীরব পদসঞ্চারে এই অভিনব অনুভূতির আবির্ভাব হ'চ্ছে ঠিক সেই সময় জীবস্মৃতির দ্বার রুদ্ধ হ'য়েছে। ফলে শিল্পীজীবনে বিকাশ ধারার অখণ্ড পরিচয় এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। সুতরাং এই মানদণ্ডেও জীবনস্মৃতিকে আত্মপরিচয় গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত করা বোধ হয় সমীচীন নয়। স্থূল দেহের অন্তরালে যে কবিপুরুষের সৌন্দর্য্যময় সত্তা বিরাজমান তার পরিচয় নিহিত রয়েছে বিশ্বকবির "আত্মপরিচয়" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে শিল্পী-জীবনের ক্রমোন্নতির ধারাটি ধীরে ধীরে অভিনব রূপে প্রকাশ লাভ ক'রেছে।

আত্মজীবনী গ্রন্থের স্বরূপ সম্পর্কে আর এক দলের মত এই গ্রন্থ হবে স্মৃতি কথায় ভরপুব। স্মৃতিধূপের সুরভি রচনা করা এই জাতীয় গ্রন্থের চরম লক্ষ্য। অতীত দিনের সেই স্বল্পায়ু মুহূর্ত্তগুলি, সেই বেদনাবিধুর চিরসুন্দর ক্ষণগুলি রোমন্থন ক'রে অপূর্ব গরিমায় উদ্ভাসিত করাই আত্মপরিচয়মূলক গ্রন্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য এই মানদণ্ডে জীবনস্মৃতি এক পরামাশ্চর্য গ্রন্থ। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্মৃতির এক একটি অপূর্ব চিত্র আপন-দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থখানিই স্মৃতির রোমন্থনে পরম বৈচিত্র্যময়। পরিণত জীবন-নদের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি কল্পনায় ফিরে গিয়েছেন তাঁর সেই স্বপ্নঘন রঙিন দিনগুলিতে, উদ্ধার ক'রে এনেছেন এক একটি চকিত-দীপ্তি ক্ষণ-উজ্জ্বল মুহূর্ত্তকে। মুহূর্ত্তগুলি আপন সৌন্দর্য্যে আপনি উজ্জ্বল, অনিন্দ্য সুন্দর। বাড়ীর মধ্যে সেই চাকরদের শাসন, রেলিং-গুলিকে ছাত্রকল্পনায় বেত্রহস্তে কবির সেই শিক্ষকত্ব, পিতার সেই তপস্যা-নিমগ্ন পরমাশ্চর্য্য ধ্যানগম্ভীর মূর্তি, নীরব মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে ব'সে দূর আকাশে শুভ্র মেঘপুঞ্জের সেই চিরমধুর আনাগোনা, বৌঠাকুরাণীর নিবিড় ভালবাসা-রাঙানো সেই স্বপ্নঘন দিনগুলি, নির্জন নিশীথে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বল্প জ্যোৎস্নালোকিত সেই ছায়া সুনিবিড় মুহূর্ত্ত, আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে বর্ষার আকশে সেই নবমেঘমালার পদসঞ্চার, শরতের সেই পরম নির্জনতায় ও মোহময় পরিবেশের মধ্যে জীবনটাকে বিশাল উদার আকাশের সাথে এক ক'রে দেখা এমন কত না দূরাগত মধুর চিত্র কবির কল্পনায় অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে চিরমধুরতায় নিবিড় হ'য়ে ধরা দিয়েছে। সমগ্র জীবনস্মৃতি

গ্রন্থটির এমনি সুমহান চিত্রের একখানা বিশাল এ্যালবাম। কেবল চিত্রের পর চিত্র, কেবল ছবির পর ছবি। এই চিত্র এই ছবি এরা প্রত্যেকেই সুদূর অতীতের এক একটি বিমল মুহূর্তকে নিবিড়ভাবে আপন বুকের মাঝে ধরে রেখেছে। শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাশয় জীবনস্মৃতি সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে তাই সত্যই বলেছেন: "মানুষের জীবনের সকল প্রকারের স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব একটি চিত্ররস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না।" বস্তুতঃ জীবনস্মৃতি আত্মজীবনী নয়, আত্মপরিচয়ও নয়—ইহা স্মৃতিরই চিত্র। আর স্মৃতি-চিত্র যদি আত্ম-পরিচয়ের অন্তর্গত হয় তা'হলে গ্রন্থখানি আত্মপরিচয়ের অংশ মাত্র।

॥ দুই ॥

॥ জীবন স্মৃতিতে আত্মজীবনীর অংশ ॥

জীবনী অপেক্ষা আত্মজীবনী লেখা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কেননা জীবনী লেখক আপন চোখে অপরকে বিচার করেন সেখানে আপনাকে অযথা বেশী প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আত্মজীবনী লেখকের পক্ষে এই বাধাটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুরতিক্রমা। আত্মজীবনী লিখতে গেলেই আপন মনের অগোচরে আপনার কথা এত বেশী এসে ভীড় জমায় যে আত্মপ্রতারণা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। নিজের প্রতি অবিচার না হ'য়ে পারে না। পদে পদে অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে লেখার স্বচ্ছতাকে বর্ষার ঘোলা জলের মত আবিল ক'রে তোলে। তার সম্ভ্রম এবং শুভ্রতা নষ্ট হয়। অহং বোধ ভূলে আপনাকে অপরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে ঠিক অপরের মত ক'রে না তুলতে পারলে ভাল আত্মজীবনী লেখা কোন ক্রমে সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজেকে পর ভাবা কঠিন—অনেকের পক্ষেই সাধ্যাতীত। তাই প্রথম শ্রেণীর আত্মপরিচয় জগতে এত বিরলদৃষ্ট। সুখের বিষয় 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেকে ভুলতে পেরেছেন। আপনাকে অচেনা জনারণ্যে দাঁড় করিয়ে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রেছেন। আপনার কথা কোথাও পল্লবিত ক'রে ব'লে ভাবসৌন্দর্য্য এবং গতিমাধুর্য্যকে ছায়াছন্ন ক'রে তোলেন নি। সর্বত্রই একটা প্রশান্ত উদার দৃষ্টির পরিচয় মেলে। আত্মবিশ্লেষণে বিশ্বকবি যে নিবিড় সংযম ও একান্ত নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা কেবল বঙ্গে নয় পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ-

শিল্পীর আত্মপরিচয়ে মেলা ভার। ভানুসিংহের পদাবলী, বাল্মীকি-প্রতিভা, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান প্রভৃতি কাব্যের আলোচনায় এবং মূল্য নির্ধারণে কবি অত্যন্ত কঠোর হ'য়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই সব কাব্যের স্বরূপ ও মূল্য নির্ধারিত হয় নাই। নিজেকে এমন ভাবে ভুলে কবি আত্মপরিচয় লেখার এক নতুন ধারার উৎসমূল খুলে দিয়েছেন।

জীবনস্মৃতি বিশালায়তন গ্রন্থ না হ'লেও নিছক স্বল্পায়তনেরও নয়। কিন্তু এই গ্রন্থের তিন চতুর্থাংশ হয়তো বা আরো বেশী জুড়েই র'য়েছে বাল্য-স্মৃতির মধুকোষ। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সমগ্র গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় উদ্দামবেগে প্রবাহিত হ'য়েছে শৈশব স্মৃতির এক অনন্ত প্রবাহ। কত বিচিত্র স্মৃতি-চিত্র-ই না আমরা জীবনস্মৃতিতে পেয়েছি। নর্মাল স্কুলে পাঠকালে 'Full of glee, Singing merrily, merrily, merrily' গানটিকে "কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং" এ পরিণত করার যে কথা কবি বর্ণনা ক'রেছেন তা আমাদের হৃদয়-বেলাভূমিকে হাস্যোচ্ছলতায় উদ্বেল করে তোলে। সত্যের নিকট হ'তে শোনা কথাটা নিয়ে পিতৃদেবের সাথে হিমালয় যাত্রার প্রাক্কালে ট্রেনে চড়ার যে একটা নিদারুণ নিষ্ফল আশঙ্কার কথা কবি প্রকাশ ক'রেছেন তা চিরদিন মনে রাখার মত। পরিণত বয়সে জীবনস্মৃতি লেখার সময় বাড়ীর পাঞ্জাবী চাকর লেন্থু এবং আতর বিক্রীওয়ালা বিরাটকায় য়িহুদী গাব্রিয়েলকেও কবি ভুলতে পারেন নি। ছোটখাট এমনি কত কি জিনিষ তাঁর কল্পনায় ভীড় করে এসেছে। "সেই বাড়ীর ধারের বাগান, পুকুর ও বটগাছ দেখিয়াই কতদিন তাঁহার আনন্দে কাটিয়াছে। মধ্যাহ্ন আকাশের খরদীপ্তি ও তাহার স্তব্ধতার মধ্যে চিলের তীক্ষ্ণকণ্ঠ ও ফেরিওয়ালার করুণ হাঁক উন্মাদ করিয়া দিয়াছে। সেই নারিকেল তরুশ্রেণী, লেবুগাছ ও অন্যান্য দু' একটা তরুবিশিষ্ট বাড়ীর ভিতরের বাগানটিই মানবের আদিম স্বর্ণকাননের মত ছিল, শরতের শিশির স্নাত সোনালী প্রত্যূষে সেইখানেই কত আনন্দে, কত বিস্ময়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছে।" "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ"-এর 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'র পিছনে যে এক সুমহান দৃশ্য বিরাজমান, যে এক অপূর্ব সোনালী প্রভাত তার সমুদয় রূপরাশিকে একত্রিত ক'রে শত বরণের লাবণ্য কবির সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল সেই স্মৃতি কবি কী অদ্ভুত ভাবেই না বর্ণনা ক'রেছেন। ছেলেবেলার সেই সকল স্মৃতি মন্থর মদির বিহ্বলতায় আমাদের সমগ্র অন্তরকে আবেশ-বিধুর ক'রে তোলে।

কিন্তু এই সকল স্মৃতিচারণার মধ্য থেকে কবি শৈশবের সেই 'সুকুমার আমি'র স্বরূপটিকে কি আশ্চর্য্য সুন্দররূপেই না প্রকাশ ক'রেছেন !

আপন ভোলা স্মৃতিচারণার সাথে আত্মপরিচয় দেওয়া ছাড়াও জীবনস্মৃতির একটি মূল্যবান সম্পদ এর ভাষা। স্মৃতি যত উজ্জ্বল এবং যত মধুরই হোক না কেন উপযুক্ত ভাবে যদি তার প্রকাশ না ঘটে তা হ'লে পাঠক-সমাজে তার বিশেষ মূল্য থাকে না। জীবনস্মৃতির স্মৃতিগুলি যেমন সরল সুললিত, প্রকাশ ভঙ্গীর মহিমায় তেমনি সুন্দর। স্মৃতির সাথে ভাষার ঝংকার যেন অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। বৈচিত্র্যময় অননুকরণীয় গদ্যরীতিতে সমগ্র জীবনস্মৃতি খানি যেন একটি প্রাণমাতানো গল্পের মত একান্ত উপভোগ্য সরস এবং প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। দূরাগত স্মৃতির সাথে ভাষাও যেন উধাও হ'য়ে গেছে কোন এক মহান অতীতে। প্রকাশ ভঙ্গীর চাতুর্য্যে এবং শিল্প-বৈচিত্র্যময় লিপিকুশলতায় পাঠক যেন শুনতে পায় অতীত রূপ-কথার রহস্যভবনের ব্যঞ্জনায়িত ধ্বনি, দূর—দূরান্তের স্বপ্নালোক নিবাসী নিবিড় কলগুঞ্জনের পদসঞ্চার। আশুতোষ চৌধুরীর নিকটে যে গল্পের হাওয়া পেতেন সে সম্পর্কে কবি বলেছেন, "সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানাফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।"

ঘন নিশীথে শ্রাবণের আকাশ ঘিরে বাদল মেঘমালার বরষণ মুখর স্মৃতির কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন, "আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি। ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ছমছম শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জাগাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপ ও আর জাগিয়া নাই।"

শরৎ ঋতু কবির স্মৃতিতে যে ভাবে জমা আছে তা এই: "তখন শরৎ-ঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে ঝলমল করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া পুনঃ পুনঃ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি।" এই ভাষা এই প্রকাশ আমাদের

অন্তরে যেন বলপূর্বক একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র জোর ক'রে এঁকে দিয়ে চলে যায়। স্মৃতি যেন সরস ও জীবন্ত হ'য়ে আমাদের সম্মুখে ধরা দেয়। জীবনস্মৃতির গদ্যরীতি ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনি-সমৃদ্ধ নয় কিন্তু বলিষ্ঠতা ও সজীবতা লক্ষণীয়। প্রতিটি স্মৃতিই যেন কল্পনা-ঐশ্বর্য্যে এবং বৈচিত্র্যময় প্রাচুর্য্যে একটি অখণ্ড লিরিকের মত পেলব-মসৃণতায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। সামাণ্য এবং অতি তুচ্ছ স্মৃতিকে অবলম্বন ক'রে কবি খেয়ালখুশীর এক চির সুন্দর মালা গেঁথেছেন। স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ অপরাজেয় এবং সুনিপুণ রূপদক্ষ।

তথাপি জীবনস্মৃতির গদ্যরীতিতে যে দুর্বলতা নেই তা নয়। মাঝে মাঝে প্রকাশ-রীতি অস্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে। শ্লেষ-বাগ-বৈদগ্ধ্য-গদ্যরীতিতে এবং বক্রোক্তির শাণিত কষাঘাতে জীবনস্মৃতির অনেকাংশ ম্লান হ'য়ে গেছে। এই সকল স্থানে স্মৃতির মাধুরিমা যে কিছু নষ্ট হয়নি—এমন কথা বলা যায় না।

॥ তিন ॥

॥ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা : বিশিষ্ট্য ব্যক্তির প্রভাব ॥

জীবনস্মৃতিতে ভ্রমণ বৃত্তান্তেরও কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার জন্য সরস এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। যা' দেখা যায় তার সবটা যেমন ভ্রমণ কাহিনীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয় তেমনি আবার অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যা সাধারণের দৃষ্টিতে তুচ্ছমাত্র তাকে আদরে গ্রহণ ক'রে বর্ণনার বিশালাংশে স্থাপন ক'রতে হয়। এই বর্জন এবং গ্রহণ রীতিই ভ্রমণকাহিনীর প্রাণসম্পদ। গ্রন্থের সকল সৌন্দর্য্য, সকল চারুত্ব, সকল অভিনবত্ব এই রীতি এবং প্রাঞ্জল প্রকাশ ভংগীর উপর নির্ভরশীল। জীবনস্মৃতিতে এই রীতি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। হিমালয় যাত্রা অংশে আমরা কবি কর্তৃক অঙ্কিত হিমালয়ের যে বিশালরূপের কল্পনা ক'রেছিলুম বলা বাহুল্য সেই বিশালত্বের কোন চিহ্নই এতে নেই, অথচ যা পেয়েছি তাতেই আমাদের চিরচঞ্চল গতিশীল মন শান্ত হয়ে গেছে। সেই শাল-বৃক্ষের বর্ণনা, সেই ছোট ছোট শিলাখণ্ড, বন্ধুর পথ অতিক্রান্ত ঝরণার সেই খলখল উচ্ছ্বাস সকল বর্ণনার ভিতর এমন একটি 'উচ্ছ্বাসময়-সংযম' আছে, চিত্রসমারোহে যা আমাদের অন্তরকে একেবারে লুঠ ক'রে নেয়।

নিখুঁত এবং প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় জীবনস্মৃতির কবি যে সিদ্ধ-হস্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন্থর-স্মৃতি চারণাই যেন একটি ভ্রমণ—শৈশব থেকে যৌবনের বনে দুর্গম যাত্রা।

স্মৃতি উদ্ঘাটন ছাড়াও জীবনস্মৃতির আর একটি দিক আছে। মাঝে মাঝে কবি যে সকল মনীষীর সংশ্রবে এসেছিলেন এবং যাঁদের প্রভাব আজীবন কাল তাঁর কবি-মানসে অম্লান হ'য়ে ছিল তাঁদের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা ক'রেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকণ্ঠ বাবু এবং কাদম্বিনী দেবী এই তিন জনের প্রভাব বোধ হয় তাঁর কৈশোর জীবনের উপর ছিল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং গভীর। নিস্তব্ধ নিশীথে জেগে ওঠে সুকুমার বালকের সমুদয় আবেগ একত্র ক'রে যে পরম বিস্ময়ের সাথে কবি পিতার ধ্যানগম্ভীর মৌনমূর্ত্তি দেখেছিলেন ভীতিবিহ্বল মনের বেলাভূমিতে তখন যে জ্যোতির্ময় মূর্ত্তির সুগভীর রেখাঙ্কন হ'য়েছিল আজীবন ভোর সেই ছবিকে কবি কত গানে, কত কবিতায়, কত গল্পে, কত উপন্যাসে, কত নাটককে, কত ভাবেই না বর্ণনা ক'রেছেন। শ্রীকণ্ঠ বাবু এমনি আর একটি লোক যাঁর প্রভাব রবীন্দ্র-জীবনে এক অক্ষয় সম্পদ। এই সদাহাস্যময় মানুষটি কবির অসংখ্য নাটক ও গল্পের দাদাঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন। শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার চক্রবর্তী মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এবং শ্রীকণ্ঠ চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য ক'রেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য: "এই চিত্র দুইটি কবির জীবনের, ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলেও অসংগত হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে—সেই জন্য ইহারা কবির কল্পনাকে কেবল স্পর্শমাত্র করিয়া বিদায় লয় নাই, খুব গভীর ভাবে আঘাত করিয়াছে। সমুদ্রের উপরি ভাগের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের সম্বন্ধের মত এই দুইটি চিত্রের পরস্পরের সম্বন্ধ। একটি চঞ্চল, অপরটি স্তব্ধ; একটি আত্মবিকল, অপরটি আত্মসমাহিত; একটি লীলাময়, অপরটি যোগময়; একটি সজন অপরটি নির্জন।"

কাদম্বিনী দেবীর প্রভাব বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের উৎসমূল। এই একটি মহিলা সমগ্র রবীন্দ্র-জীবনকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বিধুল ক'রে তুলেছেন। সেই সুদূর কৈশোরের প্রথম কবিতা উন্মেষের দিন হ'তে এই মহিলাটি আপন বুকের সমুদয় ভালবাসা দিয়ে কবির উৎসমূলকে প্রাণাবেগে ভরিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা ছিলেন এই মহিলা। ভালবাসায়, প্রেমে, স্নেহে তিনি রবীন্দ্রনাথকে রূপকুমার ক'রে রেখেছিলেন। তাই চব্বিশ বছর বয়সে

সেই নব যৌবনের প্রারম্ভে এই মহিলার মৃত্যু শোক কবির মর্মমূলে এমন গভীর হ'য়ে বেজেছিল। সমগ্র রবীন্দ্রস্মৃতিতে এই মহিলা তাই নির্মল শুকতারার মত চিরজ্যোতিষ্মান।

এছাড়াও কবির জীবনে যাঁরা অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন তাদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ, রাজেন্দ্রলাল, আশুতোষ চৌধুরী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রধান।

প্রকৃতির মুগ্ধময় রূপের বর্ণনা জীবনস্মৃতির আর একটি দিক। অতীত দিনের প্রতি অন্ধকার গলিপথে পদাচারণা ক'রতে ক'রতে যখনই কবির মন হাঁফিয়ে উঠেছে তখনই তিনি প্রকৃতির উদার নির্মল দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। নির্মল প্রভাত, অনাবৃত সন্ধ্যা, নীলাকাশের নিঃসীম বিস্তৃতি এবং সর্বোপরি পথে প্রান্তরের কত রূপ কবিকে কি নিবিড় ভাবেই না আকর্ষণ ক'রেছে। মাঝে মাঝে এই বর্ণনা এমন অন্তরস্পর্শী এবং রূপবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হ'য়েছে যে কবিতা-কুমারী যেন উর্বশীর মত জীবনস্মৃতির পাতায় পাতায় নৃত্যচপল ভঙ্গীতে অনিন্দ্যসুন্দর লাবণ্যের ফেরি ক'রে বেড়িয়েছে। জীবনস্মৃতি তাই কেবল প্রকৃতির উদ্‌ঘাটন নয়, কেবল আত্মপরিচয়ও নয়—কৈশোর জীবনের চিরচঞ্চল আশা আকাঙ্ক্ষার মোহময় চিত্ররূপ, মন্থর স্মৃতি চারণার চিরসুন্দর কাব্যিক রূপায়ণ।

॥ লিপিকা ॥

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা ঃ লিপিকার রচনার শ্রেণী বিভাগ ॥

পরমাশ্চর্য, মহাপুরুষ, ব্যতিক্রম, মহামানব, ক্ষণজন্মা, মহাকবি ইত্যাদি যতগুলি বাঁধাধরা তৈরী বিশেষণ আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপুরুষ ও কবি-মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্যে প্রয়োগ করি—সে সবের উৎসমূল হ'লো জীবন-কাব্যের মহাভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের দ্রুত পটভূমি পরিবর্ত্তন এবং প্রকাশ-ভংগীর লীলা-বৈচিত্র্য। সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনে কতবারই না তাঁর ধ্যান-কল্পনা গতি পরিবর্তন করে ভিন্নমুখী হ'য়েছে। (কখনো দেখি কবি-মানস মর্ত-প্রীতির নিটোল রসে সিক্ত, কখনো দেখি তা' নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যাকাঙ্খার অভিসারী; কখনে দেখি কবি-মন উড়ে চলেছে আধ্যাত্মিকতার রহস্য-ঘন স্বপ্নরাজ্যে, আবার কখনো বা দেখি সেই মন গতিবেগের আবর্তে স্পন্দমান।) ভাবের ঘরে যেমন এই মনন-নিষ্ঠ দুর্লভ-সুন্দরের চলেছে লীলা-খেলা তেমনি তার প্রকাশ ঘটেছে বহুবিচিত্র আঙ্গিক-সুষমায়। ভাবের সাথে সমতা রেখে প্রকাশ ভংগিমায় কখনো এসেছে মনোহর ঋজুতা, কখনো বা এসেছে বিদ্যুত-দীপ্ত ছন্দের আন্দোলন; কখনো বা দেখি বিরল-দৃষ্ট ছন্দের রূপ-ঐশ্বর্য্য, কখনো বা দেখি ব্যাঞ্জনগর্ভ গদ্যছন্দের অপূর্ব প্রবর্তনা। ভাব এবং প্রকাশ ভংগিমার এই নিত্য নূতন দিক পরিবর্তন রবীন্দ্র-কাব্যকে এক অপূর্ব-সৌন্দর্য এবং বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

(ভাব এবং আঙ্গিকের বিবিধ বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ দেখি লিপিকা গ্রন্থে। রূপ এবং অরূপ এখানে এক হ'য়ে মিশেছে। গদ্য এবং কবিতা যেন একই মহা সঙ্গম-তীর্থের যাত্রী।) সবার মিলনে বেজে উঠেছে এক নিবিড় ঐকতান। কখন নিপুণতায় কাহিনী প্রবেশ করেছে কাব্যের রূপলোকে, আর কাব্য-নন্দিনী কলা-বিলাসীর মত উছল ভংগীতে নেচে নেচে চলে গেছে কাহিনীর অন্দর-মহলে। (গল্প ছুটেছে রূপকথার সীমাহীন দিগন্তে আর রূপকথা আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নেমে এসেছে মর্তের রসলোকে।) এমনি করে সবার থেকে দেনাপাওনার সম্বন্ধ ঘুঁচে গিয়ে স্থাপিত হ'য়েছে এক প্রীতির সম্পর্ক। ভাব ও আঙ্গিকের

বহু বিচিত্র রূপের মাঝে দূরাগত ব্যবধান কী অদ্ভুত ভাবেই না মিলিয়ে গেছে! লিপিকা গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এখানেই।

(সাহিত্যিক-রূপ বিচারের দিক থেকে লিপিকাকে) যে ঠিক কোন গোত্রে একীভূত করা যায় তা' বলা কঠিন। আমাদের মনে হয় (কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করে ~~লিপিকার রচনাগুলিকে~~ বিচার করা যায় না। এ রচনাগুলি এমনি যে, কোন গণ্ডীর সীমানায় সীমিত করতে গেলেই এদের সমুদয় সৌন্দর্য ও সম্ভ্রম সহজেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়। সামান্য আঘাতেই এরা লজ্জাবতী লতার মত) অবগুণ্ঠনের অন্তরালে স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিলুপ্ত করে (ম্রিয়মান হ'য়ে পড়ে। রচনাগুলি তাই গণ্ডীর অতীত, সীমাহারা।) কোন জাত-কুলের পরিচয়ে এদের পরিচয় নেই—এরা জাত-কুলের অতীত এক স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতীক।

(তবুও একান্ত ভাবে যদি লিপিকার রচনাগুলির গোত্র এবং কুল নির্ণয় করতেই হয় তা' হ'লে রূপ-বিচারে এদের মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: ছোট গল্প, নিবন্ধ সাহিত্য, গদ্য কাব্য এবং রূপক রচনা।) এই চার শ্রেণীর রচনার প্রত্যেকটির সাক্ষাৎ মেলে লিপিকায়। তবে একমাত্র রূপক-রচনা ছাড়া কোন শ্রেণীর রচনা রূপ-বিচারের দিক থেকে পরিপূর্ণ রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে নি। (কোনটা অঙ্কুর, কোনটা কিশলয়, কোনটা বা পাতাঝরা বৃক্ষ—কেবল রূপক রচনাই পত্র সুশোভিত বৃক্ষের মত শ্যাম-শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে রসের গণ্ডীতে করেছে পদসঞ্চার।) নিম্নের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার আলোচনা হ'তে এ কথা প্রমাণীত হ'বে।

॥ দুই ॥

॥ ছোট গল্প ॥

ছোটগল্প অখণ্ড চলমান মানব-জীবনের কোন বিশেষ খণ্ডতার মধ্য হ'তে জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ ক্ষণমুহূর্ত হ'তে বেগ নিয়ে সে আপন চকিত-দীপ্ত পরিণতির প্রান্তে এগিয়ে যায়। উপন্যাসের মত ছোটগল্প রস-মন্থর নয়—এর রস অমানিশার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চকিত বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত আপন ঔজ্জ্বল্যে হঠাৎ ঝলকিত হ'য়ে ওঠে। বিশেষ মুহূর্তে মানব-মনের বিশেষ রূপ যেন ছোটগল্পের মধ্য হ'তে কথা কয়ে যায়। বর্ণনা অপেক্ষা মননপ্রধান আলাপ-চারণায় কল্পনার স্বর্ণ-মস্‌লিন বয়ন করাই ছোটগল্পের লক্ষ্য। এই মানদণ্ডে

বিচার করলে লিপিকার গল্পমূলক রচনা গুলিকে ঠিক পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ছোটগল্পের মধ্যে যে চকিত দীপ্তি থাকে, যে নিটোল অঙ্গ-সজ্জা এবং ঘটনা পরিবেশনের ঠাস বুননী থাকে এই রচনাগুলির মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব বিদৃষ্ট হয়। রচনাগুলির বর্ণনা নিটুট নয়—এলায়িত। চকিত-দীপ্তিতে পাঠক মনকে উদ্বেল করে তোলা অপেক্ষা রস-মন্থর গতি-চারণার মাধ্যেমে ক্রম-পরিবেশনেই গল্পগুলির মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও লিপিকার কতকগুলি রচনার মধ্যে যে ছোটগল্পের ঝংকার শোনা গিয়াছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে সুয়োরাণীর সাধ, বিদূষক, অস্পষ্ট, পট, নতুন, পুতুল, পুনরাবৃত্তি, রথযাত্রা, ইত্যাদি প্রধান।

'সুয়োরাণীর সাধ'এ রূপকথার প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও রচনাটির মধ্যে ছোট গল্পের একটি সুন্দর আমেজ আছে। বন্ধন-হীন সুখবিভোগের মধ্যে যে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না তা' সুয়োরাণী মনে মনে উপলব্ধি করেছে। শত ব্যথা-বেদনা, শত আঘাত-অভিঘাতের মাঝেও দুয়োরাণী আপন প্রাণ-ঐশ্বর্যে, অন্তরের অনন্ত-আনন্দ-প্লাবনে নির্ঝরের মত বেগবান। দুখের দাহনে তার নিখিল অন্তর ব্যাপী কী বিপুল শান্তি! যে দুয়োরাণীর প্রতি ঈর্ষায় একদিন সুয়োরাণী তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মাঝে বনান্তরের পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য করেছিল আজ আত্ম-পীড়নে সেই সুয়োরাণী একে একে নিজের সমুদয় সুখ-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় দুয়োরাণীর সেই বেদনা-বিধুরতার পথেই পা বাড়াল। রচনাটির পরিণতিতে নাটকীয় ভংগীর সাথে ছোট গল্পের একটি সুন্দর সুর ধরা পড়েছে।

ছোটগল্পের সার্থক উদাহরণ 'পুনরাবৃত্তি' রচনাটি। 'রামসীতার বনবাস' খেল্‌তে খেল্‌তে অবশেষে রুচিরা এবং কৌশিকের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠলো—মাঝে রাজার হস্তক্ষেপ। গল্পের পরিণতিতে রাজ-অন্তরের যে নিগূঢ় বার্তাটি আমাদের কাছে এসে পৌছল তা' যেন সমগ্র রচনাটিকে গল্পের যাদু-স্পর্শে অনবদ্য ও সজীব করে তুলেছে।

প্রথম চিঠি, নামের খেলা, রথযাত্রা, নতুন পুতুল ইত্যাদি রচনাগুলির মধ্যেও ছোটগল্পের আমেজ মিশে আছে। এদের মধ্যে আবার কতকগুলি রচনা বর্ণনার পারিপাট্যে এবং ঘটনার সন্নিবেশে প্রায় ছোট-গল্পের সীমা অতিক্রম করে গল্পের সার্থক রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। লিপিকার রচনাগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাই সত্যই বলেছেন: "এইগুলি

নূতন রীতিতে লেখা গল্পের রেখাচিত্র; মনের ভাবনার নিরাভরণ আল্পনা যেন!" 'নামের খেলা' এই সংক্ষিপ্ত রচনাটিকে আমরা ছোটগল্প ছাড়া অন্য কিছু বলে কল্পনাই করতে পারিনে। 'প্রথম চিঠির' মধ্যে নব-প্রণয়ের আবেগ চিত্র-গরিমায় দুর্লভ-সুন্দর। সিদ্ধি, রথযাত্রা, পাট, ইত্যাদি রচনা-গুলিতে কাব্যিক মনোহারিত্ব অপেক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের পলায়ণপর মুহূর্ত্ত-গুলি নিবিড় কল-গুঞ্জনে অনবদ্য-সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাই লিপিকার অনেকগুলি রচনার মধ্যে কবি যে গল্প বলতে চেয়েছেন তা' অনস্বীকার্য।

॥ তিন ॥

॥ নিবন্ধ সাহিত্য ॥

হাল্কা চাল ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে সুকর্ষিত গদ্যরীতির পরিবেশনে যে ভাব ব্যক্ত করা যায় তাই নিবন্ধ সাহিত্য। এ জাতীয় রচনার রস মনন-প্রধান। কাব্যবিলাসীর কল্পনা-সমৃদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে লেখকের মন এখানে বিশেষ রূপে সংঘর্ষ-সচেতন হ'য়ে ওঠে। তীক্ষ্ণাগ্র বাণী-বিন্যাসে কোন একটি বিশেষ তথ্যের অথবা ভাবের মূল-ব্যক্ত করাই এ সব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই অনিবার্য কারণে এসব রচনার মধ্যে লেখকের মন তথ্য অথবা বস্তু-নিষ্ঠার অভিসারী হয়। বলা বাহুল্য লিপিকার রচনাগুলি যদিও কাব্য-ধর্মী, ~~যদিও প্রত্যেকটি রচনার মধ্য হ'তে~~ কল্পনা-দ্যুতি ঝলকিত, ~~হ'য়ে উঠেছে~~ তথাপি কতকগুলি রচনার মধ্যে নিবন্ধ সাহিত্যের গুণ বর্তমান— প্রাণমন, কর্তার ভূত, আগমনী ইত্যাদি রচনাগুলি এই জাতীয়। বলাবাহুল্য এই রচনাগুলির মধ্যে নিবন্ধ সাহিত্যের আমেজ থাকলেও এরা খাঁটি নিবন্ধ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। 'মেঘদূত' নিয়ে কবি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'ও 'মেঘদূত'-এর কলকণ্ঠ শুনতে পাই কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত এবং লিপিকার মেঘদূত এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে দুরতিক্রমী ব্যবধান রচিত হ'য়েছে। কবিতার সুরে উভয় প্রবন্ধের সুর বাঁধা—কিন্তু তবুও প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত একটি মনন-নিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ করুণসুন্দর প্রবন্ধ। কবি পরমাশ্চর্য কল্পনা-বিহারে যে তথ্যের উদ্ঘাটন করেছেন তা' আমাদের চিত্তকে রস-পূর করে তোলে। কল্পনার কাব্যিক ঐশ্বর্য থাকলেও এ প্রবন্ধের বক্তব্য-তথ্য একেবারে কাব্যের রহস্যময়ী নায়িকা হয়ে ওঠেনি। আপন স্বরূপে

দেদীপ্যমান। কিন্তু লিপিকার 'মেঘদূতে'র মধ্যে তথ্যের স্পর্শ আছে তবে নিবিড়তা নেই। প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত-এ প্রকাশ মহিমায় যে ভাব জমাট বেঁধে উঠেছে 'লিপিকার' 'মেঘদূত'-এ সেই ভাবের স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও কাব্যের দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে তা' ফেনিল হয়ে উঠেছে। তথ্যের জমাটত্ব কল্পনার বেগবান স্রোতে ভেসে কোথায় মিলিয়ে গেছে। বিরহের অবসানের জন্যে কবির প্রার্থনা এই: "সেই আকাশ-পৃথিবীর বিরহমন্ত্র-গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বাচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীনার তারের মতো চকিত হ'য়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর-বনান্তের রংটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত্ত হ'য়ে উঠুক।" এই কাব্যিক প্রকাশ ভংগীতে তথ্য খণ্ড খণ্ড হ'য়ে আপন গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্যকে হারিয়েছে। নিবন্ধ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ যে বস্তুনিষ্ঠা তা' লিপিকার রচনায় বিরল। কিন্তু খাঁটি নিবন্ধ না থাকলেও কয়েকটি রচনা যে 'প্রায় নিবন্ধ' হয়ে উঠেছে, নিবন্ধ সাহিত্যের অনেকগুলি গুণ যে সে সব রচনার মধ্যে বর্তমান তা' কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। মনে হয় 'গল্প' রচনাটি লিপিকার নিবন্ধ মূলক রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

॥ চার ।

॥ গদ্য-কাব্য ॥

লিপিকা গদ্যের লেখা। পরিবেশনও গদ্য-গ্রন্থের মত। তাই লিপিকার রচনাকে গদ্য কাব্য বলতে প্রথম দৃষ্টিতেই আমাদের মন সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। অতি সহজেই মনের গহণ হ'তে একটি 'না' উৎসারিত হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই 'না'-র পিছনে আবাল্য-অর্জ্জিত একটি সংস্কার আছে মাত্র—কোন বিচার নেই। প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করে লিপিকার সাথে আত্মিক যোগ সংস্থাপনের পর বিচারের কষ্টি পাথরে ফেলে যদি রচনাগুলির স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করি তা' হলে এই গ্রন্থের বহু রচনাকে গদ্য-কাব্য বলতে আমাদের মন সহজেই স্বীকৃতি দান করবে। বাস্তবিক লিপিকা গ্রন্থের পেলব মসৃণ বেলাভূমির উপর দিয়ে প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত গদ্য-কাব্যের একটি অখণ্ড ধারা আপন আবেগে প্রবাহিত হ'য়েছে। তার গতি অপ্রতিহত, মধুর-নাদী এবং বেগবান। সে গতির কুলকুলধ্বনির

সাথে কাব্য-লক্ষ্মী যেন সকলের অলক্ষ্যে নৃত্য-চপল ভংগীতে আপন পায়ের নূপুর বাজিয়ে চলেছে। তাই লিপিকা পাঠ-কালে আমাদের নিখিল মন-প্রাণ কবিতার অমৃত-রসে সিক্ত হ'য়ে ওঠে।) কবিতার মাদক-রসের আস্বাদনে আমাদের কাব্য-পাঠ নেশা দুর্বার হ'য়ে ওঠে। ('মেঘদূতে'র সর্বশেষ অংশে কবি লিখ্‌ছেন: "যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থর্‌থর্‌ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধেভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথ রাত্রে।" কিংবা: "সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশির্বাদ করে চলে যাক।" এ অংশকে কবিতা বল্‌তে অস্বীকার করবে কে? গদ্য কবিতার রহস্য-লোকে প্রবেশ করে কী অপূর্ব শ্রী-লাবণ্য ধারণ করেছে!)

লিপিকার লেখাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় লিখেছেন—"গীতা-ঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করে ছিলুম। এই অনুবাদ কাব্য-শ্রেণীতে গণ্য হ'য়েছে, সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরাজীরই মত বাংলায় গদ্য কবিতার রস দেওয়া যায় কীনা। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি—লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে গদ্যের মত খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"

গদ্যকাব্যের সুস্পষ্ট রেখাঙ্কন যে রচনা গুলির মধ্যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে তা'দের মধ্যে পায়ে চলা পথ, মেঘলা দিন, বাঁশি, সন্ধ্যা ও প্রভাত, প্রশ্ন, একটি চাউনি, প্রথম শোক, একটি দিন ইত্যাদি প্রধান। এই সব রচনা-গুলির মধ্যে এক একটি ক্ষণ-অনুভূতি, এক একটি আবেগ-বিহ্বল অনুপল এক একটি পলায়ন পর মুহূর্ত কি অপরূপ ভাবেই না বিধৃত হ'য়েছে। এই স্বপ্ন-মন্থর অনুভূতিকে নিয়ে কবি কল্পনার কোরক দিয়ে এক দোসর-হীন অনন্য-সুন্দর মালা গেঁথে তুলেছেন। গদ্য এবং কবিতার রৌদ্র-ছায়ালোকে রচনাগুলি কী অপূর্ব সৌকুমার্য ও সম্ভ্রম-মণ্ডিত হ'য়েছে! 'পায়ে চলা পথ'-এ কবি লিখেছেন: "ওগো পায়ে চলা পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা সে সব গেল কোথায়। বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।"

অন্তরের ধ্যান কল্পনায়, বাসনা-কামনায় কী অপূর্ব ব্যঞ্জনগর্ভ প্রকাশ! এখানে তার্কিক মনের সমুদয় তর্ক, সমুদয় হিসাব-নিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। এ গদ্যকে আমরা কবিতা না বলে পারি না।

(রবীন্দ্রনাথ গদ্য এবং কবিতার মধ্যে কোন দিন একটি দুরতিক্রমী ব্যবধান রচনা করেন নি, উভয়ের মধ্যে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধকে মানেন নি। গদ্যকে কবিতার রহস্যালোকে এবং কবিতাকে কাহিনীর বাস্তব-আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সকল ব্যবধান, সকল সংকোচকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন।) 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র একাংশে কবি বলেছেন: "এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হ'ল। অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্ছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা। জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা।"

এখানে গদ্য কাব্যের রহস্যঘেরা সরোবরের নীল জলের বুকে ফুটে ওঠা পদ্ম-কোরক। এখানে কবিতার সুকোমল বুকে গদ্যের হ'য়েছে লাবণ্য-বিধুর ভীরু-নম্র পদসঞ্চার।

লিপিকার অনেকগুলি রচনার মধ্যে গদ্য-কাব্যের এই অপূর্ব ঝংকার শোনা যায়। অনেকগুলি রচনা কল্পনার মোহজালে রোমাঞ্চ-রঙীন হ'য়ে উঠেছে। (বর্ণালীর সুশোভন সঙ্গতিতে প্রতি চরণ বর্ণ-গরিমায় দুষ্প্রাপ্যমনোহর। তাই লিপিকার কতকগুলি রচনাকে গদ্যকাব্য বল্‌তে আমাদের কোনই বাধা নেই।)

॥ পাঁচ ॥

॥ রূপক রচনা ॥

(লিপিকার অনেকগুলি রচনার মধ্যে রূপকথার আমেজ আছে—কিন্তু রচনা-গুলি ঠিক রূপকথার অনুসারী হয়ে কল্পলোকে উধাও হয়ে যায় নি। বাস্তব-মৃত্তিকায় শিকড় গেড়ে তারা 'বাস্তবানুগ-রূপকথায়' পরিণত হয়েছে।) 'সুয়োরাণীর সাধ' গল্পটির নামের মধ্যে রূপকথার একটি নিগূঢ় যোগ আছে—অন্ততঃ এই নামটি শুন্‌লেই আমাদের মানসলোকে রূপকথার অন্ত-হীন জগতের বর্ণ-সমুজ্জ্বল কতকগুলি ছবি হঠাৎ ঝলকিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু লিপিকায় কবি সুয়োরাণীর সাথে কেবল মাত্র নামের স্পর্শ ছাড়া কোথাও

রূপকথার এতটুকু সংযোগ রাখেন নি। এই নামের আড়ালে উদ্ঘাটন করেছেন চিরন্তন সত্যের এক অপূর্ব রূপ। 'পরীর পরিচয়' গল্পটিও এই পর্যায়ের। এই গল্পে পরী আছে এবং রাজপুতও আছে, ঝরণারও অভাব নেই—মোটকথা একটি রূপকথায় যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয় তাদের কোনটিরও অভাব নেই কিন্তু তথাপি গল্পটি রূপকথা নয়। গল্পটিতে স্থান পেয়েছে আবেগ-ব্যাকুল অশান্ত মানব-মনের এক চূড়ান্ত পরিণতি। এমনি আরো কতকগুলি রচনার মধ্যে আমরা 'রূপকথা'র ছায়াপাত দেখি—কিন্তু সেগুলি একটিও সঠিক রূপকথার পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

(লিপিকায় আর এক শ্রেণীর রচনা স্থান পেয়েছে—যে গুলি রূপকধর্মী। এ পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো ঘোড়া, তোতা-কাহিনী, প্রাণমন, আগমণী, পায়ে চলা পথ, সতের বছর ইত্যাদি। এ সব প্রত্যেক রচনাতেই কবি রূপকের অন্তরালে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। কোন কোন রচনায় উদ্ঘাটিত হ'য়েছে তত্ত্ব কথা, কোন কোন রচনায় বা প্রকাশ পেয়েছে শাশ্বত সত্যের অনবদ্য রূপ। ('পায়ে চলা পথ' আমাদের পার্থিব জীবনের রূপক, 'তোতা কাহিনী' ইংরাজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তীব্র-কশাঘাত।) এমনি প্রত্যেকটি রূপক রচনার মধ্যে কবি রূপকের অন্তরালে কোন কোন নিগূঢ় বিষয়ের অবতারণা করেছেন।) রূপক রচনা হিসেবে লিপিকার অনেকগুলি রচনা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

(কিন্তু কী ছোটগল্প, কী নিবন্ধ সাহিত্য, কী গদ্যকাব্য কী রূপক রচনা—সবার অন্তরালে কবি-মানসের একটি বিশেষ প্রবণতা প্রকাশিত হ'য়েছে।) সকল প্রকার রচনার মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে কবি-মানসের রূপের ব্যাকুলতা। (প্রত্যেকটি রচনা রূপ-দক্ষ-রবীন্দ্র-মানসের রূপ-স্পর্শে হয়ে উঠেছে তুলনা-বিরল অনন্য-সুন্দর। এ-রূপ কোন মানদণ্ড দিয়ে মাপা যায় না,—এ-রূপ একান্তভাবে অনুভবের জিনিষ, একান্তভাবে হৃদয়ের সামগ্রী। এ-রূপ হৃদয়াবেগে রোমাঞ্চ-রঙীন, সায়াহ্ন-কোমলতায় মলিন-সুন্দর। রূপের এই অপূর্ব প্রবর্তনা আছে বলেই লিপিকার রচনাগুলি পাঠক মনকে এমন ভাবে, ভাবোদ্বেল করে তোলে।) ছোটগল্প হিসাবে আমরা মাত্র কয়েকটি রচনাকে স্থান দিতে পারি, নিবন্ধ সাহিত্য হিসেবেও মাত্র কয়েকটি রচনার উল্লেখ আমাদের পক্ষে সম্ভব, গদ্য-কাব্য রচনার পর্যায়েও আমরা লিপিকার সকল রচনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনে—কিন্তু রূপের প্রকাশ হিসেবে প্রত্যেকটি রচনা রূপের চরণে নতশির হয়েছে। সবার মর্মমূল হ'তে রূপ তার আপন-আভায় প্রকাশমান। (রূপ-প্রকাশ হিসেবে লিপিকার প্রত্যেকটি রচনা সার্থক। তাই মনে হয় লিপিকা রূপেরই দোসর—তার সমগ্র অন্তর ব্যাপী ধ্বনিত হয়েছে রূপ-ব্যাকুলতার ভাব-কোমল ছন্দিত-আন্দোলন!)

॥ প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

॥ এক ॥

॥ প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের স্বরূপ ॥

বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ একজন নির্জন প্রান্তের নির্বাক অধিবাসী। তাঁর রচনাবলী সরব কণ্ঠের দীপ্ত ঘোষণায় বাঙ্ময় নয়—রূপমুগ্ধ শিল্পী মনের লাবণ্য-বিন্যাসে নম্র-মনোহর, প্রতিটি প্রবন্ধের অন্তরাল হ'তে রূপ-তন্ময় লিরিকের সুকোমল সুর আপন আভায় গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মৌলিক সৃষ্টি-ধর্মী। নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে প্রতিটি প্রবন্ধ হীরকোজ্জ্বল। কথার পর কথা সাজিয়ে, শব্দের পিঠে শব্দ যোজনা করে অবিরাম ক্লান্তিকর প্রচেষ্টায় তিনি প্রবন্ধ লেখেননি—সৃষ্টির আবেগে জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত তাঁর প্রবন্ধ আপনি উৎসারিত। সৃষ্টির যে লীলা-প্রবাহ তিনি আপন প্রাণ-মূলে অনুভব করেছেন তাই তাঁর প্রবন্ধের মূলীভূত শক্তি। সমকালীন প্রবন্ধ লেখক প্রথম চৌধুরীর রচনায় একটি ক্লান্তিকর প্রচেষ্টার পরিচয় জড়িয়ে আছে। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে বক্তব্য অপেক্ষা বলার রীতিই উচ্চশির হ'য়ে উঠেছে। তাঁর সকল প্রচেষ্টা যেন প্রকাশ-ভংগীর চাকচিক্য গঠনের মধ্যে সীমিত। প্রাণ নয় ভংগী, বক্তব্য নয় বলাই প্রথম চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনা বহিরাবরণের চাকচিক্যে নয়ন ধাঁধায়—গহন মনে দোল জাগাতে পারে না। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনা মর্মস্পর্শী। বক্তব্য এবং বলা দুই-ই তাঁর রচনায় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে অদ্বৈত সম্পর্কযুক্ত। প্রাণ এবং ভংগী দুই-ই উচ্চ-শির। বিষয় এবং রীতি গভীর আলিঙ্গনে একই সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। বলেন্দ্রনাথের রচনায় রূপদ্রষ্টা এবং রূপশিল্পী এক হ'য়ে মিশেছে। Style is the man বলে ইংরাজীতে যে বহু খ্যাত উক্তিটি প্রচলিত—বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তা' সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বিষয় এবং ভংগীর রাসায়নিক সংমিশ্রনে যে দুর্লভ রীতি গড়ে উঠেছে তা' বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মাত্র উনত্রিশ বছরের (জন্ম ৬ই নভেম্বর, ১৮৭০ এবং মৃত্যু ২০শে আগষ্ট, ১৮৯৯) জীবনে স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট্য স্টাইলের অধিকারী হয়েছিলেন তা' বিস্ময়কর। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "গ্রন্থাবলী"র ভূমিকায় তাই যথার্থই মন্তব্য

করেছেন "বয়সের বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ত্বের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষের দিকের রচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।" বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথ একজন 'আজন্ম রচনা-রসিক (Stylist)'।

চিন্তায়, ভাবনায় এবং প্রকাশের অভিনবত্বে বলেন্দ্রনাথের রচনা প্রায় কবিতার প্রান্ত-স্পর্শী। এখানেও বলেন্দ্রনাথের রীতি বিশেষ রূপে লক্ষ্যণীয়। তিনি ভাবের আবেগে কোথাও ভেসে যাননি। আপনার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। তাই কূল-প্লাবী ভাব-বন্যাকে তিনি সুকঠিন তটে আবদ্ধ করে দূর মোহনার পথে সঞ্চারমান করে দিয়েছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বিন্যাস ভংগীর সাথে বলেন্দ্রনাথের রচনা-রীতির একটি স্পষ্ট ভেদ রেখা গড়ে উঠেছে। ভাবের উদ্দাম প্রবাহে এবং কল্পনার দিগন্তহীন বিপুলতায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-বিষয় অনেক স্থলে ফেনিল এবং এলায়িত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বলেন্দ্র-নাথের সমগ্র রচনা এই অতিব্যাপ্তি দোষ হ'তে মুক্ত। তাঁর রচনায় কল্পনা আছে, বেগ আছে কিন্তু সে কল্পনা-বেগ কোন ক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তট অতিক্রম করেনি। প্রয়োজনীয় দিগন্তের ঝিলিমিলিতে আবদ্ধ হ'য়ে তা' অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বলেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পী কিংবা বিশ্বকবির রচনা-রীতির কোন প্রভাব বলেন্দ্র-নাথের ওপর পড়েনি সে কথা আমরা বল্‌ছিনা—বরং প্রথম বয়সের রচনা রবি-রাহু-গ্রস্থ—তথাপি বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে পিতৃব্য অপেক্ষা অধিকতর সংযত-বাক শিল্পী। সামঞ্জস্যবোধ এবং সংযম-চিত্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁকে দুর্লভ উচ্চাসন দান করেছে।

॥ দুই ॥

॥ বলেন্দ্র-প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ ও আলোচনা ॥

বলেন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্য সৃষ্টিকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ক ॥ প্রাচীন শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা খ ॥ প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা গ ॥ প্রাচীন ভাস্কর্য আলোচনা বা ঐতিহাসিক-স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ ঘ ॥ সামাজিক প্রবন্ধ ঙ ॥ ব্যাক্তিগত প্রবন্ধ চ ॥ আচার আচরণ ও ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত আলোচনা হ'তে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথেয় বলিষ্ঠ মনোভংগীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক ॥ প্রাচীন শিল্পালোচনা ঃ

প্রথমেই প্রাচীন শিল্প এবং সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধরাজীর আলোচনা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন "শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।" কিন্তু আমাদের মনে হয় ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিই প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের শক্তি-সামর্থ্যের প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছে। "রস রেখার বর্ণাঢ্যতা, সুচিক্কণ কাব্যধর্মী বাণী-বিন্যাস ও সৌন্দর্য-চেতনা" যে গুলি প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের মূল বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সেগুলির বন্ধনহীন আনন্দ-দীপ্ত প্রকাশ। প্রাচীন শিল্প সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলি যে জন্যে ভাল লাগে তা' হলো তাদের অনন্য চিত্র সম্পদ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে লেখক যেখানেই চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করেছেন সেখানেই তাঁর লেখা হ'য়ে উঠেছে লিরিক ধর্মী—সমালোচনা নয়, নতুন সৃষ্টির কাজেই তিনি মেতে উঠেছেন সেখানে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস কল্পনা-বিলাসী বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে —যদিও প্রাচীন সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলির রূপ-সৌন্দর্য কোন ক্রমেই উপেক্ষনীয় নয়।

প্রাচীন চিত্র-শিল্পের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। বিদগ্ধজন বিতর্কের অবকাশ না রেখেই স্বীকার করেছেন যে ইতিপূর্বে এই ধরণের চিত্রালোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়নি। রূপ-মুগ্ধ শিল্পী বলেন্দ্রনাথের হাতেই চিত্র-শিল্পের সর্বপ্রথম সার্থক সমালোচনা। ললিতকলা বিষয়ক শ্রেষ্ঠ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধরাজীর মধ্যে কয়েকটি হলো হিন্দু দেবদেবীর চিত্র, দিল্লীর চিত্রশালিকা, রং ও ভাব এবং রবিবর্মা। আমাদের দেশে কলাবিদ্যার যে বিশেষ প্রচার, প্রসার এবং সমালোচনা হয়নি সে সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। 'রবিবর্মা'র প্রারম্ভেই তিনি ঘোষণা করেছেন "ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইয়াছে, কলাবিদ্যার অন্যান্য অঙ্গের তাহার শতাংশের একাংশও আদর হয় নাই। বিশেষতঃ চিত্রকলা এদেশে তাহার সেই আদিম রঙলেপা বর্বর অবস্থা হইতে অল্প অগ্রসর হইয়াছে।" "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" প্রবন্ধটি অধিকতর তথ্যবাহী এবং মৌলিক চিন্তার আল্পনায় সমৃদ্ধ। বর্তমানে দেবদেবীর চরিত্রগুলি এমনভাবে অঙ্কিত করা হয় যে তাতে সৌন্দর্য-সম্ভ্রম-বোধ ও পবিত্রতার স্থলে কুৎসিৎ ও কদার্যতাই বেড়ে চলেছে। তাই বলেন্দ্রনাথ বেদনাক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন "দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধর্মচিত্রাবলী এ

পর্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্যটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।" বিভিন্ন দেবী-মাতৃগণের মূর্তি এমনভাবে অঙ্কিত করা হয় যে বাস্তবের নগ্ন নারীমূর্তিও তাতে লজ্জা বোধ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর অঙ্গে যে কয়েকটি বিশেষ রং লেপন করা হয় সে সম্পর্কে লেখকের বিশেষ আপত্তি আছে। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি "রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণপনে নীল পেন্সীল ঘসিয়াছেন; এবং সেই বহু পেন্সীল ঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়ে নহে, কিন্তু বাঙ্গালার রাধিকাগঞ্জন ধর্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা অঙ্গারধূমোদ্গারী কলিযুগে মূর্তিমতী রাণীগঞ্জগঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা বিধাতাও মানব শরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম।" চিত্রের সৌন্দর্য রং-এ নয়—উদার পরিকল্পনায়। তাই "যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিরা দিয়া এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।" দেবদেবীর চিত্রাঙ্কণের পটভূমিতে যদি কোন উদার পরিকল্পনা না থাকে, সৌন্দর্যের অমরাবতীতে অবগাহন করে যদি সেগুলি বিকশিত হয়ে না ওঠে তা'হলে চিত্র হিসেবে সে গুলি ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্যই চিত্রাবলীর রূপ-লাবণ্যের সূতিকাগার। সুতরাং শিল্পীকে সর্বপ্রথম আপন মনের গহনাগারে সৌন্দর্য-লাবণ্যের মানসী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—লাবণ্যের রূপকাঠিতে যখন অন্তর বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে তখন চিত্রেও সে রূপের প্রতিফলন অনিবার্য। নইলে "মদন ভস্মের চিত্রে মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা"-ই বার হ'বে—আদর্শ চিত্রাঙ্কণ সম্ভব নয়। "দিল্লীর চিত্রশালিকা" এই জাতীয় রচনার মধ্য মণি। এই প্রবন্ধটির মধ্যে বলেন্দ্রিয়-গদ্যরীতির সকল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বর্তমান। কারুখচিত শিল্পসুষম রাজকীয় গদ্যরীতি, অতীতাশ্রয়ী রোমান্স-রঙীন চিত্রশিল্প এবং সংগীত মুখর শব্দ যোজনা প্রভৃতির মণি-কাঞ্চনযোগে প্রবন্ধটি বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় "দিল্লীর চিত্রশালিকা একটি মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছবিগুলিকে অবলম্বন করে, রোমান্টিক বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সৌধে মানসিক অভিসার। বহুকাল পূর্বের লুপ্ত জীবনচর্যার যে কয়েকটি স্থিরচিত্র চিত্রশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তাকেই বলেন্দ্রনাথ বাসনার উত্তাপে

বিগলিত করে জীবন-রস-সমৃদ্ধ করেছেন—তরুণ সৌন্দর্য-সাধকের অন্তর্জীবনের লঘুস্পর্শ বর্ণমায়ায় তাই ঘুমন্ত সৌন্দর্যের যেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে।"

খ ॥ প্রাচীন সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা :

এরপর সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা—প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের বিশেষ সৃষ্টি। সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলিকে আমারা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিতে পারি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক, বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত এবং বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বৈষ্ণব সাহিত্যের সবিশেষ আলোচনা। এই তিন শ্রেণীর আলোচনার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথের যে পরিমান সূক্ষ্ম রসবোধ, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং কবিত্ব-পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে—অন্য শ্রেণীদ্বয়ে তা অনুপস্থিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে বলেন্দ্রনাথের আলোচনাগুলি অনুরাগ-রঞ্জিত এবং আবেগ-দীপ্ত হয়ে ওঠার জন্যে দায়ী তাঁর মানস-প্রকৃতি। কেবল সাহিত্য নিয়ে নয় প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য, স্মৃতি-চিহ্ন, ভাস্কর্য-চিত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তিনি যখনই আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন তখন অতীতমুখী এক সুবিপুল রোম্যান্টিক কল্পনার সুখস্পর্শী আনন্দ-বন্যা তাঁর সমগ্র চিত্তকে বিধৌত করে দিয়েছে। তিনি আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে সেই অতীত বিলুপ্ত মরীচিকাময়ী মায়া মৃগীর অনুসরণ করেছেন। নিষ্ঠুর বর্তমানের বুকে বসে অতীতের সেই রূপ-সৌন্দর্যের সেই লীলা নিকেতনের দিকে বার বার কল্প-মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। যেখানে তাঁর কল্পনা স্বর্গ-মৃগীর অনুসারী সেখানে তাঁর রচনা বাদশাহী-বিলাসে উন্মত্ত, চিত্রধর্মিতা এবং সুচিক্কণ চারুকরণে তা' অনন্যসুন্দর আর যেখানে তাঁর অতীতাশ্রয়ী মন অপরিতৃপ্তির বেদনায় বিধুর সেখানে তাঁর রচনা যেন বিরহী যক্ষের অশ্রুসজল ইতিহাস।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং কবি সম্পর্কিত আলোচনাগুলির মধ্যে উত্তরচরিত, কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, কাব্যে প্রকৃতি, মৃচ্ছকটিক মেঘদূত ইত্যাদি প্রধান। বলেন্দ্রনাথের পূর্বেও সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ও কাব্য নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে। আলোচনাকারীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত আলোচনা গুলিকে দু' শ্রেণীতে গণ্ডীবদ্ধ করা যেতে পারে—এক শ্রেণীর আলোচনা বিচার বিশ্লেষণ এবং বস্তুনিষ্ঠ আশ্রয়ী অন্যশ্রেণীর আলোচনায় প্রধান হ'য়ে উঠেছে লেখকের আত্মনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণার রূপায়না। বঙ্কিমচন্দ্র

এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা প্রধানতঃ মননশীলতার এলাকাভুক্ত। কাব্যের বিষয় এবং ভংগীর চুলচেরা হিসাব নিকাশ সেখানে বর্তমান, ফলে এঁদের সমালোচিত প্রবন্ধ আবেগ-বিরল এবং তথ্যদর্শী। আর রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অন্য জাতের, এ সকল প্রবন্ধ সমালোচনা নয়—নতুন সৃষ্টি, বিচার-বিশ্লেষণ নয়—কবি মানসের নিকুঞ্জাভিসার, ফলে এ সকল রচনা আবেগ-বিরল না হ'য়ে কল্পনা-সমৃদ্ধ লিরিকের দোসর হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত (প্রাচীন সাহিত্য) এবং বলেন্দ্রনাথের কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা এবং কাব্যে প্রকৃতি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেঘদূত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের আলোচনাকে অতিক্রম নতুন সৃষ্টির প্রবাহে গতিশীল, নতুন সৌন্দর্য মহাদেশের তীরভূমি এ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় কালিদাস অবলম্বন মাত্র—এ প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চারণভূমির দূর্বা-কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়েছেন ফলে তাঁর কল্পনায় লেগেছে ঊর্মি-দোল। কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যকে অবলম্বন করে তিনি ছবির পর ছবি এঁকেছেন—নিজস্ব মানস প্রকৃতি এবং চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে সে ছবিগুলি ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি বিচার বিশ্লেষণ এবং বিতর্কের পটভূমিতে এ সকল রচনার বিশেষ কোন মূল্য নেই—এদের মূল্য রসসৃষ্টির মৌলিকতায়, নিভৃত মনের কবি সত্তার স্পন্দন-জাগরণে এবং প্রকাশ ভংগীর আবেগ-গভীর চিত্রধর্মিতায়। রসসৃষ্টির সাথে বলেন্দ্রনাথ মেঘদূত, উত্তর চরিত সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে তা' নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক তথাপি রাজকীয় গদ্যের অপূর্ব প্রবর্তণায়, স্বপ্নমুগ্ধ রোম্যান্টিক স্মৃতিচারণায় এ সকল প্রবন্ধের একটি বিশেষ মূল্য সর্বজন-স্বীকৃত। "উত্তরচরিত" প্রবন্ধের অলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রথীন বাবু মন্তব্য করেছেন "উত্তরচরিতের ভাষা ও শব্দ-বিন্যাস নিয়ে বলেন্দ্রনাথ একটি নূতন রসলোক সৃষ্টি করেছেন—প্রবাহমান শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে সমালোচক তাঁর আবেগ-স্পন্দিত কবিকণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিতের আলোচনাটি বিশ্লেষণাত্মক ও বিতর্কমূলক, মাঝে মাঝে অবশ্য রসসৃষ্টির প্রয়াসও আছে—বলেন্দ্রনাথ এখানে জাগ্রত-বুদ্ধি বিশ্লেষণ-নির্ভর সমালোচক নন,—তিনি যেন স্বপ্ন-তন্ময়, আবিষ্ট-চিত্ত কবি।" এই কবিত্বের প্রকাশেই বলেন্দ্রনাথের এ সকল প্রবন্ধ আবেগ-স্পন্দিত, কীর্তি-সমুজ্জ্বল।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি এবং কবিদের নিয়ে অনেকগুলি আলোচনা আমরা প্রাসঙ্গিক বলেন্দ্রনাথের নিকট হ'তে পেয়েছি কিন্তু এই আলোচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্য এবং কবিদের আলোচনার মত উন্নত-শিখর নয়—শিখরের তলভূমি বন্ধুর শানুদেশের মত। এই শ্রেণীর অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা এই: কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, কৃত্তিবাস ও কালিদাস, কেতকী-ক্ষেমানন্দ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য: রামপ্রসাদের গান, বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা, ভারতচন্দ্র রায়, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর। এ সকল রচনা গতানুগতিক—কাব্যের আলোচনায় তিনি কাব্যে বর্ণিত সরস কাহিনীর অনুলিখন করেছেন মাত্র। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিচার বিশ্লেষণের সাথে যে কূল-প্লাবী স্বপ্নাবেগ উৎসারিত হয়েছে তা ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধের বুকে কোহিনূরের দীপ্তি দান করেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিচার-বিশ্লেষণ তো নেই-ই উপরন্তু বলেন্দ্রিয় গদ্য-রীতির প্রকাশ-ভংগী, স্বপ্ন-তন্ময়তা এবং ঐশ্বর্য-দীপ্ত চিত্রাঙ্কনও অনুপস্থিত। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সংযোজনায় গ্রন্থের আয়তনই বেড়েছে—রূপ-সৌন্দর্য ম্লান।

এরপর বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা। এই শ্রেণীর আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের মৌলিক গবেষণা ধর্মী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যশোদা, রাধা ইত্যাদি প্রবন্ধের সুর ঝংকার এবং মন্তব্যগুলি অভিনব—বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের প্রবন্ধ ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। যশোদা প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণ-জননী যশোদা সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তা' বাঙালী পাঠকের অজানা। যশোদা এবং উমার তুলনামূলক আলোচনায় বৈষ্ণব এবং শাক্তের মধ্যকার মূল পার্থক্য স্নিগ্ধকোমলতা এবং ভীষণ-রূঢ়তার স্বরূপটি সুঅঙ্কিত। আদর্শ মাতা হিসেবে যশোদার কৃতিত্ব কতখানি তাও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অন্ধ ভক্তের মত যশোদাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মাতৃত্বের গৌরব দান করেন নি। মায়া-মমতার সাথে তাড়ন-ভৎর্সনার সম্মিলনে শ্রেষ্ঠ মাতার রূপ বিকশিত কিন্তু যশোদা কৃষ্ণের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ বশতঃ স্নেহান্ধ। এবং স্নেহান্ধ মাতা সন্তানের আদর্শ চরিত্র গঠনের অনুপযুক্তা। এইখানেই যশোদা আদর্শ মাতার দুর্লভ সম্মান হ'তে বঞ্চিতা। এরপর লেখক কল্পনায় যশোদার একটি রূপবর্ণনা দিয়েছেন এবং সে রূপ বর্ণনার মধ্যেও গবেষণা ধর্মী ও স্নিগ্ধ পবিত্র মনের চিন্তামনা বর্তমান। 'সখ্য' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই চার প্রকার রসের

সঙ্গে সখ্যের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য সুবর্ণিত। এ ছাড়াও সখ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমাজ-গঠন এবং মানস-প্রকৃতির বিরোধটুকু সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রবন্ধটী বৈষ্ণব সাহিত্যের দুই খ্যাতকীর্তি মহাজনের তুলনামূলক আলোচনা। আলোচনাটী সারগর্ভ নয়। জয়দেব প্রবন্ধটী এই শ্রেণীর প্রবন্ধাবলীর মাঝে আর একটী উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। এখানে লেখক জয়দেবের ওপর বহুজন আরোপিত অশ্লীলতার অপবাদ খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে জয়দেব-অঙ্কিত চিত্রগুলি নগ্ন হলেও স্বাভাবিক—অশ্লীলতার চূড়ান্ত নয়। জয়দেবের এই চিত্রগুলি সম্পর্কে একস্থানে তিনি বলেছেন "এই সহজ পরিতৃপ্ত সংকীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীর সম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।" বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রবন্ধটির ভাষা অভিনব এবং কাব্যধর্মী—বলেন্দ্রিয় গদ্যরীতির সার্থক পরিচয়বাহী।

গ ॥ ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ :

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র, কনারক, খণ্ডগিরি, প্রাচীন উড়িষ্যা, বারাণসী ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধের মধ্যমণি। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধি-সীমা প্রায় দিগন্ত-বলয় স্পর্শ করেছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বলেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি আবেগ-ব্যাকুল অতীত-চারী রোম্যান্টিক কবি মন ছিল—সে মন সৌন্দর্য-সন্ধানী, অতীতের মায়াভূমিতে তার অধিষ্ঠান। কর্কশ-নিষ্ঠুর ইতর বর্তমানের বুকে বসে বলেন্দ্রনাথ বার বার তাঁর দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন দূর অতীতের মায়াঘেরা স্বপ্নলোকে। অতীত ইতিহাসের নিরব সাক্ষী হ'য়ে যে সব ভাস্কর্য-সৌধ এবং ধ্বংসমুখী মন্দির মধ্যভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে সেগুলি রূপ-মুগ্ধ বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে বার বার অতীত সৌন্দর্য-গর্বে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তাঁর সমগ্র মনপ্রাণ সেই অতীত সৌন্দর্য-সাগর-তটে জড়িয়ে অপূর্ব রোম্যান্টিক স্বপ্ন রচনা করেছে—সে স্বপ্ন কখনো আবেগ-দীপ্ত, কখনো বা বেদনাম্লান। বর্তমানের সাথে অতীতের সর্বদাই একটা দূরত্ব বিরাজমান—এই বিস্ময় মণ্ডিত দূরত্বই স্বপ্ন-রচনার সূতিকাগার। বলেন্দ্রনাথের চিত্ত এই দূরত্বের বর্তমান সীমারেখায় দাঁড়িয়ে অতীতমুখী রোম্যান্টিক-স্বপ্নে বিভোর।

ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ রচনায় বলেন্দ্রনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্যের

প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করবো। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সাথে বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধের পার্থক্য আকাশ-পাতালের। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কতকগুলি গণিতিক অঙ্কপাতের মধ্য দিয়ে একটি নিরস ঘটনার বিবৃতি মাত্র—কিন্তু বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিরস ঘটনার অঙ্কপাত নয়—ঐতিহাসিক রোমান্স রসের সংমিশ্রনে লিরিকের প্রান্ত-সীমা-স্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। এ সকল প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ একাধারে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক। ইতিহাস এবং সাহিত্য, ভাস্কর্য এবং ললিতকলা এখানে শ্রীক্ষেত্রের মহাসম্মিলনে মিলিত।

এবার প্রবন্ধালোচনা। প্রাচীন উড়িষ্যা এবং খণ্ডগিরি এ দু'টি প্রবন্ধেই 'ইতর' বর্তমানের সাথে রূপগর্ভ অতীতের একটি তুলনা মূলক আলোচনা আছে। প্রাচীন উড়িষ্যা প্রবন্ধে লেখক উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন-যাত্রার একটি সৌন্দর্য-রঙীন ছবি কয়েকটি অপরূপ রেখাঙ্কনে চিত্রার্পিত করেছেন। এ ছাড়াও প্রাচীন প্রসাধনকলা এবং ধর্ম-জীবনের একটি সারগর্ভ আলোচনা প্রবন্ধটিতে লাবণ্য-শ্রী দান করেছে। অতীত উড়িষ্যার এই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সাথে বর্তমানের দীন হীন উড়িষ্যার আলোচনায় কবি-চিত্ত বেদনা-বিধুর—এবং এই মূক-বেদনা-ম্লান কণ্ঠের করুণ ধ্বনিতেই প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি। খণ্ডগিরিতে প্রধানতঃ স্থান পেয়েছে প্রাচীন উড়িষ্যার মনোরম ধর্মজীবনের অপরূপ রেখাচিত্র, বৌদ্ধ শ্রমনগণ কেমন করে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণের চাপে লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশছাড়া হ'তে বাধ্য হলো তারই এক মর্মস্পর্শী ইতিহাস। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র এবং বারাণসী মূলতঃ ধর্মালোচনা-সমৃদ্ধ—সকল প্রবন্ধের মত এই উভয় প্রবন্ধ-পৃষ্ঠাও অতীত সৌন্দর্য-বিরহী বলেন্দ্রনাথের সঘন দীর্ঘনিশ্বাসে মর্মরিত। কিন্তু কোনারক প্রবন্ধটি বুঝি বেদনার একটি হলুদ-রঙীন আল্পনা। সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে একটি বেদনা-বিহ্বল কণ্ঠ করুণ লয়ে ইমন আলাপ করেছে। কোনারক সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্যই সর্বাপেক্ষা সার্থক এবং অভ্রান্ত "বলেন্দ্রনাথের যে কটি রচনায় তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও গদ্য-রীতি চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে এই প্রবন্ধটি তার অন্যতম। একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথের মণিমাণিক্যদীপ্ত ভাষা ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। কোনারকের পরিত্যক্ত পাষাণ-স্তূপে কোন এক বিলুপ্ত-কীর্তির মায়াজাল বিস্তৃত। লেখক সেই মায়াজালের মাঝখানে জড়িয়ে পড়েছেন—কোন এক পুরাতন নির্জন মহিমাতটে তাঁর তৃষাতুর

দৃষ্টি মৌন ব্যথায় স্তম্ভিত হয়ে আছে।" প্রবন্ধের প্রথম হ'তেই লেখকের কণ্ঠে এই বেদনা-বিহ্বলতা সকরুণ হ'য়ে উঠেছে "কোনারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিত……। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে চীনে এবং অন্যান্য নানা দূর দেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোনার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুক-কেতু উড্ডীয়মান হইত।" এখানে লেখক সত্যই যেন প্রাচীন উপকথার সুবিপুল তটভূমির মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন এবং বর্ণদীপ্ত রাজকীয় গদ্য রীতির অপূর্ব প্রবর্তনায় এই মায়াজালের গ্রন্থি-বন্ধন অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠেছে। সত্যই বলেন্দ্রনাথের বাদশাহী গদ্যরীতি এখানে সর্বোচ্চ গ্রাম-স্পর্শী।

ঘ ॥ সামাজিক প্রবন্ধ ঃ

বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলির বিশেষ রসমূল্য না থাক্‌লেও এ সকল প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি এবং প্রত্যয়নিষ্ঠ স্বাদেশিকতার অনুরাগ লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধরাজীর মধ্যে যে স্বদেশ-প্রীতি বিরাট এবং বিপুল হর্মতল হ'তে কবি আপন প্রাণমূলে অনুভব করেছেন তা' যে কোন কল্পনা বিলাসী মানুষের খেয়ালখুশীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সামাজিক প্রবন্ধগুলি পড়লেই তা' অনুভব করা যায়। এই স্বদেশ-প্রীতি কবির গভীরতম অন্তরপ্রদেশ হ'তে উৎসারিত। স্বদেশের সকল কিছুর প্রতিই বলেন্দ্রনাথের ছিল নিঃসীম নিষ্ঠা—এই নিষ্ঠার দিগন্ত-বলয় কেবল ভাস্কর্য-সুঠাম ভগ্নপ্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরলোকেই দিক হারায়নি—বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গণ পর্যন্ত তা' বিস্তারিত। সামাজিক এবং সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিকতার মধ্যে বলেন্দ্রনাথ যে শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা দেখেছেন সেই সুকোমল-সৌকুমার্য লেখককে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রলুব্ধ করেছে। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের গৃহে এবং বাহিরে সর্বত্রই

একটি অদৃশ্য কল্যান হস্ত বিরাজিত—এ হস্ত কাকেও বিমুখ করেনা। শক্তি এবং সামর্থ যাই থাক—প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মায়া, স্নেহ যেন এ হস্তের অঞ্জাল-সম্পদ, পরের জন্যে এ অঞ্জলি পূর্ণ, এ অঞ্জলি ভিখারীকে দাম দেয় না—তাকে সুনিবিড় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই দেখা যায় পূজা-পার্বণে, উৎসব-আনন্দে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে প্রীতি-বিনিময়ের আনন্দ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, হৃদয়ের লেনদেনই সেখানে বড় কথা—পূজা-পার্বন উপলক্ষ, যাগযজ্ঞের সকল বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তরাল হ'তে স্নেহ-প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহমান। বিভিন্ন সামাজিক এবং পারিবারিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ বার বার আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেছেন "বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, বাঙ্গালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধের এটাই সারকথা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধরাজীর মধ্যে শুভ উৎসব, নিমন্ত্রণসভা, শ্রীহস্ত, শিব-সুন্দর কল্যাণমূর্তি এবং নিমন্ত্রণসভা বিশেষ খ্যাত। স্বদেশ প্রীতির প্রগাঢ় পরিচয় ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের গুরুত্ব এবং মূল্য অপরিসীম।

ঙ ।। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ঃ

এই শ্রেণীর প্রবন্ধকে আমরা বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলেছি। তবে এখানকার বলেন্দ্রনাথ ঠিক প্রাবন্ধিক নন—কবি, সমালোচক নন—শিল্পী। কোন গ্রন্থের বিচার নয়, কোন কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় নয়, কোন ললিতকলার আলোচনা নয়, এমন কি কোন বাহ্য বিষয়-ই এখানে স্থান পায়নি—কবির গোপন মনের ধ্যান-চিন্তা অক্ষরের আল্পনায় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। সকল চিন্তা-ভাবনার উপর বলেন্দ্রনাথের কল্পনা-বিলাসী মনের সুমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া পড়েছে। সামান্য বিষয় অবলম্বন করে লেখক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার আলিম্পনে উর্ণনাভের মত স্বর্ণ-মসলিন বয়ন করেছেন। ফলে প্রবন্ধগুলি একান্ত ভাবেই ব্যক্তিমানসের রেখা-চিত্র হয়ে উঠেছে।

বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির কোন-কোনটিতে ছোটগল্পের আমেজ আছে আবার কোন কোনটি লিরিক ধর্মী। লেখক শিহরণ স্পন্দনের

মধ্যদিয়ে সরল অনাড়ম্বর ভাষায় একেবারে আমাদের গহীন-হৃদয় স্পর্শ করেছেন। এই সুখাবেশ-স্নিগ্ধ মৃদু-কম্পন জাগানোয় মধ্যেই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সর্বোত্তম সার্থকতা। বলাবাহুল্য এই বিচারের মানদণ্ডে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অনন্যসাধারণ। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনাই যেন কল্পনা-বিলাসী বলেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র।

প্রথমে এই জাতীয় প্রবন্ধের নামগুলি উল্লেখ করে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যোগ দেব। বলেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন—তাঁর সমুদয় সৃষ্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই জাতীয় রচনায় সমৃদ্ধ। অশ্রুজল, আশা, ঊষা ও সন্ধ্যা, একরাত্রি, ক্ষণিক শূন্যতা, গান, গৃহকোন, গোধূলি ও সন্ধ্যা, চন্দ্রপুরের হাট, জানালার ধারে, গুঞ্জনায়, নীরবে, পুরাতন চিঠি, শরৎ ও বসন্ত, শ্রাবণের বারিধারা, সন্ধ্যা, স্মৃতি ও কবিতা ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী এই জাতীয় অসংখ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি।

অশ্রুজল প্রবন্ধে লেখক যেন মানুষের গহন হৃদয়ের গোপনীয় ও অঘোষনীয় কথাটি ব্যক্ত করে ফেলেছেন—কল্পনার উত্তাপে বিগলিত হ'য়ে সমগ্র প্রবন্ধটি স্ফটিক-স্বচ্ছ নিটোল মুক্তা হ'য়ে উঠেছে। অশ্রুজল এবং দীর্ঘনিশ্বাসের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অশ্রুজলেরই প্রাধান্য দিয়েছেন—কেননা "অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচ জনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জ্জন।......বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রুধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া।" দীর্ঘনিশ্বাস এবং অশ্রুজল সম্পর্কে এমন মন্তব্য ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিহৃদয়ের কথাটিই যেন এখানে অপরূপ ভংগীতে বাকবদ্ধ হয়েছে।

ক্ষণিক শূন্যতার মধ্যে কবির কল্পনা রূপের তাজমহল গড়েছে। জীবনের একটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত ক্ষণিক শূন্যতাকে নিয়েও যে এমন মণিমাণিক্য খচিত কল্পনা-সৌধ গড়া যেতে পারে তা' ছিল আমাদের চিন্তারও বাইরে। প্রবন্ধের ক্রমাগ্রতার সাথে সাথে আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ নতুন মন্তব্য ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হ'য়ে বার বার চমৎকৃত হ'য়ে ওঠে। চলার পথে আমরা মাঝে মাঝে এমন

এক স্থানে এসে উপনীত হই যেখান হ'তে "পশ্চাত কেবল একটা দূর—অতিদূর মাত্র; সম্মুখও তাই—ধূ-ধূ কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর।" এই উভয়বিধ দূরত্বের মাঝখানে কোন সমন্বয়-সেতু নেই—কেবল বিরাট এক অন্তহীন শূন্যতা—"সহস্র ঘটনার মিলন বিরহে আচ্ছন্ন হইয়া খানিকক্ষণ আমরা অকূল পাথারে ধ্রুবতারাহীনের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখি"—ধ্রুবতারাহীনের ন্যায় এই যে একটা উদ্ভ্রান্ত অনুভূতি এটাই শূণ্যতা। জীবনের মাঝে এই শূন্যতা এসে সকল কিছুতে একটা সংযোগ-সেতু রচনা করে।

স্মৃতি ও কবিতা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রাজির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের মূক চিন্তা ভাবনাগুলি অক্ষরের আলোড়নে-স্পন্দনে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। স্মৃতি ও কবিতার মাঝে যে অদ্বৈত সম্বন্ধ বিরাজমান, যে সম্বন্ধ আমরা বার হ'তে অনুভব করতে পারি না লেখক কল্পনার সাথে মল্ল-যুদ্ধ করে সেই মণিমাণিক্য ছিনিয়ে এনে আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বাস্তব জিনিষকে অবলোকন করার সময় কবি রূপদ্রষ্টা, এই দর্শনে বিশ্ব-নিকেতনের সকল রূপবৈচিত্র্য ও ঘটনাজাল স্মৃতির রোমাঞ্চ রঙীন খেলাঘরে জমা হয়—এই স্মৃতি-খেলাঘরের সম্পদই কবিতার প্রাণ সম্পদ। স্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে লেখক যে মণিমাণিক্য তুলে আনেন কবিতার বুকে বুকে তাই ঝলকিত হয়ে ওঠে। তীব্র অনুভূতি এবং দৃঢ় সংযম আদর্শ কবিতার মূলবান সম্পদ। রূপদ্রষ্টা কবি বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ হতে যে অনুভূতি পান স্মৃতির বিরল নিস্তব্ধতায় তাই সংযত হয়। বাইরের দুর্নিবার আবেগ এবং কল্পনার ফেনিল অংশ স্মৃতিতে জমাট বেঁধে ওঠে। স্মৃতির খেলাঘর হতে এই জমাট ও সার অংশ নিয়েই রূপস্রষ্টা কবি কবিতার মায়াভূমি রচনায় মেতে ওঠেন। স্মৃতির সাথে কবিতার সম্বন্ধ তাই অদ্বৈত এবং অবিচ্ছেদ্য। 'চন্দ্রপুরের হাট' এবং 'বনপ্রান্ত' প্রবন্ধ দুটি পল্লীজীবনের সমস্যা-বিরল জীবন-প্রবাহের রেখাচিত্র। পল্লীর সহজ-স্নিগ্ধ অনাবিল রূপসৌন্দর্য লেখক যেন কল্পনার স্বর্ণ-মস্‌লিন দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছেন। 'জানালা ধারে' এবং 'পুরাতন চিঠি' রচনা দুটি বলেন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে ঊষা ও সন্ধ্যা রচনায় বলেন্দ্রনাথের ভাবুকতা এবং কল্পনা-শক্তি উন্নতির শীর্ষ-বিন্দু স্পর্শ করেছে। প্রবন্ধটি একটি নিখাদ মুক্তানিটোল কোহিনূর। এখানে লেখকের গহন মনের মূক চিন্তাগুলি মৃদু স্পন্দনের পাকে পাকে জড়িয়ে অনন্ত অসীমের অভিসারে যাত্রা করেছে।

এ প্রবন্ধে কল্পনার সাথে ভাষার সারল্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ঊষা ও সন্ধ্যা

সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "উষা সন্ধ্যার ছোট বোন। সন্ধ্যা ঘরকন্না দেখে, উষা খায় দায়, হাসে খেলে। সন্ধ্যা ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটি স্নেহের চুমা খায়। প্রত্যহ উষা আসিবার সময় সন্ধ্যা তাহার গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল দিয়া সাজাইয়া দেয়। সন্ধ্যা গোলাপ ফুল, উষা শিউলী ফুল।" এখানে কল্পনা-বিলাসী বলেন্দ্রনাথ রূপকথা মায়াডোরে জড়িয়ে পড়েছেন।

বিবিধ প্রকার রচনার মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক খাওয়া দাওয়ার কথা আলোচনা করেছেন; আবার কয়েকটি প্রবন্ধ নিছক বর্ণনা মূলক আবার কোনো কোনো রচনায় দেখি তিনি সাহিত্য স্বরূপের আলোচনায় মেতে উঠেছেন। কিন্তু এ সকল প্রবন্ধের মূল্য অতি নগন্য। বিচার বিশ্লেষণে যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই তিনি ব্যর্থ। এর জন্য দায়ী তাঁর মানস-প্রকৃতি। তিনি সমালোচক নন—শিল্পী, বিচারক নন—কবি। রূপদ্রষ্টা এবং রূপ শিল্পী এই দুই অদ্বৈত সত্তায় বলেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ। তাই তাঁর রচনায় বিচার বিশ্লেষণের নিরস যুক্তি-জালের বুকে শিল্পী মনের এক অপূর্ব ভাবপ্রবণতা স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া ফেলেছে এখানেই তার প্রবন্ধ বিচার বিবেচনার গণ্ডী অতিক্রম করে সাহিত্যের রসলোকে করেছে পদ সঞ্চার।

॥ পরিশিষ্ট ॥

[এ অংশটি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়]

॥ চতুর্দশপদী কবিতাবলী ॥

॥ এক ॥ "বিদেশী সাহিত্য হইতে যে সব নূতন প্রয়োগের পরীক্ষা মধুসূদন করিয়াছেন, সনেট তাহার অন্যতম; ইহাতে তাঁহার কবিমানসের নিজস্ব রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না।"

"মধুসূদনের অন্তরঙ্গতম আত্মকথার সার্থক বাহন হ'য়েছে সনেট।"

চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্বন্ধে এই দুইটি বিভিন্ন মতের বিচার কর। এম, এ ১৯৫৭। উঃ—দুই এবং তিন অংশ। পৃঃ ৬—১৮।

॥ দুই ॥ মধুসূদনের সনেটের আদর্শ ও পদ্ধতির আলোচনা কর। চতুর্দশাক্ষর পয়ার পদেই সনেট-পদের দৈর্ঘ্য নিরূপিত করিবার প্রথাকে তোমরা অবশ্য-প্রতিপালনীয় বলিয়া মনে কর কি? এম, এ-১৯৫৭। উঃ—এক অংশ পৃঃ ১—৬।

॥ তিন ॥ "মধুসূদনের কবি-মনের সহজতম ও সুন্দরতম প্রকাশ চতুর্দশপদী কবিতার ভিতর।"

"চতুর্দশপদীর আত্মা মধুসূদনের চোখে পড়ে নাই; তিনি সনেটের আঙ্গিকের সূক্ষ্ম আইন-কানুনের দিকে দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পেয়ে ওঠেন নি।" এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদ আলোচনা পূর্বক মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা-গুলিতে সনেটের ভাবপ্রকাশের আদর্শ ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য কতদূর রক্ষিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে তোমার নিজের অভিমত ব্যক্ত কর। এম, এ—১৯৪৯। উঃ—দুই, তিন এবং এক অংশ। পৃঃ ৬—১৯ এবং ১—৬।

॥ চার ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তেও তাঁহার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় পাশ্চাত্য ভংগীতে প্রাচ্য ভাবই প্রকট করিয়াছেন, এরূপ মন্তব্য কতদূর যুক্তিসংগত তাহা আলোচনা কর। এম, এ-১৯৫৫। উঃ—এক এবং তিন অংশ। পৃঃ ১—৬ এবং ১২—১৯।

॥ পাঁচ ॥ চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদন বহিরঙ্গ বজায় রাখিতে গিয়া কাব্যের ভাবৈশ্বর্যের প্রতি তেমন মন দিতে পারেন নাই, এরূপ মন্তব্য

কতখানি যুক্তিসহ তাহা আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—এক অংশ, পৃঃ ১—৬।

॥ ছয় ॥ মধুসূদন সনেটের মত বিদেশী মাধ্যম অবলম্বন করিতে গিয়া ভাবরাজ্যে স্বদেশীকতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, এইরূপ অভিযোগ কতখানি সমীচীন? চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তাঁহার কবি ধর্মের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আলোচনা বিবৃত কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—তিন এবং দুই অংশ, পৃঃ ৬—১৯।

সাত ॥ "মধুসূদনের আসল ধর্ম হিন্দুধর্মও নয় খ্রীষ্টধর্মও নয়—উহা কবিধর্ম"—মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী অবলম্বন করিয়া এই উক্তিটির তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। অনার্স—১৯৫৬। উঃ তিন অংশ, পৃঃ ১২—১৯।

আট ॥ "প্রত্যক্ষ জগৎ নয়—স্মৃতির জগৎই সাহিত্যের বিষয়বস্তু"---মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী অবলম্বন করিয়া এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। অনার্স---১৯৫৬। উঃ তিন অংশ, পৃঃ ১২---১৯।

॥ কমলাকান্তের দপ্তর ও বিবধ প্রবন্ধ ॥

॥ এক ॥ নৈর্ব্যক্তিক একটি স্থিতপ্রজ্ঞ বিচারক সত্তাই 'বিবিধ প্রবন্ধ' জাতীয় রচনার স্রষ্টা; অপর পক্ষে শিল্পীর আবেগময় সমাজচেতনা ও দার্শনিক মর্মজিজ্ঞাসাই 'কমলাকান্তের' ভাব-উৎস।—আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—এক, দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ২০—৩৩।

॥ দুই ॥ "কমলাকান্তের দপ্তরের" অন্তর্গত 'মনুষ্য-ফল' ও 'বড়-বাজার' নামক প্রবন্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া রস-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত পদ্ধতির বিশদ পরিচয় দাও। এম, এ—১৯৪৯। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ২২—২৯।

॥ তিন ॥ "কৈশোরে 'কমলাকান্ত' প্রথম পাঠ করিবার পর প্রথম যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন 'ওটা De Quinceyর Confessions of an English Opium Eater-এর অনুকরণ।' বড় হইয়া বুঝিয়াছি উহা পণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়।" এই মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের মৌলিকতার যে ইংগিত পাওয়া যাইতেছে তাহার আলোচনা কর। এম, এ—১৯৪৯। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ২২—২৯।

॥ চার ॥ বাহিরের দিক হইতে 'কমলাকান্ত' কয়েকটি হাল্কা-গম্ভীর ব্যঙ্গ-হাস্য-বেদনামূলক প্রবন্ধের সমষ্টি, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই একটা মূলতত্ত্ব ওৎপ্রোত হইয়া আছে, ইহাই কমলাকান্তের দর্শন।"—এই উক্তিটি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫০। উঃ এক এবং দুই অংশ, পৃঃ ২০—২৯।

॥ পাঁচ ॥ Humourকে আমরা সাধারণত হাস্যরস-প্রধান রূপেই ধারণা করিয়া থাকি। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' বহু প্রবন্ধেই গভীর তত্ত্বালোচনামূলক;

Humour-এর কিরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিলে এই সমস্ত প্রবন্ধকে Humour-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহার বিচার কর। এম, এ—১৯৫০। উঃ দুই অংশ; পৃঃ ২২—২৯।

॥ ছয় ॥ সংস্কার প্রয়াস অতিমাত্রায় প্রকট না হ'লে সাহিত্য হিসাবে কমলাকান্তের দপ্তর অধিকতর সার্থকতা লাভ করত।—এই উক্তির সত্যাসত্য বিচার কর। সাহিত্য-ভারতী, ১৩৬৪। উঃ দুই অংশ, পৃঃ ২২—২৯।

॥ সাত ॥ সৃষ্ট বহু স্মরণীয় চরিত্রের ন্যায় কমলাকান্তও একটি সর্থক চরিত্র সৃষ্টি। এই চরিত্রটির একটি বিচার বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ দাও। সাহিত্য-ভারতী, ১৩৬৪। উঃ দুই অংশ, পৃঃ ২২—২৯।

॥ আট ॥ কমলাকান্তে 'দেশ ও কালের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশে স্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবার ইংগিত দিয়া গিয়াছেন।' আলোচনা কর। সাহিত্য-ভারতী ১৩৬২। উঃ ঐ।

॥ নয় ॥ 'বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।' কমলাকান্ত সম্বন্ধে ঐ উক্তির সত্যতা বিচার কর। সাহিত্য-ভারতী—১৩৬২। উঃ ঐ।

॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি-মানস ॥

এক ॥ দৃষ্টান্ত উদ্ধার পূর্বক বিশদভাবে বিচার কর : "একান্তভাবে রবীন্দ্রযুগের কবি হইয়াও কবিমানসের ঋতুতে এবং গঠনে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন একান্তভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী"। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—এক, দুই এবং ছয় অংশ, পৃঃ ৩৫—৪৪ এবং ৫৫—৫৯।

দুই ॥ দৃষ্টান্ত উদ্ধার পূর্বক বিশদভাবে বিচার কর : "আমরা কবির প্রথম ও মধ্যজীবনের কাব্য লক্ষ্য করিয়াছি, সেখানে কবির যে নাস্তিকতা তাহা তাঁহার চিত্তের কোনও সংশয়জাত নহে, বিশুদ্ধ অবিশ্বাসজাত। কিন্তু সেই অবিশ্বাসই 'সায়ম্'-এর পর হইতে দেখা দিয়াছে চিত্ত-সংশয়রূপে।" এম, এ—১৯৫৭। উঃ—তিন, চার ও পাঁচ অংশ, পৃঃ ৪৪—৫৫।

তিন ॥ সাম্প্রতিক বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতা কোথায় তাহা বিচার কর। সাহিত্য ভারতী—১৩৬৪। উঃ—এক এবং দুই অংশ, পৃঃ ৩৪—৪৪।

চার ॥ 'ঘুম' কবিতাটির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি মূলসুর ধ্বনিত হইতেছে। এই সুরটি কি? উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা কর। সাহিত্য ভারতী—১৩৬৪। উঃ দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ৩৭—৪৬।

।। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ।।

এক ॥ তুমি বঙ্গভারতীর……কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে"—রবীন্দ্রনাথকৃত সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রশস্তি তাঁহার কাব্যের মূল প্রেরণা অনুভব করিতে আমাদের কতখানি সহায়তা করে তাহা নির্ধারণ কর। এম, এ—১৯৫৭ এবং এম, এ ১৯৫৩। উঃ—দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ৬৫—৭৭।

দুই ॥ "সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের বৈদগ্ধ্য, নানা কলারুচি এবং পারিপাট্যস্পৃহা, তিনটি গুণই প্রতিফলিত হ'য়েছে।" দৃষ্টান্ত সহযোগে মন্তব্যটির আলোচনা কর। এই সমস্ত গুণের আধিক্যের দ্বারা কবির বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণা কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে কিনা তাহাও বিচার কর। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ৬৫—৭৭।

তিন ॥ "শ্রমনিষ্ঠ বিদ্বানের শব্দৈষণা এবং স্পর্শকাতর কবিমানসের শব্দানুভূতি, পরস্পরের পারপূরক এই দুই ভিন্ন প্রবণতা সত্যেন্দ্রনাথের মজ্জায় প্রবেশ করেছিল।" বিচার কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ৬৫—৭৭।

চার ॥ অনুবাদের দায়িত্ব শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য, সুস্পষ্ট অর্থ সরবরাহ করেই শেষ হয় না, সেই অর্থটিকে রসের সামগ্রী করে তোলা চাই।" সত্যেন্দ্রনাথের যে কোন একটি অনুবাদ-কবিতা নির্বাচন করিয়া মূল্যের সহিত তুলনাসূত্রে তাঁহার এই জাতীয় দক্ষতার বিশদ পরিচয় দাও। এম,এ—১৯৫৬। উঃ-চার অংশ, পৃঃ ৭৭—৭৮।

পাঁচ ॥ "সত্যেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ বাক্য ও ছন্দে যাহাকে তাঁহারকাব্যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানগোচর বুদ্ধিগোচর জগৎ—রহস্য সংশয়ের জগৎ নয়, বস্তুভেদী ভাব-কল্পনার জগৎ নয়।" উদ্ধৃতি সহযোগে এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত কর। এম,এ—১৯৫৫। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ৬৫—৬৯।

ছয় ॥ 'তাঁহার (সত্যেন্দ্রনাথের) কল্পনার প্রসার খুব অল্প, আত্মবিস্মৃত কল্পাবেশের চিত্তচমৎকার তাঁহার কাব্যে অপেক্ষাকৃত বিরল, কবিত্ব অপেক্ষা কলাকৌশলের প্রতি তাঁহার কবি মানসের পক্ষপাত অধিক।' এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া ইহা দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির পরিচয় কতদূর সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিচার কর। এম,এ—১৯৫৫। উঃ-দুই এবং তিন অংশ, পৃ ৬৫—৭৭।

সাত ॥ প্রত্যেক মৌলিক কবি-প্রতিভা চিন্তা ও ভাবরাজ্যের কোনও না কোন নূতন অংশ অধিকার করিয়া তাহাকে কাব্যানুভূতির শাসন ও শৃঙ্খলাভুক্ত করে। কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য কতখানি প্রযোজ্য তাহা বিচার কর। এম,এ—১৯৫৪। উঃ-এক, দুই, তিন অংশ, পৃঃ ৬২—৭৭।

আট ॥ "প্রকৃত কবিতা ভাষান্তরিত করা যায় না"—এই অভিমতের পিছনে কাব্য-অনুবাদের যে দুরূহ আদর্শের আভাস মিলে, সেই আদর্শের মানদণ্ডে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিমাপ করিতে চেষ্টা কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ—চার অংশ, পৃঃ ৭৭—৭৮।

নয় ॥ গীতি-প্রতিভা অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথের স্বাজাত্য বোধের উগ্রতা ও তথ্য প্রাচুর্যের দ্বারা ক্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়—এই মতটি তুমি কতদূর সমর্থন কর। এম,এ—১৯৫৩।

॥ বিহারীলাল ॥

এক ॥ বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্যে তাঁহার কবি প্রকৃতির যে বিশিষ্ট রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পরিস্ফুট কর। এম এ—১৯৫৭। উঃ—তিন অংশ, পৃঃ ৮৮—৯০।

দুই ॥ বিহারীলালের 'সাধের আসন' জনৈক সমালোচকের মতে 'একটি ভাবোন্মাদময় এবং দিশাহারা উল্লাস'—এরূপ বিচার কতদূর গ্রাহ্য, কারণ দর্শাইয়া তাহা আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ তিন এবং চার অংশ, পৃঃ ৮৮—৯৪।

তিন ॥ 'সরস্বতীর আসন বাস্তপিণ্ডের উপরে নহে, পদ্মের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যেই তাঁহার অধিষ্ঠাণ'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিহারীলালের 'সাধের আসন' সম্বন্ধে কতদূর প্রযোজ্য তাহা আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ চার অংশ, পৃঃ ৯০—৯৪।

চার ॥ বিহারীলালের সারদার পরিকল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত—ইহা সারদা-মঙ্গল কাব্য হইতে প্রতিপন্ন কর। এম, এ—১৯৫৫। উঃ দুই অংশ, পৃঃ ৮৩—৮৭।

পাঁচ ॥ অন্যান্য কবির সহিত তুলনায় বিহারীলালের নিসর্গ-কবিতার অনির্বচনীয় ভাবব্যঞ্জনার স্বরূপটি পরিস্ফুট কর। কবি কিরূপ বিশিষ্ট কাব্যরীতি ও সূক্ষ্ম অনুভবশীলতার সাহায্যে ইহার উদ্রেক রূপদান করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ দুই তিন এবং চার অংশ, পৃঃ ৮৩—৯৪।

ছয় ॥ "স্বপ্নরাজ্যের সূত্রদ্বারা যেন ইহা (বিহারীলালের কবিতা) গ্রথিত, সন্ধি ও মিলন-স্থল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না···শূন্যের পরে কুসুম-সৌরভের সমুন্নত সৌধ-সৌন্দর্য গ্রন্থিতে স্তরে স্তরে গাঁথা; এই অলক্ষ্যবন্ধন গ্রন্থগুলির সন্ধান ও সংকেত না জানিলে সৌধ খসিয়া পড়ে, সৌরভ সরিয়া যায়"—বিহারী-লালের কাব্য সম্বন্ধে এই অভিমতের সার্থকতা উদাহরণ সহযোগে বিচার কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ দুই এর প্রথমাংশ এবং চার, পৃঃ ৮৩—৮৫ এবং ৯০—৯৪।

সাত ॥ "সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদা-মঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাস দেয় কিন্তু কোনরূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখেনা, অথচ সুদূর সৌন্দর্য-স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিনী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যকুল করিয়া তুলিতে থাকে।' সারদা মঙ্গল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এম, এ—১৯৫৩। উঃ দুই অংশ, পৃঃ ৮৩—৮৭।

আট ॥ 'সারদা মঙ্গল' কবির মানসী-রূপায়ণের এক নূতন ধারা অবলম্বিত হইয়াছে—সারদার মানবী মূর্তির সুনির্দিষ্ট অবয়বকে নিখিল প্রকৃতির রূপ, রং ও রহস্যের সূক্ষ্মতন্তুতে বোনা একটি ভাস্বর মায়া যবনিকার অন্তরালে রাখার ফলে ইহার মধ্যে সার্বভৌম সাংকেতিক তাৎপর্য আরোপিত হইয়াছে। বিহারী-লালের কাব্য সম্বন্ধে এই উক্তির যথার্থ আলোচনা কর। এম, এ—১৯৪৯। উঃ দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ৮৩—৯০।

নয় ॥ 'বিহারীলালের কবিতার শোধনমন্ত্রে বাংলা কাব্যের ধর্মান্তর হয় বলিয়া বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার একটি স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট আছে'—আলোচনা কর। সাহিত্য-ভারতী—১৩৬২। উঃ এক অংশ, পৃঃ ৮০—৮২।

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

এক ॥ "দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই যে বিস্তীর্ণ ভাবকল্পনার অবকাশ

আছে এবং উপযুক্ত লেখনীর স্পর্শে বাংলা ভাষাতেও তাকে যে উপাদেয় সাহিত্যে পরিণত করা যায়—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেইটিই সপ্রমাণ করেছেন।" —উক্তিটির আলোকে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান নির্ণয় কর। এম, এ—১৯৫৭। উঃ এক অংশ, পৃঃ ৯৫—৯৯।

॥ চর্যাপদ ॥

এক ॥ ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া চর্য্যাপদ যে বঙ্গ সাহিত্যের বিবর্ত্তন ধারার মূল উৎসরূপে বিবেচিত হইতে পারে তাহা উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর। এম, এ ১৯৪৯। উঃ—এক এবং তিন অংশ, পৃঃ ১৩৫—৪২ এবং ১৪৬-৪৮।

দুই ॥ ধর্ম-সাধনার যে আদর্শটি চর্য্যাপদের ভাব-ভিত্তি তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। কবিগোষ্ঠির রচনা-রীতির কিরূপ গুণে এই ধর্মানুশাসনে গ্রন্থটি কাব্যরস সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিশদরূপে দেখাও। এম, এ ১৯৪৯। উঃ—এক অংশ, পৃঃ ১৩৫-৪২।

তিন ॥ চর্য্যাপদের সহিত পরবর্ত্তীকালের বাংলা সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ ও কাব্যরীতির সংযোগের পরিচয় বহুস্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এম, এ ১৯৫০। উঃ—এক এবং তিন অংশ, পৃঃ ১৩৫-৪২ এবং ১৪৬-৪৮।

চার ॥ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের রচনাবলী বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সহিত কতটা সম্পর্কযুক্ত তাহা তোমার পাঠ্য চর্যাপদগুলির সাহায্যে নির্ণয় করিতে চেষ্টা কর। এম, এ ১৯৫১। উঃ—এক, দুই এবং তিন অংশ।

পাঁচ ॥ "চর্যাপদগুলিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার সহিত সাধক-জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি জড়িত হইয়া থাকাতে কতপ্রকার সাহিত্য-রসের সৃষ্টি হইয়াছে"—তোমার পাঠ্য চর্যা সমূহ অবলম্বনে এই বাচ্যটির সত্যতা পরীক্ষা কর। এম, এ, ১৯৫১। উঃ—এক অংশ, পৃঃ ১৩৫-৪২।

ছয় ॥ "বৌদ্ধগান"-এর রচয়িতাদের প্রাদুর্ভাব-কাল সম্বন্ধে আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫২। উঃ—

সাত ॥ "বৌদ্ধগান"-এর ভাষায় বাঙ্গলা ভাষার নিজস্বরূপ কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উদাহরণ সহকারে বিচার কর। এম, এ, ১৯৫২।

আট ॥ পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ ও কাব্যরীতির উপর চর্যাপদের কতখানি প্রভাব পড়িয়াছে; কয়েকটী দৃষ্টান্ত সহযোগে তাহার আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫৩। উঃ—এক এবং তিন অংশ, পৃঃ ১৩৫-৪২ এবং ১৪৬-৪৮।

নয় ॥ তোমাদের পাঠ্য চর্য্যাপদগুলি হইতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫৩। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ১৪২-১৪৬।

দশ ॥ চর্য্যাপদগুলির মধ্যে দর্শন ও সাধনের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যে সমস্ত রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ ও উহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। এই রূপক-প্রয়োগের কাব্যোপযোগীতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধেও আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫৪। উঃ—এক এবং চার অংশ, পৃঃ ১৩৫-১৪২ এবং ১৪৮-১৫২।

এগার ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্য্যাপদগুলিকে বৌদ্ধগান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন কেন ? তোমাদের পঠিত চর্য্যাগুলির মধ্যে "বৌদ্ধত্বের কি পরিমাণ নিদর্শন পাইয়াছ তাহা উদ্ধৃতি সহকারে সংক্ষেপে বিবৃত কর। এম, এ, ১৯৫৪। উঃ—চার এবং পাঁচ অংশ, পৃঃ ১৪৮-১৫৫।

বার ॥ চর্য্যাপদগুলির অন্তর্নিহিত ধর্মসাধনার ধারা আলোচনা করিয়া বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ধর্মসংস্কৃতির সহিত উহাদের সম্পর্ক নির্ণয় কর। এম, এ, ১৯৫৫। উঃ—এক, তিন, চার এবং পাঁচ অংশ।

তের ॥ "আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের গভীর ধর্মতত্ত্বের সহিত ব্যক্তিগত অনুভূতির সংযোগে এক অপূর্ব রস সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে"—স্বপঠিত চর্য্যাপদগুলির সাহায্যে এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপাদন কর। এম, এ, ১৯৫৫। উঃ—এক, চার এবং পাঁচ অংশ।

চোদ্দ ॥ "সাধন প্রণালীতে কতক কতক অংশে বিভিন্নতা থাকিলেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে তত্ত্বগত কোন পার্থক্য নাই।"—উভয় ধর্মের সাধন বৈশিষ্ট্য নির্দেশপূর্ব্বক এই উক্তির যৌক্তিকতা তোমাদের পাঠ্যগ্রন্থ অবলম্বনে আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫৬। উঃ—চার এবং পাঁচ অংশ।

পনেরো ॥ চর্য্যাপদগুলির মধ্যে তত্ত্বচিন্তা ও গুহ্য সাধনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তোমাদের পঠিত চর্য্যাপদগুলি অবলম্বনে যথা সম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫৬। উঃ—দুই এবং চার অংশ, পৃঃ ১৪২-১৪৬, ১৪৮-১৫২।

ষোল ॥ বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যগণের রচনাবলী বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সহিত কতটা সম্পর্কযুক্ত তাহা তোমার পাঠ্য চর্য্যাপদগুলির সাহায্যে নির্ণয় কর। এম, এ, ১৯৫৭। উঃ—এক এবং তিন অংশ।

সতেরো ॥ চর্য্যাপদগুলির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ

করিতে গিয়া যে সমস্ত রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে উদাহরণ সহ সেই গুলির কাব্যোপযোগিতা বিশদ ভাবে আলোচনা কর। এম, এ, ১৯৫৭।

॥ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

॥ এক ॥ "বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপনে বিদেশী লেখকদের সহযোগিতার মূল্য অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে।" এ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি? এম, এ—১৯৫০। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ২১৮-২২৩।

॥ দুই ॥ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাব ও প্রেরণার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজো সক্রিয় এরূপ মন্তব্য কতখানি সমীচীন এবং তত্ত্ববোধিনীর ধারা কি ভাবে বাংলা সাহিত্যে কাজ করিয়া আসিতেছিল, কারণ সহ তাহা আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫১। উঃ—তিন অংশ ২২৩-২৩০।

॥ তিন ॥ সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের সূত্রপাত কেহ কেহ বলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের রচনায় অপরে বলেন রামমোহন রায়ের লেখায়। আলোচনা করিয়া এবিষয়ে তোমার মত প্রতিষ্ঠিত কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ—দুই এবং চার অংশ, পৃঃ ২১৮-২২৩, ২৩২-২৩৩।

॥ চার ॥ বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপনে ইউরোপীয় মিশনারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষদানের পরিমান নির্ণয় কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—দুই অংশ।

॥ পাঁচ ॥ "১৮১৮খৃঃ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যে বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রধানতঃ সাময়িক পত্রপত্রিকার আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে"—বাংলার সাময়িক ও সংবাদ পত্রের প্রথম যুগের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এই উক্তির যথার্থ বিচার কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—তিন অংশ, পৃঃ ২২৩-২৩০।

॥ ছয় ॥ সাধারণতঃ প্রভাবশালী মাসিক পত্রকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সমধর্মী লেখক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, সাধনা ও ভারতী,—ইহাদের মধ্যে যে কোন উৎভূত হইয়াছিল তাহাদিগের সাধারণ লক্ষণ, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক অগ্রগতির উপর প্রভাব সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর। এম, এ—১৯৫৩। উঃ—তিন এবং চার অংশ।

॥ সাত ॥ ইংরাজী ও সংস্কৃত হইতে ভাবানুবাদের ভিতর দিয়া বাংলা গদ্য পরিণতির পথে কতটা অগ্রসর হইয়াছিল মৃত্যুঞ্জয়, তারাশঙ্কর, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের রচনা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বিচার কর। এম, এ—১৯৫২।

॥ আট ॥ মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারী-চাঁদ মিত্র এই কয়জন লেখককে পৃথক ভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এইরূপ অভিহিত করা কতর সমীচীন তাহা বিচার কর। এম, এ—১৯৪৯। উঃ—চার অংশ।

॥ জীবনস্মৃতি ॥

॥ এক ॥ বাংলা ভাষায় জীবন চরিত সাহিত্যের মধ্যে জীবন স্মৃতির স্থান বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ রচনা কর। এম, এ—১৯৫১। উঃ—এক এবং দুই অংশ।

॥ দুই ॥ জীবনস্মৃতি হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের পারস্পারিক প্রভাব সম্বন্ধে কিরূপ আলোকপাত হয় তাহার বিচার কর। এম, এ—১৯৫২। উঃ—এক, দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ২৫০-২৫৯।

॥ তিন ॥ জীবন-স্মৃতি ও প্রাচীন সাহিত্য কবির গদ্য রচনা ভঙ্গীর পার্থক্য বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। এম, এ—১৯৫৩। উঃ—

॥ চার ॥ জীবন-স্মৃতিতে কাব্য ধর্ম সমাধিক ফুটিয়াছে না বস্তুনিষ্ঠা বেশী প্রকাশ পাইয়াছে? "অন্তর্মুখিতা, সংশয়হীন আত্মস্থতা"—জীবনী সাহিত্যে জীবন স্মৃতির বৈশিষ্ট্য এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে তাহা বিবৃত কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ—দুই এবং তিন অংশ।

॥ পাঁচ ॥ "বাংলা ভাষায় লিখিত জীবন চরিত সাহিত্যে (স্মৃতি কথা, আত্ম-জীবনী, জীবন চরিত প্রভৃতি) জীবন স্মৃতি গ্রন্থখানি শিল্পগতি একটি বঞ্চিত আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।" উক্তিটি সমর্থন করিয়া জীবনস্মৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। এম, এ—১৯৫৫। উঃ—এক অংশ।

॥ ছিন্নপত্র ॥

॥ এক ॥ জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে আর ভিতরের দিকে সংগে সংগে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুইয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুই ঠিক এক নহে।" জীবনস্মৃতির ভূমিকার এই সংকেত মনে রাখিয়া জীবন-স্মৃতিও ছিন্নপত্র গ্রন্থ দ্বয়ের পরিকল্পনার ও রচনার উৎকর্ষ বিচার কর। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—দুই এবং তিন অংশ।

॥ দুই ॥ রবীন্দ্রনাথের পত্র সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা প্রসংগে ছিন্নপত্রের

উৎকর্ষ ও বিশেষ স্থান সম্বন্ধে তোমার অভিমত প্রকাশ কর। এম, এ—১৯৫৫। উঃ—এক অংশ, পৃঃ ২৩৭-২৩৯।

॥ তিন ॥ "অনেক সময় দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ছোট গল্প ও কবিতা একই ভাববস্তুর ভিন্ন রস মূর্ত্তি"—যথোচিত তথ্য ও দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া বিষয়টি বিচার কর। এম, এ—১৯৫৫। উঃ—তিন অংশ।

॥ চার ॥ ছিন্নপত্রের পত্রগুলিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেরণা স্বরূপ যে সমস্ত প্রাথমিক অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যায় সে গুলিকে আশ্রয় করিয়া তৎকালীন রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় দাও। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—তিন অংশ, পৃঃ ২৪২-২৪৭।

॥ লিপিকা ॥

॥ এক ॥ রবীন্দ্রনাথ লিপিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে লিপিকাই তাঁহার প্রথম গদ্য কবিতা রচনার প্রচেষ্টা ও সম্ভবতঃ ভিরুতার জন্যই ইহার পংক্তি-বিন্যাসকে পদ্যের বহিরঅবয়ব দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থটি সত্যই কতখানি গদ্য কবিতার লক্ষণাক্রান্ত ও গদ্য কবিতার পংক্তি বিন্যাস কতখানি সার্থক হইত পত্রপুটের সহিত তুলনায় তাহা বিচার কর। এম, এ ১৯৫০। উঃ—চার অংশ।

॥ দুই ॥ লিপিকার কতকগুলি রচনায় কাব্যোচ্ছ্বাস পূর্ণ কতকগুলি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত সার ও কতকগুলি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ইঙ্গিতে রূপকধর্মী বিভিন্ন জাতীয় রচনায় লেখকের সাফল্যের পরিমান সম্বন্ধে আলোচনা কর। লিপিকাতে রবীন্দ্রনাথ কি এক নূতন শিল্পরূপের সার্থক প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এম,এ—১৯৫০। উঃ—সমগ্র প্রবন্ধ।

॥ তিন ॥ গদ্য কাব্য ছোটগল্প, নিবন্ধসাহিত্য এবং রূপক রচনা—লিপিকা ইহাদের মধ্যে কোন পর্য্যায়ে পড়িবে? এম,এ—১৯৪৯। উঃ—ঐ
লিপিকার গদ্য রীতির মূর্ল বিশেষত্বের অল্প কথায় পরিচয় দাও। এম,এ—১৯৫৭।

॥ বাংলা নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ ॥

॥ এক ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টমদশক পর্যন্ত বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যের বিকাশের ধারা আলোচনা কর। এই প্রসংগে সংস্কৃত নাটক, ইংরাজী নাটক এবং প্রাচীন

যাত্রা নাটকের নিকট ঋণ কতখানি তাহা নির্দ্ধারণ কর। এম, এ—১৯৫৫। উঃ দুই এবং তিন অংশ, পৃঃ ১৮৬—১৯৫।

॥ দুই ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকটি নাটকের বৈশিষ্ট্য বিচার পূর্ব্বক তৎপূর্ব্ববর্ত্তি নাট্যকারগণের সহিত তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিমাপ কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ তিন অংশ।

॥ তিন ॥ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত বাংলা নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি গতি ও প্রকৃতির আলোচনা কর। ইহার উপর কতটা ইংরেজী ও কতটা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রভাব ছিল তাহার নির্দেশ কর। এম,—এ ১৯৪৯। উঃ তিন এবং দুই অংশ, পৃঃ ১৮৬—১৯৪।

॥ চার ॥ যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশের পরিচয় দিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের সহিত ইহার কি সম্পর্ক ও তাহার উপর ইহার কতদূর প্রভাব তাহার আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫০। উঃ এক অংশ, পৃঃ ১৮৩—১৮৬।

॥ পাঁচ ॥ The Indian theatre of today marks the meeting Point of three main streams. Viz the ancient Indian classical drama the mediaeval popular stage and the powerful British influence." এরূপ উক্তি কতদূর যুক্তিসংগত তাহা আলোচনা করিয়া দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য রচনার বিচার কর। এম, এ—১৯৫১। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ১৮৬—১৯১।

॥ ছয় ॥ রামনারায়ণ তর্করত্ন হইতে দীনবন্ধু মিত্র পর্য্যন্ত নাটকের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর। এই অগ্রগতির মধ্যে বিশেষ করিয়া নাটকের আংগিকের উন্নতি ও মানবিক রসের বৃদ্ধি কি পরিমাণে হইয়াছে তাহার আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫২। উঃ—তিন অংশ।

॥ সাত ॥ প্রহসন ও গভীর রসাত্মক কমেডির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের মানদণ্ড কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে তোমার মত ব্যক্ত কর। এই আলোচনা প্রসংগে কুলীনকুল সর্বস্ব, সধবার একাদশী, খাসদখল ও গোড়ায় গলদ নাটকগুলি কোন পর্য্যায়ে পড়ে তাহা বিচার কর। এম, এ—১৯৫৩। উঃ—তিন অংশ।

॥ নীলদর্পণ ॥

এক ॥ নীলদর্পণ নাটক রচনায় উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টিতে ব্যর্থতার এবং নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর। এম,এ—১৯৫৭। উঃ—তিন অংশ, পৃঃ, ২০৪—২০৭।

দুই ॥ "নীলদর্পণ নাটকে যথার্থ ট্র্যাজেডির বীজ ছিল কিন্তু ইহার নাট্যকারের ট্র্যাজেডির রচনা প্রতিভা ছিলনা।" এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ কর। এম,এ—১৯৫৭।

তিন ॥ ঐতিহ্যের সহিত অভিজ্ঞতার উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধানেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু ঐতিহ্যের অনুবর্তনে দীনবন্ধুর লেখনীর দুর্বল এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োগে তিনি অসংযত—ইহারই ফলে নীল-দর্পণ যথোচিত শিল্প সফল হয় নাই। সিদ্ধান্তটি কতখানি সমীচীন নির্দ্ধারণ কর। এম,এ—১৯৫৬।

চার ॥ "নবীনমাধবকে কাহিনীর নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করাই হয়তো দীন-বন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নীলদর্পণ বস্তুতঃ সামগ্রিক ঐকতান। ব্যক্তির চাইতে সমষ্টিই এই নাটকের নায়কত্ব দাবী করে।"—বিচার কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—পাঁচ অংশ, পৃঃ ২১৩-২১৫।

পাঁচ ॥ "নীলদর্পণের ভদ্রেতর চরিত্রগুলি নিখুঁত ও জীবন্ত কিন্তু সেরূপ সাফল্য ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কণে দেখা যায় না। এই মন্তব্য যদি যথার্থ হয় তবে এরূপ বৈষম্যের কারণ নিদেশ কর। এম,এ—১৯৫৫। উঃ—তিন অংশ, পৃঃ, ২০৪—২০৯।

ছয় ॥ "যে সাময়িক উত্তেজনা ও উদ্দেশ্য নীলদর্পণ নাটকটিকে প্রেরিত করিয়াছিল তাহা উপকরণ ও উপলক্ষ্য মাত্র, সাময়িক কাহিনীর আলেখ্যে যে সনাতন জীবন-সত্য জীবন্ত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, কেবল তাহার উপরই ইহার চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণ করে।" এই মন্তব্য অবলম্বন করিয়া নাটকটির সাহিত্যিক মূল্য পরীক্ষা কর। এম,এ—১৯৫৫। উঃ—চার অংশ, পৃঃ ২১৩-২১৫।

সাত ॥ "প্রথম প্রচেষ্টা হইলেও নীলদর্পণ দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ না হোক সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে; ত্রুটি রহিযাছে কিন্তু কৃতিত্ব রহিয়াছে যথেষ্ট এ অভিমতের সবিস্তার আলোচনা কর। এম,এ—১৯৫৪। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ২০০—২০৪।

আট ॥ "নীলদর্পণের পূর্বে বাংলা নাটক ছিল না বলিলেই হয়।" এই এই মন্তব্যের আলোচনা করিয়া কি হিসাবে নীলদর্পণ প্রথম প্রকৃত নাটক তাহা নির্দেশ কর। এম,এ—১৯৫৩। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ২০০—২০৪।

নয় ॥ "নীলদর্পণে অতি সহজ ও সুস্পষ্ট চাষার বুদ্ধি, চাষার প্রাণ ও চাষার ভাষা উৎকৃষ্ট নাট্য রসের উপাদান হইয়াছে।" প্রধাণতঃ তোরাপ ও

ক্ষেত্রমণির চরিত্র-চিত্র অবলম্বন করিয়া এই সমালোচনার যথার্থতা নির্ণয় কর। এম,এ—১৯৫৩। উঃ—তিন অংশ, ২০৪—২০৯।

দশ ॥ কি কি লক্ষণ দেখিয়া আমরা কোন চরিত্রকে নাটকের নায়ক চরিত্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি? নায়ক চরিত্রের এই সকল লক্ষণকে মিলাইয়া নীলদর্পণ নাটকের কোন চরিত্রকে এই নাটকের নায়ক বলিয়া গণ্য করা যায় কি? এম, এ—১৯৫২। উঃ—পাঁচ অংশ, পৃঃ ২১৩-২১৫।

এগার ॥ "উদ্দেশ্যমূলক নাটকের উদ্দেশ্যধর্ম যদি উহার নাট্য ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে ঐ নাটক একটা বিশেষ যুগে পাঠক চিত্তে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে বটে, কিন্তু নিত্যকালের পাঠকচিত্তে স্থায়ী রাসানন্দ জাগাইতে পারে না।" এই মন্তব্যটির যথার্থ বিচার কর। এবং নীলদর্পণ নাটকখানির মধ্যে এই সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদানই বা কতটা বর্ত্তমান তাহা বিচার করিয়া দেখাও। এম, এ—১৯৫১। উঃ—চার অংশ, পৃঃ ২০৯-২১৩।

বার ॥ তোরাপ চরিত্র বর্ণনা কর। সাহিত্য ভারতী,—১৩৬২।

তের ॥ "নীলদর্পণের অশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে মুক্ত কণ্ঠ হইয়াও একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নাটকত্বের দিক দিয়া এই নাটকের অনেক দোষ ও ত্রুটি আছে।" দৃষ্টান্ত সহযোগে এই যুক্তির যথার্থ প্রতিপন্ন কর। সাহিত্য ভারতী—১৩৬২।

চোদ্দ ॥ নীলদর্পণ নাটকে কোন কোন চরিত্র সাধুভাষা এবং অন্যান্যেরা কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছে। এটি কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং তাতে নাটকের ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে কি না আলোচনা কর। সাহিত্য ভারতী ১৩৬৪। উঃ তিন অংশ, পৃঃ ২০৪-২০৯।

॥ কয়েকটি বিশেষ ধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ॥

এক ॥ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রধান প্রবন্ধ লেখকদের রচনা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিমাপকর। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—এক অংশ, পৃঃ ১৫৬-১৬১।

দুই ॥ উনবিংশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত ইহার পরিনতি নির্দেশ কর। এম, এ ১৯৫৫। উঃ—ঐ।

তিন ॥ বাংলা সাহিত্যে রসরচনার (Literary cssay) সূত্রপাত হইতে আধুনিক পরিনতি পর্যন্ত সমগ্র ধারাটির মধ্যে বিভিন্ন গদ্য রীতির ও রুচির এবং মেজাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। এম,এ—১৯৫৩। উঃ—ঐ।

চার ॥ বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব কি তাহা বিচার কর। এম,এ—১৯৫০। উঃ—এক এবং তিনের খ অংশ।

পাঁচ ॥ বাংলা উপন্যাসের সূচনা ও ক্রম পরিণতির ধারা আলোচনা করিয়া ইহার আকৃতি প্রকৃতির কিরূপে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিষদভাবে প্রদর্শণ কর। এম,এ—১৯৪৯। উঃ—তিন অংশ।

॥ কাব্যালোক ॥

এক ॥ বিশ্বনাথ বলেন,—"বিভাব-প্রভৃতির সাধারণীকরণ নামে একটি ব্যাপার আছে।" এই বিভাব প্রভৃতি বলিতে কি বুঝায় এবং সাধারণীকরণ বলিতে কি বুঝায়, উদাহরণ দিয়া বিশদ রূপে ব্যাখ্যা কর। এম,এ—১৯৪৯। উঃ—দুই অংশের খ এবং চ, পৃঃ ১১০—১১২।

দুই ॥ ভাব কাহাকে বলে? ভাবের স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপে ভেদ-স্বীকারের কারণ কি? সঞ্চারী ভাব দ্বারা অতি সম্পন্ন হইয়া স্থায়ী ভাব কিরূপে রসতা প্রাপ্ত হয়, ব্যাখ্যা কর। এম,এ—১৯৪৯। উঃ—দুই, তিন এবং চার অংশ, পৃঃ ১১০—১১৬।

তিন ॥ অলঙ্কার শাস্ত্রে অলঙ্কার বলিতে ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ অর্থে কি বুঝায় তাহা পর্যালোচনা কর। এই বিষয়ে ধ্বনিকার-কৃত সংগাটির বিশেষ ব্যাখ্যান করিয়া অলঙ্কার দ্বারা কি ভাবে কাব্যে রূপায়ণ ও রস নিষ্পত্তির সহায়তা হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শণ কর। এম,এ—১৯৫০। উঃ—সাত অংশ, পৃঃ ১২০—১২৫।

চার ॥ 'আলোকার্থী যেমন দীপশিখা সম্বন্ধে যত্নবান হয়েন সেইরূপ ব্যঙ্গ অর্থ যিনি আদর করেন তিনি উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থে অভিনিবিষ্ট হইবেন।' উপরি উদ্ধৃত উক্তির প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ অর্থের সম্বন্ধ নির্ণয় কর। এই প্রসঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য হইতে উপযোগী দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর। এম, এ—১৯৫০।

পাঁচ ॥ 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি' এবং 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'—কাব্যের এই দুইটি

সংজ্ঞার ঔচিত্য পরীক্ষা করিয়া কোন্‌টি সমধিক অভিপ্রেত নির্দ্ধারণ কর। এম,এ—১৯৫৩। উঃ—পাঁচ এবং সাত অংশ, পৃঃ ১১৬—১১৭, ১২০।

ছয় ॥ বিভাবনা ব্যাপার কাহাকে বলে? তাহাকে অলৌকিক বলা হয় কেন? সাধারণীকরণ ব্যাপার ভিন্ন বিভাবনা ব্যাপার সম্পূর্ণ হইতে পারে না কেন? তাহার আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫১। উঃ—দুই অংশ, পৃঃ ১১০—১১২।

সাত ॥ "রস অভিব্যক্ত হয়।"—বলা হয় কেন? এই অভিব্যক্তির প্রকার কি? রসকে 'অলৌকিক' ও 'ধ্বনি' বলা হয় কেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা কর। এম, এ—১৯৫২। উঃ—চার অংশ, পৃঃ ১১৪—১১৬।

আট ॥ প্রাচীনগণের কাব্য-লক্ষণের সহিত তুলনায় কুন্তক-কৃত কাব্য-লক্ষণের বৈশিষ্ট্য কোথায়, বিশদ রূপে বিবৃত কর। এই প্রসঙ্গে কুন্তক প্রদত্ত শব্দ ও অর্থের লক্ষণ আলোচনা করিয়া কুন্তকের আলোচনায় কোথাও ত্রুটি আছে কিনা তাহার বিচার কর। এম, এ—১৯৫২। উঃ—দশ এবং এগার অংশ।

নয় ॥ প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগে কাব্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা রচিত হইয়াছে দেখা যায়। অনেকের মতে শব্দার্থের সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্বনিবাদ, বক্রোক্তিবাদ এবং রসবাদে সংজ্ঞার ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন মতগুলির সার্থকতা পরীক্ষা করিয়া কাব্যের একটি সুসঙ্গত ও সুসম্পূর্ণ সংজ্ঞা রচনা কর। এম, এ—১৯৫৩। উঃ—সমগ্র প্রবন্ধ।

॥ দশ ॥ নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ :—

(ক) ভাবের স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপে ভেদ স্বীকারের কারণ কি? রসনিষ্পত্তিতে সঞ্চারী ভাবের অর্থ কি? উঃ—তিন এবং ছয় অংশ, পৃঃ ১১৩—১১৪, ১১৭—১১৯।

(খ) রসকে "অলৌকিক" ও "ধ্বনি" বলা হয় কেন? উঃ—পাঁচ অংশ, পৃঃ ১১৬—১১৭।

॥ এগার ॥ অভিনব গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন "কাব্য প্রধানতঃ নাটক সমূহের স্বভাব সম্পন্ন। কাব্য বস্তুতঃ নাট্যই।" তিনি এই জন্য নাট্য রসকেই কাব্যরস বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পরবর্ত্তিগণও উভয় রসকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—এই অভিমত ও সিদ্ধান্ত কতদূর সমর্থনযোগ্য, বিশেষ-রূপে আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ—এক অংশ, পৃঃ ১০৫—১১০।

॥ বার ॥ "রস কাব্যের আত্মা" ও "ধ্বনি কাব্যের আত্মা"—এই দুই মতের তাৎপর্য বিষদরূপে উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা কর এবং কোন মতটী সমধিক গ্রহণযোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ কর। এম, এ—১৯৫৪। উঃ—পাঁচ এবং সাত অংশ।

॥ তের ॥ 'মহাকবিদের বাণীতে আর একটি বস্তু আছে যাহার নাম-প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের মত চিরপরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথকভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে।' —প্রতীয়মাণ ব্যঙ্গ্য অর্থের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় কর। এম, এ—১৯৫৫।

॥ চৌদ্দ ॥ ভাব, বিভাব, সঞ্চারীভাব ও অনুভাব—ইহাদের সংজ্ঞা উল্লেখ কর। এবং রসনিষ্পত্তিতে ইহাদের স্থান নিরূপণ কর। এম, এ—১৯৫৫। উঃ—ছয় অংশ, পৃঃ ১১০—১১২, ১১৭—১১৯।

॥ পনেরো ॥ প্রাচীন অলংকারিকেরা বলিয়াছেন যে রস স্বগতও নয়, পরগতও নয়, রস অলৌকিক।—উপরি উল্লিখিত মতের যথার্থ বিচার কর। এই প্রসঙ্গে লৌকিক অনুভূতির সঙ্গে অলৌকিক রসানুভূতির সম্পর্ক নির্ণয় কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—পাঁচ এবং চার অংশ, পৃঃ ১১৬—১১৭, ১১৪—১১৬।

॥ ষোল ॥ কাহারও কাহারও মতে কাব্যের প্রাণ বক্রোক্তি। এই মতের যথার্থ বিচার কর। এম, এ—১৯৫৬। উঃ—এগার অংশ।

॥ সতের ॥ বিশ্বনাথ রসকে অখণ্ড এবং স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন, রসের এই অখণ্ডত্বের এবং স্বপ্রকাশত্বের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। প্রসঙ্গ ক্রমে রসের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দাও। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—চার, পাঁচ এবং ছয় অংশ, পৃঃ ১১৪—১১৯।

॥ আঠার ॥ আলংকারিকগণ যে "ধ্বনি"র কথা বলিয়া গিয়াছেন কাব্যের কাব্যত্ব বিচারে তাহা আমাদিগকে কতখানি সাহার্য্য করে বাঙ্গালা কাব্য-কবিতা হইতে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা কর। এম, এ—১৯৫৭। উঃ—সাত অংশ, পৃঃ ১২০—১২৫।

॥ যে সকল গ্রন্থ হ'তে সাহায্য গ্রহণ করেছি ॥

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্য-জিজ্ঞাসা

ডক্টর সুধীর কুমার দাসগুপ্ত—কাব্যালোক

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, আধুনিক বাংলা কবিতা ও

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, চর্যাপদ বৌদ্ধগান ও চর্যাপদ

মণীন্দ্র মোহন বসু—চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)

ডক্টর সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড); বাংলা সাহিত্যে গদ্য

জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

রথীন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য বিচিত্রা

অজিত কুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

অরবিন্দ পোদ্দার—মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ

মদন মোহন কুমার—বাংলা সাহিত্যের আলোচনা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

॥ আব্দুল আজীজ আল্-আমান-এর পরবর্তী গ্রন্থ ॥

॥ পদক্ষেপ ॥

[যন্ত্রস্থ]

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিষয়ের ওপর অপূর্ব আলোচনা। সূচীপত্রের সামান্যতম অংশ :

বৈষ্ণবপদাবলী :

পদাবলী ও গীতিকবিতা, পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য, প্রাকচৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদের বিভিন্ন দিক হ'তে আলোচনা (যথা :—বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, বিরহ, রাস, ভাব-সম্মিলন, মান, রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদি) এবং মহাজন চতুষ্টয়ের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

চণ্ডীদাস-সমস্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মীতা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাস্যরস, সামাজিকতা, পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (ভাষা, প্রকাশ-ভংগী, উভয়গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত :

গৌরতত্ত্ব ও রাধাবাদ, উপাদান সংগ্রহ ও ঐতিহাসিকতা বিচার, চৈতন্য-রামানন্দ আলোচনা এবং কান্তা প্রেম, দর্শন-কাব্য এবং চরিত গ্রন্থ হিসাবে চৈতন্যচরিতামৃত, চরিতামৃত ও ভাগবত, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ধর্মমত, সার্বভৌম জয় : বেদান্ত-বিচার ইত্যাদি।

মঙ্গল কাব্য :

নামকরণ, এ কাব্যের উদ্ভব যুগ, প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্য, নারায়ণ দেবের চাঁদ চরিত্র, চণ্ডীমঙ্গলের সামাজিকতা, মঙ্গলকাব্যগুলি জাতীয় কাব্য কিনা, বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব, মহাকবি ভারতচন্দ্র ইত্যাদি।

মৈমনসিংহ গীতিকা :

গীতিকার সংগা ও বৈশিষ্ট্য, মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা, গীত ও গীতিকা, বৈষ্ণব সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা, গীতিকা ও বাংলা উপন্যাস মৈঃ গীঃ বাংলা মাটির সম্পদ (ভাষার অকৃত্রিমতা, মৃত্তিকাজাত উপমা, মাটির চিত্র, ইত্যাদি), মৈঃ গীঃ নারীচরিত্র, সামাজিকতা, কোন গীতিকাটি শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এ ছাড়াও শাক্তপদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কবিওয়ালাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।